বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

(১৭৫৭ - ১৯৪৭)

এম.এ. রহিম

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

১৭৫৭ – ১৯৪৭

(বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত)

ডক্টর মুহম্মদ আবদুর রহিম
এম. এ (ঢাকা), পি এইচ. ডি (লণ্ডন)

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.bjilibrary.com

প্রকাশক

মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ই-মেইল : info@ahmedph.com

প্রথম সংস্করণ

জানুয়ারি ১৯৭৬/ মাঘ ১৩৮৩

দশম মুদ্রণ

জুন ২০১৯/আষাঢ় ১৪২৬

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস

ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য

তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 11 0717 8

BANGLAR MUSALMANDER ITIHAS : (History of Bengle Muslims)
by : Dr. Muhammad Abdur Rahim
Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100.
First Revised Edition : January, 1976 & Tenth Print : June 2019
Price : **BDT 350.00 & US $ 30.00 Only.**

ঘরে বসে আহমদ পাবলিশিং হাউস-এর যে কোন বই কিনতে ভিজিট করুন :
www.rokomari.com/ahmedpublishinghouse

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় দুই শতাব্দীর বৃটিশ শাসনাধীনে বাংলার মুসলমান সমাজ বহুবিধ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। মুসলিম শাসক, জমিদার ও বিত্তশালী পরিবারগুলি অস্তিত্বহারা হয় এবং মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধবংসপ্রাপ্ত হয়। প্রতিপত্তিশালী ও উন্নত মুসলিম সমাজ অনুন্নত অবস্থায় পতিত হয়। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সংস্কার আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ইহাদের কোন কোনটি বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের আকার ধারণ করে। ক্রমাগত ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় মুসলমান সমাজে বাস্তব সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হয়। কয়েকজন চিন্তাশীল ও সমাজ-দরদী নেতা বাংলার মুসলমানদেরকে পথের নির্দেশ দেন। মুসলমান সমাজকে ধবংসের মুখ হইতে রক্ষার জন্য এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে নবাব আবদুল লতিফ তাহাদেরকে বৃটিশ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম ঐতিহ্য ও শিক্ষার বাণী প্রচার করেন এবং মুসলিম জাগরণের কাজ করেন। মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। নবাব সলিমুল্লাহ্ বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বাংলার রাজনৈতিক জীবনে বাঙ্গালী জাতীয়তা, ভারতীয় জাতীয়তা ও মুসলিম জাতীয়তার ধারা প্রবাহিত হয়। ইহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়. ১৯৪৭ সনে হিন্দু-মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত ও বাংলাদেশ বিভক্ত হয়। পূর্ববাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও পশ্চিম বাংলা ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বৃটিশ শাসনামলে বাংলার মুসলমানদের বিবিধ অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। 'বাংলার মুসলমান সমাজ ও রাজনীতি, ১৭৫৭-১৯৪৭,' গ্রন্থখানিতে আমি সে অভাব দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। গ্রন্থখানি কয়েক বৎসরের গবেষণার ফল। ইহার রচনায় বহু প্রকারের সমসাময়িক তথ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। অনেক ইতিহাস লেখকের গবেষণামূলক গ্রন্থ হইতে তথ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। বইখানা ছাপাইতে ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। আমি তাহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **এম. এ. রহিম**

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৬

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান : ... ৯–২৩

ইংরাজ বণিকদের শ্রীবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ; নবাব সিরাজউদ্দৌলা; ও পলাশীর যুদ্ধ; বাংলায় ইংরাজদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা; দীউয়ানী ও ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন;

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার মুসলমান শাসক পরিবারগুলির পতন : ... ২৪–৩১

মীরজাফরের পরিবার; রেজা খাঁর পরিবার; নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবার; ঢাকার নায়েব-নাযিম পরিবার;

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম জমিদারদের পতন : নূতন জমিদারীর উত্থান : ৩২–৪৪

নূতন জমিদারী : ঢাকার নবাব পরিবার; নূতন হিন্দু জমিদারী;

চতুর্থ অধ্যায়

কোম্পানীর রাজস্ব–নীতি ও মুসলমান : ... ৪৫–৫২

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; লাখেরাজ বাযয়াফতি;

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমানদের উপর বৃটিশ শাসন–নীতির ফল : ... ৫৩–৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ : ... ৬১–৬৫

সপ্তম অধ্যায়

জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ : ৬৬–৭৩

১৭৮৩ সালের প্রজাবিদ্রোহ; নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ;

www.bjilibrary.com

অষ্টম অধ্যায়

মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন : ... ৭৪—৮৬

ফরায়েজী আন্দোলন; সৈয়দ আহমদ শহীদ; তিতুমীরের প্রজা-আন্দোলন; জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা;

নবম অধ্যায়

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ : ... ৮৭—৯৭

দশম অধ্যায়

বৃটিশ শাসনকালে মুসলমানদের শিক্ষা : ... ৯৮—১২১

ইংরাজী শিক্ষা : সরকারের নীতি; শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি;

একাদশ অধ্যায়

নবাব আবদুল লতিফ ও মুসলমানদের শিক্ষা : ... ১২২—১৩০

মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি :

দ্বাদশ অধ্যায়

সৈয়দ আমীর আলী : মুসলিম রাজনীতি ও রেনেসাঁ : ১৩১—১৪৫

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন; মুসলমানদের রেনেসাঁ;

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ : মুসলিম লীগ : ... ১৪৬—১৬৫

মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদ; নবাব সলীমুল্লাহ ও মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা;

চতুর্দশ অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ ও ইহার প্রতিক্রিয়া : ... ১৬৬—১৭৫

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া;

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফজলুল হক ও হিন্দু—মুসলিম সহযোগিতা : ... ১৭৬—১৯২

কংগ্রেস লীগ সহযোগিতা; বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩); হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টা;

www.bjilibrary.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্য : ... ১৯৩—২১২

কৃষক-প্রজা সমিতি (পার্টি); মুসলিম লীগের পুনর্জীবন; নির্বাচনী প্রতিযোগিতা; ফজলুল হকের প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা; হক-জিন্নাহ মতান্তর, ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতন; নাযিমুদ্দিনের লীগ মন্ত্রিসভা;

সপ্তদশ অধ্যায়

স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী : লাহোর প্রস্তাব : ... ২১৩—২২৩

লাহোর প্রস্তাব : বাংলার নেতাদের ভূমিকা; লাহোর প্রস্তাবের অর্থ;

অষ্টাদশ অধ্যায়

মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম : ... ২২৪—২৩৪

১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন; আইনসভার মুসলমান সভ্যদের কনভেনশন;

উনবিংশ অধ্যায়

পাকিস্তানের জন্ম : ... ২৩৫—২৪৯

লীগের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা; ৩রা জুন (১৯৪৭) পরিকল্পনা; ক্ষমতা হস্তান্তরের কারণ;

বিংশতি অধ্যায়

১৯৪৭ সালের বাংলাদেশ বিভাগ : ... ২৫০—২৬১

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা;

তথ্য সংকেত

প্রথম অধ্যায়—বিংশতি অধ্যায় ... ২৬২—২৭৯

www.bjilibrary.com

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়
বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান

এয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁহার পরবর্তী শাসনকর্তাগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিয়াছেন। তাঁহারা নামমাত্র দিল্লীর সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। ইহার পর হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭) দিল্লীর সহিত নামমাত্র সম্পর্কটুকুও ছিন্ন করিয়া বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। এই সময় হইতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। এই স্বাধীন শাসনের আওতায় বাংলার রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের পথ সুগম হয় এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিতে সুযোগ পায়। শেরশাহের শাসনকালে (১৫৪০-৪৫) কয়েক বৎসর বাংলাদেশ দিল্লীর সহিত সংযুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ আবার ইহার স্বাধীন রাজনৈতিক জীবনে ফিরিয়া আসে। মোগল সম্রাট আকবরের সময় আর একবার উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সহিত স্বাধীন বাংলার সংঘাত বাঁধে। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে মোগল সৈন্যবাহিনী রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ কররাণীকে পরাজিত ও নিহত করে। যুদ্ধে জয় লাভ করিলেও মোগল সেনাপতিগণ বহু বৎসর চেষ্টা করিয়াও বাংলাদেশে সম্রাট আকবরের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ইহার স্বাধীনতা-প্রিয় জমিদারগণ তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার সুবাদার ইসলাম খানের কর্মকুশলতার ফলে জমিদারগণ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

প্রায় শতাব্দীকাল বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্রাট আওরঙ্গযেবের (১৬৫৮-১৭০৭) মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারিদের দুর্বলতা, আমীর-ওমরার ষড়যন্ত্র, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি কারণে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সুযোগে বাংলাদেশে স্বাধীন শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান (১৭১৭-২৭) বাংলাদেশে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন।[১] তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সুজাউদ্দীন (১৭২৭-৩৯) সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০), আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬) ও সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭) নামমাত্র মোগল সম্রাটদের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। তাঁহারা বাংলার নবাব ও মুর্শিদাবাদের নবাব নামে পরিচিত। মুর্শিদ কুলী খান ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে বাংলাদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা মুর্শিদাবাদের নবাবদের রাজ্যভুক্ত ছিল।

মুর্শীদাবাদের নবাবদের শাসনকালে বাংলাদেশ ইহার জাতীয় জীবন গঠনে আবার সুযোগ পায়। এই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। মুসলমান শাসক শ্রেণী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সহিত মিশিয়া যায়। মুর্শিদ কুলী ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বাংলাদেশকে তাঁহাদের

www.bjilibrary.com

নিজের দেশ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ইহার অধিবাসীদের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এক হইয়া যান। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, আমীর-ওমরা ও অনুচরবৃন্দ এবং ইরান ও তুরাণ হইতে আগত ভাগ্যান্বেষী ব্যবসায়ী, আলেম ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকগণ বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় উত্তর ভারতে ও ইরানে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলিতেছিল তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু ইরানী পরিবার নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ শিয়া ছিলেন। এইজন্য স্বভাবতই ইরানী বহিরাগতগণ শান্তিপূর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার ফলে মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা ও অন্যান্য কয়েকটি শহরে ইরানী শিয়াদের প্রভাব পড়িয়াছিল।[২]

মুর্শিদ কুলীর পূর্বে বাংলাদেশ শাসনের জন্য উত্তর ভারত হইতে সুবাদার, দীউয়ান, বখশী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রেরিত হইতেন। তাঁহারা স্বল্প মেয়াদে এই প্রদেশে আসিতেন এবং মেয়াদ শেষে উত্তর ভারতে চলিয়া যাইতেন। এইজন্য বাংলাদেশের সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র ছিল না। তাঁহাদের সহিত কিছু অর্থসম্পদও উত্তর ভারতে চলিয়া যাইত। নবাবদের আমলে এই পথ বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহাদের সম্পদ বাংলাদেশের উপকারে আসে এবং স্বাধীন বাংলার স্বার্থের সহিত সকলের স্বার্থ এক সূত্রে গ্রথিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের ন্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবগণ জাতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালীদের প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। শাসনকার্য্যের বিভিন্ন পদে তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে নিয়োগ করিতেন।

নবাবদের জাতীয় নীতির ফলে রাজকার্য, জমিদারী ও ব্যবসায় বাণিজ্যর ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিশেষ উন্নতি হয়। মোগল আমলে বহু জায়গীর ও জমিদারী মুসলমানদের দখলে ছিল। বড় বড় জায়গীরদার ও জমিদারদের অধিকংশই মুসলমান ছিলেন। মুর্শিদ কুলী অনেক মুসলমান কর্মচারীর জায়গীর বাংলাদেশ হইতে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। কয়েক জন মুসলমান জমিদার রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি তাঁহাদের জমিদারী কাড়িয়া লন এবং হিন্দুদের সহিত ইহার বন্দোবস্ত করেন। এইরূপে মাহমুদপুর (নদীয়া-যশোহর) ও জালালপুর পরগণার কয়েকটি মুসলমান জমিদারী নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনকে দেওয়া হয়।[৩] সোনারগাঁয়ের ঈসা খানের বংশধরদিগকেও কয়েকটি মূল্যবান পরগণা হারাইতে হয়। মুর্শিদ কুলী তাঁহাদের জমিদারীর আলপ শাহী ও মোমেনশাহী পরগণাদ্বয় কাড়িয়া লন এবং দুইজন রাজস্ব কর্মচারীর সহিত ইহাদের বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থার ফলে আলপ শাহী ও মোমেন শাহীতে দুইটি প্রতাপশালী হিন্দু জমিদারীর উৎপত্তি হয়।[৪] মুর্শিদ কুলী মনে করিতেন যে, হিন্দুগণ স্বভাবত শাসকদের প্রতি অনুগত থাকে।[৫] এইজন্য তিনি রাজস্ব

www.bjilibrary.com

ব্যবস্থার বিষয়ে হিন্দুদিগকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেন। তাঁহার পরবর্তী নবাবগণও তাঁহার প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। ইহার ফলে বাংলাদেশের জমিদারীতে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং এদেশে একটি অভিজাত হিন্দু জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। রাজশাহীর দিঘাপতিয়া ও নাটোর, ময়মনসিংহের মোমেনশাহী ও মুক্তাগাছা এবং দিনাজপুর, নদীয়া ও বর্ধমানের জমিদারীগুলি ইহাদের অন্যতম।[৬]

মুর্শিদ কুলী হিন্দুদিগকে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাঁহার শাসনকালে ভূপৎ রায়, দর্পনারায়ন, রঘুনন্দন, কিঙ্কর রায়, আলমচাঁদ লাহারীমল, দিলপৎ সিংহ, হাজারীমল এবং আরও কয়েক জন হিন্দু দীউয়ান ও অন্যান্য উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। মুর্শিদ কুলীর জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সুজাউদ্দীনের আমলেও আলমচাঁদ, জগৎশেঠ যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভ নন্দলাল এবং আরও অনেক হিন্দু কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নবাব আলীবর্দীর সময়ে রাজপদে হিন্দুদের আরও উন্নতি হয়। এই সময় চিনরায়, বীরুদত্ত কিরাৎচাঁদ ও উমেদরায় যথাক্রমে খালসা বিভাগের দীউয়ান ছিলেন, জানকীরাম ও রামনারায়ণ বিহারের দীউয়ান ও নায়েব সুবাদারের আসন লাভ করিয়াছিলেন। রায়দুর্লভ উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার এবং রাজবল্লভ জাহাঙ্গীরনগরের দীউয়ান নিযুক্ত হন। শ্যামসুন্দর গোলন্দাজ সৈন্যদলের বখশী ও রামরামসিংহ গুপ্ত পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন। রবার্ট ওর্ম লিখিয়াছেন যে, নবাব আলীবর্দী রাজকার্যে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং ইহার ফলে শাসনকার্যে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।[৭] নবাব সিরাজউদ্দৌলাও তাঁহার মাতামহের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি মোহন লালকে প্রধান মন্ত্রী ও জানকীরামকে দীউয়ানের পদে নিয়োগ করেন। রায় দুর্লভ, রামনারায়ণ, রাজবল্লভ ও অন্যান্য হিন্দু কর্মচারীগণ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা মানিকচাঁদ ও নন্দকুমারকে যথাক্রমে কলিকাতা ও হুগলীর ফৌজদার পদে নিয়োগ করেন।[৮]

ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দুগণ বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিল। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবার ও কলিকাতার উমিচাঁদ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। জগৎশেঠ নবাব সরকারের ব্যাঙ্কার ছিলেন এবং সরকারী লেনদেনের কাজ করিয়া তিনি বৎসরে চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনাফা করিতেন। জগৎশেঠের ঐশ্বর্যের বিষয়ে রবার্ট ওর্ম লিখিয়াছেন, "মুকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) এক হিন্দু পরিবার ছিল এবং এই পরিবারের প্রধান ছিলেন জগৎশেঠ। জগৎশেঠ সামান্য অবস্থা হইতে সাম্রাজ্যের সর্বোপেক্ষা সমৃদ্ধ ব্যাংকার হইয়া উঠিয়াছিলেন সাম্রাজ্যের বহু স্থানে তাঁহার দালাল ছিল এবং সেখানে তাহারা লেনদেনের কাজ করিত। এই সকল দালালের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যের শাসনকার্যের বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হইতেন। বাংলাদেশে তাঁহার প্রভাব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সমকক্ষ ছিল। তিনি জমিদার ও ইজারাদারদের দেয় রাজস্বের জন্য জামিন হইতেন। দেশের যে কোন অর্থ সংকটে তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন হইত।"[৯] নবাব আলীবর্দীর উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে উমিচাঁদের ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।[১০]

মুর্শিদাবাদের নবাবগণ হিন্দুদিগকে প্রীতির চোখে দেখিতেন। তাঁহাদের জাতীয় নীতির ফলে সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের উন্নতি হইয়াছিল। শাসন ব্যাপারে তাঁহারা

www.bjilibrary.com

প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তবু হিন্দু অভিজাত শ্রেণী মুসলমানদের শাসন মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহাদের গোপন বিদ্বেষ ভাব চতুর ইংরেজ বণিকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। রবার্ট ওর্ম মন্তব্য করিয়াছেন, "দেশের শাসনের সকল বিভাগে হিন্দুদের প্রভাব এত ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সাহায্য ব্যতীত ও তাহাদের অজ্ঞাতে সরকারের কোন কাজ চলিতে পারিত না।"[১১] হিল লিখিয়াছেন, "ব্যবসায় ও শিল্প প্রধানত হিন্দুদের হাতে থাকায় স্বভাবতই তাহাদের সঙ্গে য়ুরোপীয় বণিকদের মধ্যে একপ্রকার মিত্রতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।" হিল আরও লিখিয়াছেন যে, ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কট তাহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ মুরদের (মুসলমানদের) শাসনে খুবই অসন্তুষ্ট এবং তাঁহারা এই স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসানের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন।"[১২] রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-কাহিনী রচয়িতা রাজীবলোচন লিখিয়াছেন যে, হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।[১৩]

ইংরাজ বণিকদের শ্রীবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ

বাংলাদেশের বাণিজ্যে ইংরাজ বণিকগণ কয়েকটি বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিল। সম্রাট শাহজাহান প্রথম ইংরাজদিগকে হুগলীতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার শাহজাদা সুজা মাত্র তিন হাজার টাকা বাৎসরিক করের বিনিময়ে ইংরাজদিগকে প্রদেশের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন।[১৪] এই বিরাট সুবিধা লাভ করার ফলে ইংরাজ বণিকগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বন্দর ও শহরগুলিতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া একটি সমৃদ্ধ বণিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইবার সুযোগ পায়। ইংরাজ বণিকদেরকে বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল না। ইহা অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদের ও এদেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল কারণ তাহাদিগকে দ্রব্যমূল্যের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক দিতে হইত। তাহা ছাড়া ইহাতে রাজকোষের শুল্কের ক্ষতি হইত। প্রথমাবস্থায় বাংলাদেশে ইংরাজদের বাণিজ্যের পরিমাণ অল্প ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সম্রাট আওরঙ্গযেব ইংরাজ বণিকদের বিশেষ সুবিধা রহিত করেন। ইংরাজ বণিকগণ এই অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াস পায়। ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ বাধে। সুবাদার শায়েস্তা খান ইহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং ইহাদিগকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। পরে তাহারা নিজেদের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আবার বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে অনুমতি পায়।

সম্রাট ফরোখশিয়ার হেমিল্টন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন। সুচতুর ইংরাজ চিকিৎসক নিজের জন্য কিছু না চাহিয়া তাঁহার স্বজাতীয় বণিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করেন। সম্রাট ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরমানের দ্বারা মাত্র তিন হাজার টাকা বার্ষিক শুল্কের বিনিময়ে ইংরাজদেরকে বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দান করেন। ইহার ফলে

www.bjilibrary.com

ইংরাজদের বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয় এবং তাহারা শক্তিশালী হইয়া উঠে। বাণিজ্যের ঐশ্বর্যের বলে ইংরাজ বণিকগণ রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়।

বাণিজ্যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের মনে এদেশে রাজনৈতিক প্রভাব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। হিন্দু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে ইহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী করিতে তাহারা হিন্দু প্রধানদের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। নবাব আলীবর্দীর রাজত্বকালে কর্ণেল স্কট নামক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গোলন্দাজ বাহিনীর একজন ইঞ্জিনিয়ার বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যদি য়ুরোপীয় সৈন্যগণ ভালভাবে অভিযান শুরু করে এবং হিন্দুদিগকে উৎসাহিত করা হয়, তাহা হইলে তাহারা ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিবে।" তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, এই কার্যে উমিচাঁদ ও অন্যান্য হিন্দু প্রধানদের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। হিন্দু জমিদার ও রাজকর্মচারীদের উপর তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।[১৫] য়ুরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ইংরাজ বণিকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং হিন্দুদের সহযোগিতা সম্বন্ধেও তাহাদের আশা ছিল। এইজন্য তাহারা আলীবর্দীর রাজত্বের শেষের দিকে নবাবের আদেশ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিল। কলিকাতায় ইংরাজদের জমিদারী ছিল এবং তাহারা ইহার সকল অধিবাসীদের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করিত। নবাব আলীবর্দী এই ব্যাপারে ইংরাজ বণিকদের নিকট একটি পরওয়ানা প্রেরণ করেন। তাহারা পরওয়ানাবাহকের প্রতি দুর্ব্যবহার করে এবং নবাবের নিকট অশ্লিষ্ট ভাষায় লিখিত এক পত্রে তাহাদের দাবীর বিষয় ব্যাখ্যা করে।[১৬] কিছু দিন পরে আলীবর্দী খানের মৃত্যু হয়। এই জন্য তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

মাতামহের মৃত্যুর পর তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে (১৭৫৬-৫৭) একদিকে ইংরাজ বণিকদের অবাধ্যতা ও শত্রুতা এবং অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী আত্মীয়স্বজন ও রাজকর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইতে হয়। আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘষেটি বেগম ও ক্ষমতা-লোভী সেনাপতি মীরজাফর সিরাজকে সিংহাসনচ্যুৎ করিয়া তাঁহার (সিরাজ) খালাত ভাই ও পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকৎজঙ্গকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

ইংরাজদের সহিত সংঘর্ষ : ইংরাজ বণিকগণ নবাবের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা নবাবের কর্তৃত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইতে উৎসাহিত হয়। কুক লিখিয়াছেন যে, সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের সময় ইংরাজ বণিকগণ চলতি প্রথামত নবাবকে কোন উপঢৌকন পাঠায় নাই। দ্বিতীয়ত তাহারা নবাবের অনুমতি ব্যতীত কলিকাতায় দুর্গের আয়তন বৃদ্ধি করে এবং ফোর্ট উইলিয়ামকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করে। বাহ্যত, তাহারা ফরাসী বণিকদের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কিন্তু নবাবের অনুমতি না

www.bjilibrary.com

লইয়া তাঁহার রাজ্যে দুর্গ নির্মাণ ও যুদ্ধের আয়োজন করিয়া তাহারা নবাবের কর্তৃত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। তৃতীয়ত, তাহারা দস্তকের সুবিধার অপব্যবহার করে। বাদশাহী ফরমানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টেকে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। যে, তিনি ইংরাজ বণিকদিগকে ব্যবসায়ের জন্য দস্তক বা অনুমতি পত্র দিবেন এবং দস্তকধারীদিগকে তাহাদের পণ্য দ্রব্যের জন্য খেয়াঘাটে ও নদীতে শুল্ক দিতে হইবে না। কোম্পানী ইংরাজ বণিকগণ ছাড়াও ইহার কর্মচারীদিগকে ও অন্য সম্প্রদায়ের বণিকদিগকে দস্তকের সুবিধা ভোগ করিতে দিত। ইহাতে রাজকোষের শুল্কের প্রচুর ক্ষতি হইত। চতুর্থত : নবাবের যে সকল অসৎ ও বিদ্রোহী প্রজা তহবিল তসরূপ ও রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তির ভয়ে কলিকাতায় পালাইয়া গিয়াছিল কোম্পানী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। জাহাঙ্গীরনগরের দীউয়ান রাজা রাজবল্লভ রাজকোষের তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন এবং তাঁহার অর্থসম্পদ ও পরিবার সহ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। নবাব ইংরাজদিগকে বেআইনী দস্তক বন্ধ করিতে বলেন এবং বিনানুমতিতে দুর্গ নির্মাণ করিতে নিষেধ করেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে ফিরাইয়া দিতে ইংরাজদিগকে আদেশ করেন। কোম্পানীর কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক নবাবের সকল আদেশ অমান্য করেন এবং নবাবের প্রেরিত দূতের সহিত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন।[১৭]

নবাব ইংরাজদের অবাধ্যতার শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করেন। ১৭৫৬ সালের ৪ঠা জুন তিনি ইহাদের কাসিমবাজার বাণিজ্য কুঠি দখল করেন এবং ২০শে জুন ইহাদের কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন। অনেক ইংরাজ কলিকাতা ছাড়িয়া জাহাজে আশ্রয় লয়, কিছু সংখ্যক ইংরাজ নবাবের হাতে বন্দী হয়। কুক লিখিয়াছেন যে, নবাব ইংরাজ বন্দীদের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই। ড্রেক উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবাবের আদেশে ৩৯ জন ইংরাজ বন্দীকে ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া একটি কামরায় রাখা হয়। বন্দী সৈন্যদের মধ্যে অনেকে আহত ছিল। রাত্রে ১৮ জন আহত সৈন্যের মৃত্যু হয়। হলওয়েল এই সামান্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন যে, কামরায় ১৪৬ জন ইংরাজকে কয়েদ রাখা হয় এবং ইহাদের ২৩ জন ব্যতীত আর সকলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা যায়। তিনি এই ঘটনাকে অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole Tragedy) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।"[১৮]

নবাব সিরাজউদ্দৌলা মানিকচাঁদকে কলিকাতার ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি শওকৎজঙ্গকে দমন করিতে অগ্রসর হন। ১০ই অক্টোবর (১৭৫৬) পূর্ণিয়ার মনিহারী নামক স্থানে এক যুদ্ধে শওকৎজঙ্গ পরাজিত ও নিহত হন। ইহার ফলে নবাবের এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী অপসারিত হয়।

কলিকাতার পতনের পর ড্রেক ও অন্যান্য ইংরাজগণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। এই সময় তাহারা যদি উমিচাঁদ, নবকিষণ জগৎশেঠ ও অন্যান্যের সাহায্য না পাইতেন তাহা

www.bjilibrary.com

হইলে নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। কয়েকজন হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী পলাতক ইংরাজগণকে ফুলতায় আশ্রয় দেন এবং তাহাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন।[১৯]

কলিকাতা পতনের খবর পাইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাদ্রাজ কাউন্সিল রবার্ট ক্লাইভের অধীনে বাংলাদেশে এক সৈন্যদল ও নৌবহর প্রেরণ করে। ক্লাইভ দাক্ষিণাত্যে ফরাসী বণিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কর্ণাটকে ইংরাজ বণিকদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটস ১৪ই ডিসেম্বর (১৭৫৬) নৌবহর লইয়া ভাগীরথী নদীতে প্রবেশ করেন এবং ফুলতার দিকে অগ্রসর হন। মানিকচাঁদ তাহাদিগকে কোনরূপ বাধা দেন নাই। এই সময় মানিকচাঁদ ও ক্লাইভের মধ্যে যে পত্র ও বার্তাবাহক বিনিময় হয় তাহা হইতে জানা যায় যে, মানিকচাঁদ নিজেকে ইংরাজদের এক জন বন্ধু বলিয়া প্রকাশ করেন।[২০] ফলে ক্লাইভ সহজে কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন (২রা জানুয়ারী ১৭৫৭)। ইহার পর তিনি হুগলী অধিকার করেন। মানিকচাঁদ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কলিকাতা ও হুগলী হইতে পশ্চাদপসরণ করেন।

নবাবকে আবার ইংরাজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। ইংরাজগণ হুগলী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লয়। নবাব কলিকাতার শহরতলীতে প্রবেশ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারী (১৭৫৭) ক্লাইভ ও ওয়াটস অতর্কিত নৈশ আক্রমণে নবাবের সৈন্য ছাউনীতে কিছুটা গোলযোগের সৃষ্টি করেন, কিন্তু পরে অবস্থা বেগতিক দেখিয়া তাহারা পলাইয়া যান। কলিকাতা আক্রমণের পক্ষে নবাবের পর্যাপ্ত সৈন্য ছিল। কিন্তু তিনি নিজ সৈন্যাধ্যক্ষদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন। তাঁহারা নবাবকে ইংরাজদের সহিত আপোষ করিতে পরামর্শ দেন। এই সময় নবাবের আর একটি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এরূপ আশঙ্কা করা হয় যে, আহমদ শাহ আবদালী বিহার আক্রমণ করিবেন। ইহাতে নবাব মনের বল হারাইয়া ফেলেন। তিনি ইংরাজদের সহিত সন্ধি করেন। ইহা আলীনগরের সন্ধি নামে পরিচিত (৯ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭)। ইংরাজগণ বাণিজ্যসুবিধা ফিরিয়া পায় এবং কলকাতার দুর্গ সুরক্ষিত করিবার অনুমতি লাভ করে। এই সন্ধি করিয়া নবাব দুর্বলতার পরিচয় দেন। যদি তিনি এই সময় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিশ্বাসঘাতক সৈন্যাধ্যক্ষদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা ভয় পাইয়া ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিত, কারণ তখনও তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ করিলে নবাবের জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল।

কেবলমাত্র সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতির জন্য ইংরাজগণ নবাবের সহিত সন্ধি করিয়াছিল। এক মাস পরেই তাহারা আলীনগরের সন্ধি ভঙ্গ করে। য়ুরোপে তখন সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) চলিতেছিল। বাংলাদেশে ইংরাজগণ ফরাসীদের চন্দরনগর বাণিজ্য কুঠি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। নবাব ইংরাজ ও ফরাসীগণকে তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে নিষেধ করেন। নবাবের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া ক্লাইভ চন্দরনগর আক্রমণ করেন ও অধিকার করেন (২৩শে মার্চ)। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সৈন্যাধ্যক্ষ রায়দুর্লভ ও মানিকচাঁদ ইংরাজদিগকে বাধা

www.bjilibrary.com

দিতে চেষ্টা করেন নাই। স্ক্রেফটন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইংরাজগণ উমিচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১৫০০ টাকা ঘুষ দিয়াছিল। নন্দকুমার নবাবের সামরিক তথ্যও ইংরাজদের কাছে প্রকাশ করেন।[২১] ইহাতে ইংরাজদের শক্তি ও সাহস বাড়িয়া যায়।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র : ২৩ এপ্রিল (১৭৫৭) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য এক প্রস্তাব পাশ করে। হিল লিখিয়াছেন যে, ক্লাইভ উমিচাঁদকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়িয়া তোলার কাজে ব্যবহার করেন।[২২] নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বস্ত ছিলেন না। নবাব আলীবর্দীর সময় হইতেই মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কুখ্যাতি ছিল। তাঁহাকে কয়েকবার বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য নবাবের নিকট শাস্তি পাইতে হয়। মীরজাফর আলীবর্দীর ভগ্নিপতি ছিলেন। এই জন্য বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় সেনাপতি পদে বহাল করেন। কিন্তু মীরজাফরের স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। মুর্শিদাবাদের মসনদের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল। সিংহাসনের লোভে তিনি নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

ষড়যন্ত্রকারিগণ জগৎশেঠের বাড়ীতে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। জগৎশেঠ উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীরজাফর রাজবল্লব এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগ দেন। ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস মহিলাদের মত পর্দা-ঘেরা পাল্কিতে জগৎশেঠের বাড়ীতে আসেন। এই বৈঠকে সিরাজউদ্দৌলাকে সরাইয়া মীরজফরকে বাংলার মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ওয়াটস এই কাজে ইংরাজদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার পর কোম্পানীর প্রধানগণ চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন। এবং ১৯মে ইহাতে দস্তখত করেন। মীরজাফর ৪ জুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন।[২৩] চুক্তির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে মীরজাফর তাহাদিগকে কয়েকটি বাণিজ্য-সুবিধা দিতে স্বীকর করেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করিতে এবং কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই কোটি টাকা দিতে সম্মত হন। নবাবের কোষগার হইতে উমিচাঁদকে বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া বলা হয়। উমিচাঁদকে প্রতারিত করিবার জন্য ক্লাইভ চুক্তিপত্রের দুটি খসড়া প্রস্তুত করেন। আসল খসড়ায় উমিচাঁদকে টাকা দেওয়ার শর্তের উল্লেখ করা হয় নাই। নকল খসড়ায় এই শর্তটি লিখিত হয়। ইহার দস্তখতগুলি সবই ক্লাইভ জাল করিয়াছিলেন। রায়দুলভকেও লুটের মালের কিয়দংশ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[২৪]

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন। তিনি মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করেন এবং আব্দুল হাদী খানকে সে পদে নিয়োগ করেন। আবদুল হাদী ও মীরমদন মীরজাফরকে ধ্বংস করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন যে, ইংরাজদের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য মীরজাফরের সহযোগিতা লাভ করা নবাবের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে। নবাব তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি মীরজাফরের বাড়ীতে গিয়া নবাব আলীবর্দীর নামে তাঁহার

www.bjilibrary.com

নিকট ইংরাজদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মর্মস্পর্শী আবেদন জানান। পবিত্র কুরআন হাতে লইয়া মীরজাফর এই সময় অঙ্গীকার করেন যে, তিনি নবাবের জন্য ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নামে অঙ্গীকার করায় মীরজাফরকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। নবাব তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আবার প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন।[২৫] বিবেকহীন ও লোভী মীরজাফরকে বিশ্বাস করিয়া নবাব মারাত্মক ভুল করেন। যদি তিনি ঐ সময় মীরজাফর ও তাহার সহচরগণকে বন্দী করিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ ভয় পাইয়া যাইতেন এবং ক্লাইভ তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল সহ কলিকাতা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেন।

পলাশীর যুদ্ধ

গোপন চুক্তি সম্পন্ন করিবার পর ক্লাইভ ইংরাজ সৈন্যদল নিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। হুগলী ও কাটোয়ার বিশ্বাসঘাতক ফৌজদারগণ ইংরাজ সৈন্য বাহিনীকে কোনরূপ বাধা দেন নাই। ক্লাইভের অভিযানের খবর পাইয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে রওয়ানা হন এবং ২২ জুন পলাশী প্রান্তরে শিবিরস্থাপন করেন। ক্লাইভ সেদিন রাত্রে পলাশীতে পৌঁছেন এবং আম্রকুঞ্জের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করেন। ২৩ জুন (১৭৫৭) সকালে নবাবের সৈন্যদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মীরজাফর, খাদেম হোসেন, রায়দুর্লভ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক সেনা নায়কগণ তাহাদের সৈন্য সহ দুই মাইল দূরে থাকিয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। নবাবের বিশ্বস্ত সেনানায়ক মোহনলাল ও মীরমদন প্রবল বেগে ইংরাজদেরকে আক্রমণ করেন। ইহাতে ক্লাইভের সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিয়া আম্রকুঞ্জের আড়ালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মোহনলাল ও মীরমদন ইহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিতে অগ্রসর হন। এই সময় একটি বিক্ষিপ্ত গুলিতে মীরমদন মারা যান। মীরমদনের মৃত্যু সংবাদে নবাব মনোবল হারাইয়া ফেলেন। তিনি মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠান। মীরজাফর সেদিনকার মত যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে পরামর্শ দেন। তিনি নবাবকে আশ্বান দেন যে, তিনি পরের দিন তাঁহার সমস্ত সৈন্যবাহিনী লইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। নবাব বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের পরামর্শে মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ দেন। মোহনলাল ও অপর কয়েকজন সেনানায়কের তীব্র আক্রমণে তখন ক্লাইভের সৈন্যদের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়িয়াছে। মোহনলাল এই রূপ নিশ্চিত জয়ের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে সম্মত হন নাই। নবাব আবার মীরজাফরের সহিত পরামর্শ করেন। মীরজাফর কেবল তাঁহার পূর্ব প্রস্তাবের পূনরাবৃত্তি করেন। নবাব মীরজাফরের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ মোহনলালকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিতে আদেশ দেন। অবশেষে মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শিবিরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৬]

মোহনলালের সৈন্যগণ যখন ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ফিরিতেছিল তখন চতুর ক্লাইভ তাঁহার সৈন্যদলকে লইয়া আশ্রয়স্থল হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং তাহাদিগকে

www.bjilibrary.com

অতর্কিতে আক্রমণ করেন। হঠাৎ আক্রমণে নবাবের সৈন্যগণ ইতস্তত পালাইতে থাকেন। মীরজাফর তাহার সৈন্যসহ ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাবাতাবাই লিখিয়াছেন যে, এই সময় ভিতরের শত্রুর ভয়ে নবাব মনের বল হারাইয়া ফেলেন।[২৭] নবাব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন এবং পরদিন সকালে মুর্শিদাবাদ পৌছেন। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন পলাশীতে নামমাত্র যুদ্ধে ইংরাজদের জয় হয়।

মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার সৈন্যদলকে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ক্লাইভ ও মীরজাফরকে বাধা দিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া তিনি বেগম লুৎফুন্নেসা ও কন্যাকে লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহলের দিকে যাত্রা করেন। তিনি আজিমাবাদে তাঁহার নায়েব নাযিম রামনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজমহলের নিকটে তিনি মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমের হাতে ধরা পড়েন এবং মুর্শিদাবাদে নীত হন। মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যে মুহম্মদী বেগ সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দীন কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল সেই এই নিষ্ঠুর ঘাতকের কাজ করিয়াছিল।

পলাশী যুদ্ধের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার অবসান হয়।[২৯] জুন (১৭৫৭) ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরাজ প্রধানগণ মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মীরজাফর ইংরাজদিগকে উপঢৌকন স্বরূপ বহু অর্থ দেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি কোম্পানীকে প্রচুর টাকা ও বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা দান করেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি কোম্পানীকে ২৪ পরগণার জমিদারী স্বত্ব দিতে বাধ্য হন। মীরজাফর নামমাত্র বাংলার নবাব হন। তাহাকে নবাব করিয়া ইংরাজগণই প্রকৃতপক্ষে বাংলার শাসন ও সামরিক বিষয়ে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে।

মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল। মীরজাফর নবাবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং নবাবের অধিকাংশ সৈন্য মীরজাফরের অধীনে ছিল। ক্লাইভের সহিত গোপন চুক্তি অনুযায়ী মীরজাফর তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকেন। ইংরাজদের সুবিধার জন্য তিনি নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে চক্রান্তমূলক পরামর্শ দেন। ইহাতে ইংরাজগণ নবাবের সৈন্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিতে সুযোগ পায় এবং মীরজাফরও এই সময় ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেন। ইহার ফলে নবাবের পরাজয় অনিবার্য হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া নবাব সিরাজ সময়োচিত দৃঢ়তার পরিচয় দেন নাই। মীরজাফর ও অন্যান্য কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রর বিষয় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় যদি তিনি শক্তহাতে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে পারিতেন এবং পলাশীর বিপর্যয় হইতে বাংলাদেশকে রক্ষা করিতে পারিতেন।

পলাশীর পরাজয়ের আরও কয়েকটি মূল কারণ ছিল। এই সময় বাংলাদেশে চরিত্রের সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। কর্মচারীদের মধ্যে বিবেকহীন স্বার্থপরতা আত্মপ্রকাশ

www.bjilibrary.com

করিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য তাহারা জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে ইতস্তত করিত না। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর ছাড়াও খাদেম হোসেন, ইয়ার লতিফ, রহিম খান, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, নন্দকুমার এবং আরও অনেক সেনানায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী ও জমিদারদের অনেকে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজদের সহিত ষড়যন্ত্র লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং বাংলার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাইতে ক্লাইভকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি সমৃদ্ধ প্রদেশ নবাবের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের শক্তি ও উন্নতির যথেষ্ট সম্ভবনা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু নবাবগণ এই সম্ভবনাগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে অবহেলা করিয়াছেন। তাঁহাদের নৌশক্তি ছিল না বলিলেই চলে। সমুদ্র উপকূলবর্তী ও নদীবহুল বাংলাদেশের জন্য নৌবহরের একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং ইহা গড়িয়া তোলার জন্য প্রচুর উপকরণও ছিল। সম্রাট আওরঙ্গযেবের রাজত্বকালে য়ুরোপীয় নৌশক্তি হইতে বাংলাদেশের যে বিপদ আসিতে পারে সে বিষয়ে আভাস পাওয়া গিয়াছিল। নবাব আলীবর্দী ও ইংরাজদের নৌশক্তি হইতে সম্ভাব্য বিপদের আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মারাঠা হাঙ্গামা ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এই জন্য তিনি নৌশক্তি গঠনে মনোযোগ দিতে পারেন নাই।২৮ নৌবহরের অভাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে অসুবিধায় পড়িতে হয়। তিনি ইংরাজদিগকে স্থলযুদ্ধে পরাজিত করিয়া কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদিগকে হুগলী নদী হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। ইংরাজদের শক্তিশালী নৌবহর ছিল। নৌবহরের সাহায্যে তাহারা মদ্রাজ হইতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আবার হুগলী নদীতে প্রবেশ করে এবং কলিকাতা উদ্ধার করে। নৌবহর না থাকায় নবাবের পক্ষে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বাংলায় ইংরাজদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

মীরজাফরের নবাবী : পলাশী- যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজফর ইংরাজদের হাতের পুতুল ছিলেন। শাসন ব্যাপারে তিনি ক্লাইভ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তাদের আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিতেন। মসনদ রক্ষার জন্য তাঁহাকে ইংরাজ সৈন্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। ১৭৫৯ সালে শাহাজাদা আলী গহর (পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) যখন বিহার আক্রমণ করেন তখন ইংরাজ সৈন্যগণ মীরজাফরের রাজ্য রক্ষা করে। মীরজাফর ইংরাজদের অপমানজনক বাধ্যতায় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "ক্লাইভের গর্দভ" নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে হোসেন তাবাতাবাই একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন মীরজাফর মির্যা শামসুদ্দীন নামক তাঁহার এক সভাসদকে বলেন যে, কর্ণেল ক্লাইভ অভিযোগ করিয়াছেন। যে, শামসুদ্দীন তাঁহার (ক্লাইভ) প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করিয়াছেন। এই কথায় শামসুদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, "আমি কর্ণেলের গর্দভকে (মীরজাফরকে) তিনবার কুর্ণিশ না করা পর্যন্ত সকালে খাদ্যস্পর্শ করি

www.bjilibrary.com

না, আর আমি কর্ণেলকে (ক্লাইভকে) অপমান করিব!"[২৯] মীরজাফরকে তাঁহার সভাসদ ও কর্মচারীগণ কিরূপ অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন এই ঘটনা হইতে আভাস পাওয়া যায়। জনসাধারণ মীরজাফর নাম ঘৃণ্য ও হেয় বলিয়া মনে করিত। তাহাদের নিকট মীরজাফর নাম বলিতে বিশ্বাসঘাতক বুঝাইত।

ইংরাজদের কর্তৃত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মীরজাফর ওলন্দাজ বণিকদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ক্লাইভ ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের শক্তি ধ্বংস করিয়া দেন। ইহার পর মীরজাফরের উপর ইংরাজদের প্রভুত্ব আরও মজবুত হয়।

নবাব মীরকাসিম : ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ বিলাত চলিয়া যান। ক্লাইভের মত পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হারাইয়া মীরজাফর অসহায় হইয়া পড়েন। ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করার পর তিনি ইংরাজদের বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজদের পুনঃ পুনঃ টাকার দাবী মিটাইতে পারিতেছিলেন না। সেই জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হলওয়েল ও ভেনসিটার্ট মীরজাফরকে সরাইয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে মসনদে বসাইবার পরিকল্পনা করেন। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী মীরকাসিমকে মসনদে বসান (অক্টোবর ১৭৬০)। নবাবী পাইবার বিনিময়ে মীরকাসিম ইংরাজ প্রধানদিগকে অর্থ উপঢৌকন দেন এবং বর্ধমান, মেদেনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানীকে দান করেন।

মীরকাসিম নবাবের শাসন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। তিনি কয়েকজন হিন্দু কর্মচারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীর অবাধ্যতায় উত্যক্ত হইয়া উঠেন। এইজন্য তিনি আজিমাবাদের নায়েব নাযিম রামনারায়ণ গুপ্ত পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা রাজা মুরলী ধর এবং রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও অন্যান্যদের গ্রেফতার করেন। ইংরাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করার অপরাধে রামনারায়ণ, রাজবল্লভ, উমেদরায় জগৎশেঠ এবং আরও কয়েকজনের প্রাণদন্ড হয়।[৩০] ইংরাজদের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মীরকাসিম তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গের স্থানান্তরিত করেন। তিনি ইংরাজদের বিনা শুল্কে বে-আইনী ব্যবসায় নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করেন। কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ ইহার বিরোধিতা করায় তিনি সকল বণিকের পণ্যদ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক রাহিত করেন। এই ব্যবস্থার ফলে বাণিজ্যে ইংরাজদের বিশেষ সুবিধা নষ্ট হয়, কারণ তাহাদিগকে অন্যান্য বণিকদের সহিত সম পর্যায়ে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। মীরকাসিমের সহিত ইংরাজদের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। ফলে ইংরাজদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিয়া যায় (১৭৬৩)। কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুতি, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাসিম রাজ্যহারা অবস্থায় অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ দ্বিতীয় বার মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান (১৭৬৩)

মীরকাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সহিত বক্সার নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যদের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। হেক্টর

www.bjilibrary.com

মনরো ইংরাজদের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজগণ জয়লাভ করেন। মীরকাসিম ভগ্ন-হৃদয়ে কয়েক বৎসর অজ্ঞাত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর নিকটে এক জায়গায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বক্সার যুদ্ধের পর ইংরাজগণ অযোধ্যা দখল করে। সুজাউদ্দীন রোহিলখন্ডে আশ্রয় লন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়।

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা মীরকাসিমের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। ইংরাজদের টাকার দাবী মিটাইতে মীরজাফর রাজকোষ শুন্য করিয়া ফেলিয়া ছিলেন এবং বহু ঋণ করিয়াছিলেন। মীরকাসিমকে এই ঋণ পারিশোধ করিতে হয়। তাহা ছাড়া তিনি মসনদে বসিবার জন্য কোম্পনীর কর্মকর্তাদিগকে ২০০,০০০ পাউন্ড দিতে বাধ্য হন। এইজন্য তাঁহার অর্থাভাব হয়। অর্থাভাবের দরুন তিনি ভালভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়ত, নবাবের কয়েকজন হিন্দু কর্মচারী ও জমিদার বিশ্বস্ত ছিলেন না। তাঁহারা ইংরাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেন। জমিদারগণ বেকায়দায় না পড়িলে খাজনা দিতেন না। বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাবের মন্ত্রী মহারাজ বেণীবাহাদুর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজদিগকে সাহায্য করেন। সম্রাটের দীওয়ান সেতাব রায়ও কূটনীতির সাহায্যে ইংরাজদের সাফল্যের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয়ত মীরকাসিমের গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ মর্কা ও আরাটোন আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন নাই। পরিশেষে, সামরিক-শিক্ষা ও সংগঠনে নবাবের সৈন্যগণ ইংরাজ সৈন্যদের সমকক্ষ ছিল না। রণ-কৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রে ইংরাজদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। নবাবের অনিয়ন্ত্রিত সৈন্যগণ স্বভাবতই সুনিয়ন্ত্রিত ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়।

দীউয়ানী ও ক্লাইভের দ্বৈত শাসন

বক্সরের যুদ্ধে জয়ের ফলে বাংলাদেশে ইংরাজদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় মীরজাফর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কোম্পানীর কর্মকর্তাদের ক্রীড়নক ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীস্টব্দে ক্লাইভ দ্বিতীয় বার কোম্পানীর গবর্ণর হইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি পরাজিত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দীনের সহিত সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন (১৭৬৫) ইহা এলাহাবাদের সন্ধি নামে অভিহিত। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী সুজাউদ্দীন ইংরাজদিগকে ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেন এবং এলাহাবাদ ও কোরা জিলাদ্বয় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার বিনিময়ে তিনি তাহাদের নিকট হইতে অযোধ্যা ফিরিয়া পান। ক্লাইভ সম্রাটকে এলাহাবাদ ও কোরো জিলা যৌতুক দেন এবং ইহার বিনিময়ে তিনি তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দীওয়ানী লাভ করেন। সম্রাট এক ফরমানে কোম্পানীকে রাজস্ব শাসনের ক্ষমতা দান করেন (১২ আগস্ট, ১৭৬৫)। কোম্পানী সম্রাটকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করে। এলাহাবাদের সন্ধিতে ইংরাজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বীকৃতি পায়। ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবকে

www.bjilibrary.com

ইংরাজদের সহিত সামরিক মিত্রতায় আবদ্ধ হইতে বাধ্য করেন। এরূপ স্থির হয় যে, কোম্পানী অযোধ্যার সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং নবাব ইংরাজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করিবেন।

পলাশীযুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের সামরিক কতৃত্ব গ্রহণ করে। দীউয়ানী লাভ করিয়া কোম্পানী এদেশের রাজস্ব শাসনের ভার নেয়। শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নবাবের হাতে থাকে। শাসন সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য কোম্পানী নবাবকে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা (পরে ৩২লক্ষ) দিতে সম্মত হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য ক্লাইভ মুহম্মদ রেজা খানকে বাংলার ও সেতাব রায়কে বিহারের নায়েব নিযুক্ত করেন। এরূপ ব্যবস্থা হয় যে, নায়েব দীউয়ানগণ মুর্শিদাবাদের ইংরাজ রেসিডেন্ট ও পাটনার ইংরাজ এজেন্টদের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব শাসনের দায়িত্ব পালন করিবেন। ক্লাইভের প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা দ্বৈত-শাসন (Double Government) নামে অভিহিত হয়।

দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থার ফল শুভ হয় নাই। সৈন্য, রাজস্ব ও ক্ষমতা ছিল কোম্পানীর হাতে, কিন্তু ইহার কোন শাসন দায়িত্ব ছিল না। অন্যদিকে শান্তি ও শাসনের বিরাট দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ও অর্থ ছিল না। অর্থের জন্য তাঁহাকে কোম্পানীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। কোন জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ারও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। ইহাতে বাংলাদেশের শাসনকার্যে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। ঐতিহাসিক কেরী লিখিয়াছেন যে, দ্বৈত-শাসনের ফলে বাংলাদেশে অরাজকতা ও দুর্নীতি মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার মত ক্ষমতা নবাবের ছিল না। ক্লাইভের স্থলাভিষিক্ত গবর্ণর ভেরেলস্ট (১৭৬৭-৬৯) ও কার্টিয়ারের (১৭৬৯-৭২) সময়ে কোম্পানীর কর্মচারী ও বণিক এবং নীলকরদের অর্থ লালসার দরুন ঐশ্বর্যশালী বাংলাদেশ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

১৭৭০ সালে বাংলাদেশে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পূর্বের বৎসর অনাবৃষ্টি বশত ফসল হয় নাই। ইহাতে দেশে খাদ্যশস্যের ভীষণ ঘাটতি হয়। তার উপর ইংরাজ বণিক ও তাহাদের দালালগণ চাউল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য গুদামজাত করিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে বিদেশে চালান দেয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীগণ প্রজাদের নিকট হইতে কড়াকড়িভাবে খাজনা আদায় করে। দরিদ্র প্রজাগণ দুর্মূল্যের জন্য খাদ্যশস্য কিনিতে পারে নাই। ফলে হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যায়। ১০ই মে (১৭৭০) বিলাতের ডিরেক্টরদের সভার (Court of Directors) নিকট এক রিপোর্টে কলিকাতা কাউন্সিল জানান, "দুভিক্ষে এত লোক মারা গিয়াছে যে, ইহা বর্ণনা করা অসম্ভব। সুফলা পুর্ণিয়া প্রদেশের এক তৃতীয়াংশের বেশি লোক মারা গিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও সেইরূপ দুর্দশার কবলে পড়িয়াছে।" উইলিয়াম হান্টার এই দুর্ভিক্ষের করুণ বিবরণ দিয়াছেন। অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণ খাদ্যদ্রব্যের জন্য তাহাদের গবাদি ও জিনিসপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে বিক্রয় করে। কিন্তু ছেলেমেয়ে কিনিবার লোকেরও অভাব হয়। তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা, ঘাস এমনকি মৃতদেহ খাইতে থাকে। অনেক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোক শহরে আশ্রয়

www.bjilibrary.com

লয় এবং সেখানে অনাহারে ও মড়কে মারা যায়। অসংখ্য লোকের মৃতদেহ শহরের রাস্তায় রাস্তায় পড়িয়া থাকে এবং দুর্গন্ধে শহরের আবহাওয়া দূষিত হইয়া পড়ে।[৩২] নবাবের অর্থ ছিল না; সেইজন্য তিনি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য করিতে পারেন নাই। কোম্পানীর হাতে অর্থ ছিল, কিন্তু ইহা দুঃস্থ লোকদের দুর্দশা নিবারণের জন্য কিছুই করে নাই। অধিকন্তু, কোম্পানীর দালালগণ প্রজাদের নিকট হইতে পূর্বের বৎসর অপেক্ষা বেশি খাজনা আদায় করিয়াছে।

শাসন-বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভিক্ষের জন্যে নবাবকে দায়ী করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে কোম্পানীর গভর্ণর নিযুক্ত হন। কার্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন রহিত করেন। তিনি নবাবকে বাংলাদেশের শাসন-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার জন্য বাৎসরিক ১৬ লক্ষ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। কোম্পানী শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এখন হইতে ইংরাজগণ প্রকাশ্যভবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসক রূপে এদেশের রাজনৈতিক জীবনে অবতীর্ণ হয়। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার উপর ভিত্তি করিয়া এদেশে ইংরাজদের শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রদেশের সম্পদ তাহাদিগকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সাহায্য করে। তাহারা কর্ণটক ও হায়দরাবাদে প্রভাব বিস্তার করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের মহীশুর রাজ্য অধিকার করে এবং মারাঠাদের শক্তি ধ্বংস করে। এইভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ইংরাজগণ ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাব এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টব্দে অযোধ্যা হস্তগত করে এবং সমগ্র ভারতে তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলার মুসলমান শাসক পরিবারগুলির পতন

মীরজাফরের পরিবার

মসনদের লোভে মীরজাফর পলাশীর যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং তাহার বিশ্বাসঘাতকতার দরুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা লোপ পায় ও মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য নষ্ট হয়। পুতুল নবাব মীরজাফর তাঁহার ইংরাজ প্রভুগণকে খুশী করিবার জন্য তাহাদিগকে বহু অর্থ দিতে বাধ্য হন। তিনি কোম্পানীর ছয়জন কর্মচারীকে ১৫০,০০০ পাউন্ড প্রদান করেন। তাঁহার নিকট হইতে ক্লাইভ ২৩৪,০০০ পাউন্ড এবং কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্যগণ প্রত্যেকে ৫০,০০০ পাউন্ড হইতে ৮০,০০০ পাউন্ড আদায় করেন।[১] কোম্পানীর ও কলিকাতার অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এবং সৈন্য ও নৌবহরের ব্যয় বাবদ কোম্পানী তাঁহার নিকট হইতে মোট ২৫,৩১,০০০ পাঃ (২২,৫০০,০০০ টাকা) আদায় করে। তাছাড়া মীরজাফর ইংরাজ প্রধানদিগকে ৬৬০,৩৭৫ পাউন্ড (৫,৮৭০,০০০ টাকা) উপঢৌকন স্বরূপ দেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টব্দে তিনি ক্লাইভকে ৩৪,৫৬৭ পাঃ আয়ের দক্ষিণ কলিকাতার জায়গীর দান করেন। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরাজ প্রধানগণ নবাবীর লোভ দেখাইয়া মীরজাফরও তাহার উত্তরাধিকারদের নিকট হইতে ২,১৬৯,৬৬৫ পাঃ লাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানী নবাবদের নিকট হইতে সর্বমোট ১০,৭৩১,৭৮৩ পাউন্ড আদায় করে।[২]

এইভাবে কোম্পানীর কর্মচারীগণ বাংলাদেশ হইতে প্রচুর অর্থ স্বদেশে লইয়া যায়। ক্লাইভের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টে যখন উৎকোচ ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়, তখন তিনি নিজের আচরণ সমর্থন করিয়া বলেন, 'পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আপনারা বিবেচনা করুন; একজন বড় রাজার ভাগ্য আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, একটি সমৃদ্ধ নগর আমার দয়ার প্রতীক্ষায় আছে, আমার মুখের সামান্য হাসিতে কৃতার্থ হইবার জন্য ধনী মহাজনগণ একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, আমার দুই পাশে স্বর্ণ ও মনিমুক্তায় পূর্ণ সিন্দুকের সারি এবং এইগুলি কেবল আমারই জন্য খোলা হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় (পার্লামেন্ট কমিটির), এই মুহূর্তে আমি নিজেই ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই যে, তখন আমি কিরূপে নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছিলাম।"[৩]

ইংরাজদিগকে ক্রমাগত মূল্যবান উপঢৌকন ও উৎকোচ দেওয়ার ফলে মীর জাফরের রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। মীরজাফর কর্মচারী ও সৈন্যদের বেতন দিতে অসমর্থ হন। এইভাবে নবাব পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি নষ্ট হয়। নবাব তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও আশ্রিতদিগকে সাহায্য করিতে ও মুসলমানদিগকে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অপরাগ হইয়া পড়েন।[৪]

www.bjilibrary.com

১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নজমুদ্দৌলা মসনদ লাভের জন্যে কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে ৮,৭৫০০০ টাকা দিতে বাধ্য হন। মুহম্মদ রেজা খান জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভ নায়েব নাযিম পদের প্রার্থী ছিলেন এবং ইহা পাইবার আশায় তাঁহারা কোম্পানীর কর্মকর্তাদিগকে মূল্যবান উৎকোচ দেন। রেজা খান ২৭৫,০০০ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে অপরিণত বয়স্ক নবাবের নায়েব-নাযিম নিযুক্ত হন।[৫]

পলাশী যুদ্ধের পর হইতে নবাবের শাসন ক্ষমতা লোপ পায়। কোম্পানী তাঁহার সামরিক ক্ষমতা কাড়িয়া লয় এবং তাঁহার সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী দীউয়ানী লাভ করায় নবাব রাজত্ব ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। নবাব সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের অনুগ্রহভাজন হইয়া পড়েন। নজমুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সইফুদ্দৌলা (৮ মে, ১৭৬৬) ও সইফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মুবারকুদ্দৌলা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কৃপায় মসনদ লাভ করেন।[৬] ১৭৭২ সালে কোম্পানীর গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস নবাবকে শাসন-দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেন। কোম্পানী বাংলা-বিহার উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ করে। রেজা খান ও সেতাব রায় নায়েব-নাযিমের পদ হইতে অপসারিত হন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রত্যেক জিলায় ইংরাজ কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। নাবাবের ভাতা ৩২ লক্ষ হইতে কমাইয়া ১৬লক্ষ টাকা করা হয়। ভাতা হ্রাসের দরুন নবাব তাঁহার কর্মচারীদের অনেককে বিদায় দিতে এবং বহু আশ্রিত পরিবারের বৃত্তি কমাইয়া দিতে বাধ্য হন।[৭] ওয়ারেন হেস্টিংস নবাবের বিচার বিভাগের দায়িত্বও কাড়িয়া লন। তিনি কলিকাতায় সদর দীউয়ানী আদালত স্থাপন করেন। গভর্ণর ইহার সভাপতি এবং কাউন্সিলের সদস্যগণ ইহার সভ্য ছিলেন। তিনি প্রতি জিলায় একটি দীউয়ানী আদালত স্থাপন করেন। কালেক্টরকে এই আদালতের সভাপতি নিয়োগ করা হয়।[৮] হেস্টিংসের শাসন ব্যবস্থার ফলে শাসন রাজস্ব ও বিচার বিভাগের বহু উচ্চপদ হইতে মুসলমানদিগকে বিদায় লইতে হয়। ফৌজদারী-বিচার বিভাগে মুসলমানদের আসন কিছুটা বজায় থাকে। মুসলিম আইন অব্যাহত থাকে। ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় সদর নিযামত আদালত এবং প্রতি জিলায় একটি ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। সদর নিযামত আদালতের কাজী উল কুজ্জাত, দারোগা (তত্ত্বাবধায়ক) , মুফতি ও মৌলবীগণ এবং ফৌজদারী আদালতের কাজী, মুফতি মৌলবী, মুহরী, ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে মুসলমানদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত।[৯] ওয়ারেন হেস্টিংস কয়েক বৎসর সরকার বিভাগের শাসনকর্তা ফৌজদারের পদ বজায় রাখেন। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফৌজদারের পদ উঠাইয়া দেন এবং বিচার দায়িত্ব কালেক্টর ও দীউয়ানী আদালতের জজদের উপর ন্যস্ত করেন। এইে ব্যবস্থার দরুন অনেক মুসলমান ফৌজদার ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী বেকার হইয়া পড়ে।

হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৮৫-৯৩) শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের আরও ক্ষতি হয়। তিনি নায়েব নাযিমের পদ উঠাইয়া দেন।

www.bjilibrary.com

ইহাতে রেজা খান ও তাঁহার দফতরের বহু কর্মচারী চাকুরী হারান। কর্নওয়ালিস সদর নিযামত আদালতের দারোগার পদ উঠাইয়া দেন এবং তদস্থলে একজন রেজিস্টার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি জিলার ফৌজদারী আদালতগুলি রহিত করেন এবং কলিকাতা মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকায় সারকুইট কোর্ট স্থাপন। সারকুইট কোর্টের জজ ও রেজিস্টারের সাহায্যের জন্য কাজী, মুফতি, মৌলবী, প্রভৃতি নিম্নপদে মুসলমানদিগকে নিয়োগ করা হয়।[১০] কর্নওয়ালিস কালেক্টরদিগকে বিচার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেন। বিচার ও পুলিশ বিভাগের ভার জিলার জজের উপর ন্যস্ত হয়। দীউয়ানী আদালতের সংস্কার করা হয় এবং মুন্সেফ কোর্ট স্থাপন করা হয়।

কর্নওয়ালিসের শাসন-ব্যবস্থার ফলে নবাবের ক্ষমতার শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া যায়। মুবারকুদ্দৌলার উত্তরাধিকারী বাবর জঙ্গ (১৭৯৩-১৮০২)

আলীজা (১৮০২-২১), (ওয়ালাজা ১৮২১-২৪) ও হুমায়ুনজা (১৭২৪-৩৮) শুধু বাংলার নবাব নযিম নামের মর্যাদা বহন করেন। হুমায়ুনজার উত্তরাধিকারী ফরীদুনজা সৈয়দ আবুল মনসুর খান নবাব-নাযিম নামের মর্যাদার শেষ অধিকারী ছিলেন। নবাব ১৬ লক্ষ টাকা ভাতা পাইতেন। ইহার মধ্যে ৭ $\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা তাঁহার নিজের জন্য ব্যয় হইত। বাকী টাকা হইতে পরিবার পরিজন ও আত্মীয়স্বজনকে বৃত্তি দেওয়া হইত এবং অবশিষ্ট টাকা একটি ফান্ডে জমা থাকিত। নবাবের সম্মানার্থে ১৯ বার তোপধ্বনি করা হইত। ফরীদুনজার সময়ে ইহা হ্রাস করিয়া ১৩ করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় তিনি বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করেন। ইহার প্রতিদানে তাঁহাকে ২১ বার তোপধ্বনির সম্মান দেওয়া হয়।[১১]

১৮৬৯ সালে ফরীদুনজা বিলাত যান এবং নবাব-নাযিমের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তিনি কয়েক বৎসর লন্ডন থাকেন। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদে হাঁহার বৈষয়িক অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়ে এবং তাঁহার পাওনাদারদের দাবী মিটাইবার জন্য সরকারকে একটি কমিশন গঠন করিতে হয়। অবস্থার বিপর্যয়ে পড়িয়া ফরীদুনজা নবাব-নাযিম উপাধি ও শাসন ক্ষমতার দাবী ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিয়া সরকারের সহিত চুক্তি করেন (নভেম্বর-১৮৮০)। সরকার তাঁহার ১০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন, তাঁহার জন্য বার্ষিক ১০,০০৯ পাউন্ড বৃত্তি বরাদ্দ করে এবং তাঁহার ছেলেমেয়েদের জন্য ভাতা ধার্য করে। নিযামত ফান্ড উঠিয়া যায়। নবাবের আত্মীস্বজনদের ভাতা সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা হয়। ফরীদুনজা ১৮৮১ সালে স্বদেশে ফিরেন এবং ১৮৮৪ সালে মারা যান।[১২]

ফরীদুনজার পুত্র সৈয়দ হাসান আলী খানকে নবাব বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয়। পরে তিনি আমীরউল উমরা উপাধি লাভ করেন। (১৮৮৭)। সরকার তাঁহাকে বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান দেয় এবং তাঁহার উপাধি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৮৯১ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে। হাসান আলীর উত্তরাধিকারী ওয়াসিফ আলি মির্জা বহু উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার উপাধির তালিকা ছিল, ইহতিসান উল-মূলক,

www.bjilibrary.com

রইসউদ্দৌলা আমীর উল উমরা নবাব স্যার সৈয়দ ওয়াসিফ আলী মির্জা, খান বাহাদুর মহবতজঙ্গ মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, কে, সি, ভি, সি, কে, সি, এস, আই।[১৩]

রেজা খাঁর পরিবার

মুর্শিদাবাদের নবাব-নাযিমদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বহু আমীর-উমরা ও সমৃদ্ধ মুসলমান পরিবারের পতন হয়। ইহাদের মধ্যে মুহম্মদ রেজা খাঁর পরিবার অন্যতম। রেজা খান নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলের খ্যাতনামা চিকিৎসক হাকীম হাজী আলী খাঁর পুত্র ছিলেন।[১৪] রেজা খান আলী বর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহম্মদের কন্যা রাবিয়ার কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি প্রথমে ইসলামাবাদের (চট্টগ্রাম ক্ষৌজদার নিযুক্ত হন। যখন মীরজাফর দ্বিতীয় বার নবাব হন, তখন রেজা খাঁকে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব-নাযিম নিয়োগ করা হয় (১৭৬৩)। রেজা খান নিয়মিত রাজস্ব পাঠাইতে অসমর্থ হন। এইজন্য মীরজাফর তাঁহাকে অপসারিত করেন এবং মুর্শিদাবাদে গৃহবন্দী করিয়া রাখেন। নজমুদ্দৌলার সময়ে রেজা খান নায়েব-নাযিম নিযুক্ত হন এবং মুইনুদ্দৌলা মুযাফফর জঙ্গ উপাধি লাভ করেন (১৭৬৫)।[১৫] কোম্পানীর দীউয়ানী লাভের পর ক্লাইভ রেজা খাঁকে বাংলার নায়েব-দীউয়ান পদেও নিয়োগ করেন (১১আগস্ট, ১৭৬৫)। রেজা খাঁর বার্ষিক বেতন ৯লক্ষ টাকা ধার্য হয় এবং তাঁহাকে একটি জায়গীরও দেওয়া হয়।[১৬]

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত-শাসন উঠাইয়া দিয়া কোম্পানীর শাসন প্রচলন করেন। তিনি মুহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব-নাযিম ও নায়েব দীউয়ানের পদ হইতে সরাইয়া দেন। কলিকাতা কাউন্সিল গবর্ণরের কার্যের বিরোধতা করেন এবং রেজা খাঁকে নায়েব নাযিম পদে পুনঃনিয়োগ করেন ও বার্ষিক ২,৪০,০০০ টাকা বেতন ধার্য করেন (নভেম্বর ১৭৭৫)। তাঁহারা সদর নিযামত আদালত কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন ও ইহার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নয়েব-নাযিমের উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু ১৭৭৮ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কাউন্সিলের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া রেজা খাঁকে সরাইয়া দেন এবং সদর নিযামত আদালতের প্রধান কাজী সদর উল হক খাঁকে নায়েব-নাযিম নিয়োগ করেন। সদর উল-হক খান মুহাফিজ উল মূলক মুইজলদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি এক বৎসর পর মারা যান। ইহার পর বিলাতের কোম্পানীর ডিরেক্টরস সংস্থার (Court of Directors) নির্দেশক্রমে রেজা খাঁকে নায়েব নাযিম পদে পুনর্বহাল করা হয় (১ নবেম্বর ১৭৭৯)[১৭]

১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস নায়েব নাযিমের পদ রহিত এবং সদর নিযামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। রেজ খান গবর্ণর জেরারেলের নিকট নিবেদন করেন যে, তিনি ২৭ বৎসর নায়েব-নাযিম রূপে কোম্পানীর সেবা করিয়াছেন এবং নিযামত দফতর মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে কোম্পানীকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আবেদন করেন যেন গবর্ণর জেনারেল তাঁহার বিশ্বস্ত সেবার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। রেজা খাঁর বহু ঋণ ছিল, পাওনাদারদের তাগাদায় তাঁহার আহার-নিদ্রায় ব্যাঘাত হতে থাকে। কেবল

www.bjilibrary.com

জগৎশেঠের নিকট তাঁহার তিন লক্ষ টাকার ঋণ ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈরাম বেগের মৃত্যু হওয়ায় পরিবার ও আশ্রিতদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁহাকে বহন করিতে হয়। রেজা খাঁ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদুপরি তিনি অমিতব্যয়ী ছিলেন। রেজা খাঁর বিশ্বস্ত সেবার কথা স্বীকার করিয়া কোম্পানী তাঁহার জন্য বাৎসরিক ২,৪০,০০০ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করে এবং বিহারে তাঁহার ৮০ লক্ষ টাকা দামের (তাম্রমুদ্রা) যে জায়গীর ছিল তাহাও তাঁহাকে দান করে। রেজা খান ১৭৯২ সালে মারা যান। তাঁহার পুত্র দিলাওয়ার জঙ্গ পিতার বৃত্তির জন্য আবেদন করেন। কোম্পানী তাঁহার জন্য ১১,২০০ টাকার ও বৈরাম বেগের পরিবারের জন্য ১৩,০০০ টাকার মাসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট করে।[১৯]

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবার

পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পর আলীবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার পরিবার পরিজনদের প্রতি মীরজাফর ও তাহার পুত্র মীরন অমানুষিক অত্যাচার করেন। তাঁহারা সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ১৫ বৎসর বয়স্ক মির্যা মেহদীকে কারারুদ্ধ করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।[২০] মীরজাফর সিরাজ ও আলীবর্দীর পরিবারবর্গের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাযেয়াফত করেন। তাঁহার হৃদয়হীনতা হইতে বেগমগণও রেহাই পান নাই। তিনি সিরাজের বেগম লুৎফুন্নেসা, তাঁহার চার বৎসর বয়স্কা কন্যা, মাতা আমিনা বেগম ও তাঁহার মাতামহী ও আলীবর্দীর বেগম শরীফুন্নেসা ও অন্যান্য মহিলাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘষেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফরকে প্রচুর অর্থ দিয় সাহায্য করিয়াছিলেন, এই ঘষেটি বেগমও মীরজাফরের নির্মম ব্যবহার হইতে অব্যাহতি পান নাই।[২১]

নাবাব পরিবারের মহিলাদের দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়া গোলাম হোসেন তাবাতাবাই লিখিয়াছেন, "মীরজাফর রাজবংশের মহিলাদিগকে অতি জঘন্য অবস্থায় কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন এবং পরে অমর্যাদাজনকভাবে একটি নৌকায় বোঝাই করিয়া তাঁহাদিগকে জাহাঙ্গীরনগরের কারাগারে পাঠাইয়া দেন (ডিসেম্বর ১৭৫৮)। তাঁহার মাথায় উপর সেই সময় একটি কালমেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং তিনি নিবিঘ্ন হইবার জন্য সন্দেহজনক সব কিছু সরাইয়া দেন।" নবাব পরিবারের মহিলাগণ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে জাহাঙ্গীরনগরের কারাগারে দিন কাটাইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সামান্য ভাতা দেওয়া হইত এবং তাহাও রীতিমত দেওয়া হইত না। বেগমদিগকে এত লাঞ্ছনা দিয়াও মীরজাফর ও বিবেকহীন মীরন তাঁহাদিগকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পান নাই। ১৭৬০ সালের জুন মাসে মীরন তাঁহার এক অনুচরকে জাহাঙ্গীরনগরে পাঠান এবং তাহাকে নির্দেশ দেন যেন সে ঘষেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে মুর্শিদাবাদে আনিবার নাম করিয়া নৌকায় তুলিয়া লয় এবং আনিবার সময় নদীর মধ্যে নৌকা ডুবাইয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করে। এই নির্মম অনুচরটি তাহার হৃদয়হীন প্রভুর নির্দেশমত নৌকা ডুবাইয়া ঘষেটি বেগম ও আমিনা বেগমের জন্য সলিল সমাধি রচনা করে। গোলাম হোসেন তাবাতাবাই বলেন যে, এই নিরপরাধ মহিলাদের প্রতি

www.bjilibrary.com

অমানুষিক নির্মমতার জন্য মীরনকে দৈব শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। আলীবর্দীর কন্যাদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতার মাত্র এক সপ্তাহ পরে আজিমাবাদে (পাটনা), মীরনের উপর বজ্রাঘাত হয় এবং ইহাতে তাহার মৃত্যু হয়।

লুৎফুন্নেসা, তাঁহার কন্যা ও শরীফুন্নেসা সাত বৎসর জাহাঙ্গীরনগরের কারাগারে অশেষ দুর্দশা ভোগ করেন। ১৭৬৩ সালে যখন রেজা খান জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব-নাযিম নিযুক্ত হন তখন তিনি তাঁহাদের জন্য সামান্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভের নির্দেশে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠান হয়। কোম্পানী বেগমের জন্য মাসিক ৬০০ টাকা বৃত্তি ধার্য করে।[২২] লুৎফুন্নেসা মীর আসাদ আলী খাঁর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। কয়েক বৎসর পরে আসাদ আলী খান মারা যায়। লুৎফুন্নেসা বেগমকে একটার পর একটা শোকের আঘাত সহ্য করিতে হয়। ১৭৭৪ সালে তাঁহার বিধবা কন্যা ও অল্পবয়স্কা ৪টি কন্যা রাখিয়া মারা যান। লুৎফুন্নেসার দৌহিত্রীদের নাম ছিল শরীফুন্নেসা, আসমাতুন্নেসা, সকিনা ও আমাতুল মেহদী। লুৎফুন্নেসার আবেদনে কোম্পানী বেগমদের ৬০০ টাকার বৃত্তি পুনরায় বরাদ্দ করে লুৎফুন্নেসার জন্য ১০০ টাকা ও দৌহিত্রীদের জন্য ৫০০ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।[২৩] যখন দৌহিত্রীগণ বিবাহ যোগ্য তখন এই সামান্য বৃত্তিতে তাঁহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা শক্ত হইয়া পড়ে। ১৭৮৭ সালের মার্চ মাসে লুৎফুন্নেসা বেগম বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট আবেদন করেন।

লুৎফুন্নেসা বেগম তাঁহার আবেদনে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার-পরিজনদের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার কথা এবং তাঁহাদের অর্থ ও সম্পত্তি লুণ্ঠনের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, তাঁহার দৌহিত্রীদের জীবিকা নিবাহের জন্য কোন জায়গীর বা সম্পত্তি নাই; দৌহিত্রীদের মধ্যে দুই জনের বিবাহ হইয়াছে এবং অন্য দুই জনের বিবাহ ব্যয় বহন করিবার মত সংস্থান তাঁহার নাই। তিনি নিবেদন করেন যে, ন্যায় ধর্ম ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন প্রধান ব্যক্তির অপরাধের জন্য তাহার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দায়ী করা হয় না; কোম্পানী অন্যান্য প্রধানদের পরিবারের ব্যাপারে এই নীতি অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিষয়ে সেরূপ করে নাই। তিনি যাহাতে জীবনের বাকী দিনগুলি মর্যাদা ও সম্মানের সহিত কাটাইতে পারেন, সেইজন্য উপযুক্ত বৃত্তি বরাদ্দের জন্য গবর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করেন।[২৪] কর্ণওয়ালিস তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নবাবের বেগমকে সামান্য ১০০ টাকা মাসিক বৃত্তি সম্বল করিয়া দিন কাটাইতে হয়।[২৫] খোশবাগে আলীবর্দী ও সিরাজের কবরের ব্যয় নির্বাহের জন্য লুৎফুন্নেসা মাসিক ৩০৫ টাকা পাইতেন।[২৬] এই টাকা তিনি নঙ্গরখানা ও কুরআন পাঠের জন্য নিযুক্তকারীদের জন্য খরচ করিতেন। লুৎফুন্নেসা বেগম প্রত্যহ স্বামীর কবরের উপর ফুল দিতেন এবং তাহার আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করিতেন। স্বামীর কবরের পাশে প্রার্থনা করিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হয় (নবেম্বর, ১৭৯০)। তিনি সিরাজের পাশে সমাহিত হন।

www.bjilibrary.com

ঢাকার নায়েব—নাযিম পরিবার

১৬০৯ সাল হইতে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) বাংলা সুবার রাজধানী ছিল। মুর্শিদকুলী খান জাহাঙ্গীরনগর হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। (১৭৭১) জাহাঙ্গীরনগর প্রদেশের নায়েব-নাযিমের রাজধানী করা হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সময়ে জসরত খান জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব-নাযিম নিযুক্ত হন। (১৭৫৭)। ইংরাজদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য নবাব মীরকাসিম জসরত খাঁকে নায়েব-নাযিমের পদ হইতে অপসারিত করেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পুনর্নিয়োগ করেন (১৭৬৫)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র হাসমত জঙ্গ নায়েব নাযিম নিযুক্ত হন (১৭৮১)। নবাব হাস মত জঙ্গের পুত্র নবাব নসরত জঙ্গের (১৭৮৭-১৮২২) সময়ে নায়েব নাযিমের ক্ষমতা লোপ পায়। কর্নওয়ালিস নসরত জঙ্গকে নায়েব-নাযিমের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেন। নসরত জঙ্গ কয়েক বৎসর নায়েব-নাযিম উপাধির মর্যদা বহন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই উপাধিও রহিত করা হয়।[২৭] তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী শামসউদ্দৌলা শুধু নবাব উপাধির অধিকারী হন।

১৮২৪ সালে বিশপ হেবার ঢাকায় আসেন। তিনি নিজ ডায়েরীতে নবাব শামসউদ্দৌলা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নবাবের এখন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই। তাঁহার ভ্রাতা (নসরত জঙ্গ) রাজকীয় পালকিতে চড়িতেন, শামসউদ্দৌলার সে অধিকার নাই যাহা হউক, তিনি ১০,০০০ টাকার মাসিক বৃত্তি পান, সভাসদ ও রক্ষীদল রাখিতে পারেন। তাঁহাকে Highness বলিয়া সম্বোধন করা হয়। যৌবনে তিনি কোম্পানীর শাসনের, বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। তিনি সরকারের সহিত বিবাদ করিয়াছেন, নিজের পরিবারের সহিত ঝগড়া করিয়াছেন' ও অযোধ্যার নবাবের সহিত মিলিয়া সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁহাকে বহু বৎসর কারারুদ্ধ রাখা হয়। তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞান এই দেশীয়দের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। তিনি সুন্দর ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারেন এবং নিজেকে শেক্সপিয়রের একজন সমালোচক বলিয়া মনে করেন।"[২৮]

কোম্পানীর কাগজপত্র হইতে শামসউদ্দৌলার ষড়যন্ত্রের বিষয় জানা যায়। ১৭৯৬ সালে তিনি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর ভারত, আফগানিস্তান ও পারস্যের মুসলমান শাসকদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মস্কট হইতে আরব জাহাজে করিয়া সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবস্থা হয়। কয়েকটি জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আনে এবং সৈন্যগণ শামসউদ্দৌলার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া শামসউদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে (১৭৯৯)। ইহার ফলে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। ১৮০৫ সালে শামসউদ্দৌলাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁহার সাংঘাতিক অপরাধের জন্য ডিরেক্টর সভা তাঁহাকে মুক্তি দিবার পক্ষপাতি ছিলেন না।[২৯] যাহা হইক কোম্পানী তাঁহাকে মুক্তি দেন। ১৮৮২ সালে নসরত জঙ্গের মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করে।

www.bjilibrary.com

নবাব শামসউদ্দৌলা ১৮৩১ সালে মারা যান। তাঁহার পুত্র করিমউদ্দীন তাঁহার উত্তরাধীকারী হন। নবাব করিমউদ্দীন ১৮৩৪ সালে মারা যান। তাঁহার পুত্র নবাব গাযীউদ্দীন হায়দর (পাগলা নবাব নামে পরিচিত) নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮৪৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশের নবাব উপাধি উঠিয়া যায়।৩০ শামসউদ্দৌলা ও তাঁহার পুত্র খুব জাঁকজমকের সহিত থাকিতেন। গাজীউদ্দীন হায়দারের মৃত্যুর পর তাঁহাদের সম্পত্তি নিলামে বিক্রী হয়। তাঁহাদের বহু আশ্রিত পারিবার দুর্দশায় পতিত হয়।৩১

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম জমিদারদের পতন : নূতন জমিদারীর উত্থান

মোগল আমলের প্রারম্ভে বাংলাদেশের জমিদারদের প্রধান্য ছিল। তখন বাংলাদেশকে "বার ভূইয়ার দেশ" বলা হইত। এই "বার ভূঁইয়া বা প্রধান জমিদারদের অধিকংশই মুসলমান ছিল। ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নরপতি দাউদ কররানীকে পরাজিত ও নিহত করার পরও বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বার ভূইয়ারা মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন (১৬১১খ্রীঃ) সম্রাট তাঁহাদের অনেককে তাহাদের জমিদারী জায়গীর-স্বরূপ দান, করেন। মোগল শাসনকালে বাংলাদেশে অনেক কর্মচারীকে জায়গীর এবং বহু আলেম ও ধার্মিক লোককে লাখেরাজ জমি দেওয়া হয়। ইহার ফলে এই প্রদেশের ভূসম্পত্তির অধিকাংশ মুসলমানদের হাতে আসে। এই মুসলমান জমিদার ও ভূসম্পত্তির মালিকগণ বাংলাদেশে মুসলিম শক্তির উৎস ছিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে মুসলমান জমিদারদের ক্ষতি হয় এবং কয়েকটি বড় হিন্দু জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই সময় রাজশাহী ও মুক্তাগাছা এবং দর্পনারায়ণ কানুনগোর রুকনপুর জমিদারীর উৎপত্তি হয় এবং বর্ধমান, নদীয়া ও দিনাজপুরের জমিদার গুলির আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। আরও অনেক ছোট ছোট হিন্দু জমিদারী মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থায় অতিরিক্ত ভূসম্পত্তি লাভ করিতে সুযোগ পায়। নবাব সুজাউদ্দীনের রাজস্ব তালিকা হইতে জানা যায় যে, এই সময় নাটোরের জমিদারীতে ১৩৯টি পরগণা, নদীয়ার জমিদারীতে ৭৩টি, বর্ধমানের জমিদারীতে ৫৭টি, দিনাজপুর জমিদারীতে ৮৯টি, রুকনপুর জমিদারীতে ৫২ টি, কৃষ্ণরাম রায়ের য়ুসুফপুর (যশোহরে) জমিদারীতে ২৩টি, রামদেবের মুহম্মদশাহী (ভূষণা) জমিদারীতে ২৯টি, বিশ্বনাথের ইদ্রাকপুর (ঘোড়ারঘাট) জমিদারীতে ৬০টি পরগণা অন্তভুক্ত ছিল। ইহার পরেও নবাবী আমলে বহু জমিদারী এবং হুজুরী ও মজকুরী তালুক মুসলমানদের হাতে ছিল। তখন সুবাদার, বখশী ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য বাংলাদেশের ৪১০টি পরগণা নির্দিষ্ট ছিল।৩ ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন।

কয়েকটি কারণে কোম্পানীর শাসনকালে মুসলিম জমিদারগুলির অবনতি হয়। প্রথমত কোম্পানী নিলামে রাজস্ব বন্দোবস্তের নীতি অবলম্বন করে। নিলামে যে ঠিকদারগণ বেশি রাজস্ব দিতে স্বীকার করিত, তাহাদিগকে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হইত। এই সময় হিন্দুদের মধ্যে একটি নূতন অর্থশালী ব্যবসায়ী ও বেনিয়া শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের সহিত রাজস্ব নিলামের প্রতিযোগিতায় অনেক মুসলমান জমিদারী হারায়। দ্বিতীয়ত ইংরাজ শাসকগণ প্রথম থেকেই মুসলমানদিগকে অবিশ্বাস করিত। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় লর্ড কর্ন ওয়ালিস মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া হিন্দুদের সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত করেন।

www.bjilibrary.com

তৃতীয়ত মুসলমান জমিদারদের বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা এবং জমিদারী তত্ত্বাবধানে অবহেলা তাঁহাদের অধপতনের অন্যতম কারণ ছিল। তাহা ছাড়া মুসলমান পরিবারে সন্তানসন্ততিদের মধ্যে জমিদারী ভাগ হওয়ার প্রথা থাকায় অনেক জমিদারী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত লইয়া পড়িত। অংশ লইয়া মামলা মকদ্দমা চলিত এবং জমিদারগণ ঋণগ্রস্ত হইয়া জমিদারী বিক্রী করিতে বাধ্য হইতেন।

বাংলাদেশের বার ভূঁইয়াদের নায়ক ঈসা খান সোনারগাঁও জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার জমিদারী ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জিলার ২২টি পরগণায় বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুসা খান ১৬১১ সালে মোগলদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাট তাঁহাকে সোনারগাঁওয়ের জমিদারী জায়গীর স্বরূপ দান করেন। মূসা খান, তাঁহার পুত্র মাসুম খান ও পৌত্র মনোয়ার খান আসাম ও চট্টগ্রাম অভিযানে মোগল সৈন্যদের সহিত যোগ দেন।

ঈসা খাঁর বংশধরগণ সোনারগাঁও হইতে জঙ্গলবাড়িতে তাঁহাদের বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। তাঁহাদের জমিদারী জঙ্গলবাড়ি জমিদারী নামে পরিচিত হয়। মুর্শিদকুলির সময় হইতে এই জমিদারীর অবনতি শুরু হয়। তিনি মোমেনশাহী ও আলেপশাহী নামে ইহার দুইটি বড় পরগণা ছিনাইয়া লন এবং প্রথমটি শ্রীকৃষ্ণ হাওলাদার ও দ্বিতীয়টি শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের সহিত বন্দোবস্ত করেন।[৫] এই ব্যবস্থার ফলে ময়মনসিংহ জিলায় দুইটি বড় হিন্দু জমিদারীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইহারা জঙ্গলবাড়ি জমিদারীর আর কয়েকটি পরগণার বন্দোবস্ত লাভ করে।

মূসা খাঁর পৌত্র হায়াত খাঁর সময়ে জঙ্গলবাড়ির জমিদারগণ ১১টি পরগণার উপর অধিকার বজায় রাখেন। হায়াত খান জমিদারী স্বত্বের নূতন সনদ লাভ করেন। তাঁহার পুত্র হায়বত খাঁর সময়ে জঙ্গলবাড়ি জমিদারী দুই অংশে বিভক্ত হয়। হায়বত খান তাঁহার অংশ লইয়া হায়বতনগরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ৭টি পরগণার জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারী হায়বতনগর জমিদারী নামে পরিচিত হয়। বাকী ৪টি পরগণা জঙ্গলবাড়ি জমিদারদের অধীনে থাকে। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ হায়বত খাঁর পুত্র আবদুল্লাহ খাঁর নিকট হইতে সোনারগাঁও, হোসেনপুর প্রভৃতি ৪টি পরগণা কড়িয়া লন এবং হিন্দু জমিদারদের সহিত ইহাদের বন্দাবস্ত করেন।[৫]

জঙ্গলবাড়ি জমিদারীর দ্রুত অবনতি হয়। ইহা, জঙ্গলবাড়ি জাফরাবাদ কারিখাই ও কত্রাবু-এই চারটি অংশে ভাগ হইয়া যায়। ঋণের দায়ে কারিখাই জমিদারী মুক্তাগাছার জমিদারদের নিকট বিক্রী হয়। কত্রাবু জমিদারী লতিফ খান ও মহবত খান দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়। লতিফ খাঁর উত্তরাধিকারিদের সময়ে কত্রাবুর জমিদারী নিলামে বিক্রী হয়। জাফররাবাদ জমিদারীও বেশিদিন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জঙ্গলবাড়ির জমিদারগণ সব হারাইয়া কেবল হাযরাদি পরগণার মালিকানা রক্ষা করিতে সক্ষম হন। ১৮০০ সালে তাঁহারা জমিদারী স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া সরকারের নিকট হইতে বাৎসরিক ৩৮৪০ টাকা ভাতা গ্রহণ করেন।[৬]

www.bjilibrary.com

জনশ্রুতি অনুযায়ী সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আটিয়া পরগণায় পন্নি পরিবারের জমিদারীর উৎপত্তি হন। ইহার সত্যতা প্রমাণের পক্ষে কোন দলিল নাই। তবে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই যে এই জমিদারীর অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সৈয়দ খান পন্নি এই জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আটিয়া পরগণায় জায়গীর লাভ করেন এবং গোরাই নামক গ্রামে বসবাস করেন। সৈয়দ খান পন্নির পঞ্চতম বংশধর মুনিম খান পন্নির মৃত্যুর পর আটিয়ার জমিদারী তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খোদা নেওয়াজ খাঁর অংশ বড় তরফ ও কনিষ্ঠ পুত্র মাদার খাঁর অংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত হয়। ১৭৮৭ সালে খোদা নেওয়াজের পুত্র আপেল খাঁর নামে বড় তরফের জমিদারী এবং মাদার খাঁর পুত্র আলিয়ার খাঁর নামে ছোট তরফের জমিদারীর বন্দোবস্ত হয়।[৭]

আত্মীয়স্বজনদের দাবী মিটাইতে বড় তরফের জমিদারী ছোট হইয়া পড়ে। বিবাহসূত্রে ধনবাড়ীর চৌধুরীগণ বড় তরফের কিছু অংশ পান এবং পরে কিছু অংশ ক্রয় করেন। বালিয়াদির চৌধুরীগণ ও বগুড়ার জমিদারগণ বড় তরফের কতকাংশ খরিদ করেন। ১৮৫৬ সালে বড় তরফের জমিদার সাদত আলী খান ও তাঁহার বিমাতার মধ্যে সম্পত্তি লইয়া মামলা মকদ্দমা শুরু হয়। ইহাতে সাদত আলীকে জমিদারীর বেশ কিছুটা অংশ ঢাকার নবাব পরিবারের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। সাদত আলী করটিয়ায় বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ওয়াজেদ আলী খান পন্নি করটিয়ার বড় তরফের জমিদার হন।[৮] ভাগ-বাটোয়ারা ও তত্ত্বাবধানের অব্যবস্থার দরুন ছোট তরফের জমিদারীর দ্রুত অবনতি হয়। ১৮০৬ সালে ঢাকার নবাব পরিবার আলিয়ার খান পন্নির দুই কন্যার অংশ ক্রয় করেন। আত্মীয়তা সূত্রে পাকুলিয়ার চৌধুরী গণ ছোট তরফের কিছু অংশ পান।[৯] অর্থসঙ্কটের জন্য ছোট তরফকে প্রায়ই কিছু কিছু অংশ বিক্রয় করিতে হয়। ফলে ইহার সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকে। ইহার পর ছোট তরফ জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত হয়।[১০]

জোয়ারশাহী পরগণা ঈসা খাঁর সোনারগাঁও জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৮৭ সালে মনোহর খান ও নূর হায়দার চৌধুরী এই পরগণার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন এবং দুইটি জমিদারী স্থাপন করেন। তাঁহাদের পরিবার দীউয়ান পরিবার বলিয়া পরিচিত হয়। মনোহর খার জমিদারী দোশকোশা ও নূর হায়দার চৌধুরী জমিদারী নওকোণা নামে অভিহিত হইত; ইটনা ও হাউলিবাড়ী যথাক্রমে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। মনোহর খাঁর কন্যা লতিফা বিবি দোশকোশা জমিদারীর কিছু অংশ পান। ইহা লতিফপুর জমিদারী নামে পরিচিত হয়। পরে লতিফপুর জমিদারী ধানকুরার হিন্দু জমিদারের নিকট বিক্রয় হয়। রাজস্ব অনাদায়ের দরুন দোশকোশা ও নওকোণা জমিদারীদ্বয়ের অধিকাংশ হাতছাড়া হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নওকোণা জমিদারীর অস্তিত্ব লোপ পায় এবং দোশকোশা জমিদারী কোন রকমে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।[১১]

www.bjilibrary.com

ভাওয়ালের গাযী পরিবার মুসলমান আমলের পুরাতন ও শক্তিশালী জমিদারদের অন্যতম ছিলেন। ফযল গাযী এই বংশের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর গাযী মূসা খাঁর মিত্র ছিলেন। ১৬১১ সালে তিনি জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে ভাওয়াল পরগণার জমিদারী জায়গীর স্বরূপ পান।[১২]

একটি বাদশাহী ফরমান হইতে জানা যায়, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে বাহাদুর গাযীর পৌত্র ফযল গাযী ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন এবং জমিদারীর দেয় রাজস্ব ৪৮,৩০০ টাকা ধার্য হয়।[১৩] ফযল গাযীর বংশধরদের অমিতব্যয়িতার জন্য ভাওয়ালের জমিদারীর অধঃপতন হয়। দৌলত গাযী জমিদারী তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দীউয়ান কুলধজ রায়ের হাতে ছাড়িয়া দেন। কুলধজ ও তাঁহার পুত্র বলরাম গোপনে জমিদারীর অনেকাংশ আত্মসাৎ করেন। এইভাবে গাযীদের সমস্ত জমিদারী হাতছাড়া হইয়া যায়। আত্মসাৎকারীদের হাত হইতে জমিদারী ফিরিয়া পাইবার জন্য সুলতান গাযী ১৭৭৯ সালে কোম্পানী সরকারের নিকট আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ইহার পর ভাওয়ালের গাযী পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়েন।[১৪]

কুমিল্লা জিলার সরাইল পরগণা ঈসা খাঁর জমিদারীভুক্ত ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সোনা গাযী সরাইলের জমিদার ছিলেন।[১৫] সম্ভবত সোনা গাযী ঈসা খাঁর আত্মীয় ছিলেন এবং আত্মীয়তাসূত্রে সোনারগাঁওয়ের জমিদারের নিকট হইতে সরাইলের অধিকার পাইয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের আমলে মজলিস গাযী সরাইলের জমিদার ছিলেন। সরাইলের জমিদারগণ দীউয়ান পরিবার বলিয়া পরিচিত হন। সম্রাট আওরঙ্গযেবের সময়ে সরাইল নওয়ারা মহল বলিয়া গণ্য হয় এবং ইহার জমিদারকে মোগল সৈন্যদলের সাহায্যের জন্য নৌবহর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সরাইলের জমিদারী ভাগবাটোয়ারা হইয়া যায় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইহা তিনটি পরিবারের নামে পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত হয়। তাঁহারা বেশিদিন জমিদারী রক্ষা করিতে পারেন নাই। কাসিমবাজারের হিন্দু জমিদারগুণ তাঁহাদের জমিদারীর অধিকাংশ ক্রয় করেন। ১৮৫৬ সালের পর দীউয়ানদের সম্পূর্ণ জমিদারী হাতছাড়া হইয়া যায়।[১৬]

বরদাখাল ও গঙ্গামন্ডল পরগণাদ্বয় ঈসা খাঁর সোনারগাঁও জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অষ্টদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দুইটি পরগণা লইয়া আগা সাদেকের বরদাখাল জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈসা খাঁর পরিবারের সহিত সাদেকের আত্মীয়তা ছিল। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে আগা সাদেক মোগল সম্রাটের নিকট হইতে পইটকারা পরগণারও মালিকানা স্বত্ব লাভ করেন। মুর্শিদ কুলীর সময়ের রাজস্ব-তালিকা হইতে জানা যায় যে, ১৭২২ সালে আগা সাদেকের পুত্র মির্যাভেল বরদাখাল ও গঙ্গামন্ডলের জমিদার ছিলেন। এই সময় আবদুল হোসেন নামক আগা সাদেকের এক আত্মীয় পইটকারা পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন এবং ইহার রাজস্ব ৯৪,৬৩৮ টাকা ধার্য হয়।[১৭]

www.bjilibrary.com

বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার দরুন করদাখাল জমিদারীর রাজস্ব বাকী পড়িয়া যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জমিদারীর অধিকাংশ হাতছাড়া হইয়া যায়। বরদাখাল পরগণার কতকাংশ ঢাকার নবাব পরিবার ক্রয় করেন এবং বাকী অংশ ৫২টি তালুকে বিভক্ত হয়। বরদাখালের সামান্য অংশ আগা সাদেকের বংশধরদের দখলে থাকে। ১৮৭০ সালে ইহাও হস্তচ্যুৎ হয়।

আগা সাদেকের পৌত্রী রওশন আরা বেগম উত্তরাধিকারসূত্রে গঙ্গামন্ডল পরগণা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে গঙ্গামন্ডল জমিদারীর সূত্রপাত হয়। রওশন আরার উত্তরাধিকারী আসাদুল্লাহ বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ইহার ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং ঋণের দায়ে ১৭৯০ সালে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের নিকট জমিদারী বিক্রয় করিয়া ফেলেন। পরে কলিকাতার শোভাবাজারের জমিদারগণ ঠাকুর পরিবারের নিকট হইতে গঙ্গামন্ডল ক্রয় করেন।[১৮]

পইটকারা জমিদারীরও দ্রুত অবনতি হয়। আবদুল হোসেনের উত্তরাধিকারী মির্যা জান নাবালক ছিলেন। ইহার ফলে জমিদারীতে অব্যবস্থা দেখা দেয় এবং রাজস্ব বাকি পড়ে। বকেয়া রাজস্বের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পইটকারা জমিদারীর অবসান হয়। ভূকৈলাসের ঘোষালেরা পইটকারা ক্রয় করিয়া লন।[১৯]

কুমিল্লা জিলার হোমনাবাদ পরগণায় মুসলমান আমলের একটি জমিদারী ছিল। এরূপ জানা যায় যে, আমীর মির্যা হুমায়ুন খান হোমনাবাদ জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাহজাদা বাহরুজ খান নামেও পরিচিত। হুমায়ুন খান ১৭২৩ সালে মোগল সম্রাটের নিকট হইতে মোহনাবাদ পরগণার জমিদারী লাভ করেন। ইহার দেয় রাজস্ব ৭০৩২ টাকা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীকালে সন্তানসন্ততির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার দরুন হোমনাবাদ জমিদারী ৯৭টি ছোট ছোট জমিদারীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পশ্চিমগাঁওয়ের জমিদার মুহম্মদ আলী নেওয়াজ চৌধুরী ও বদরুন্নেসা চৌধুরাণী আমীর মির্যা হুমায়ুন খাঁর বংশধর ছিলেন। খান বাহাদুর সৈয়দ হোসেন হায়দারের পিতামহী হোমনাবাদ জমিদার বংশের ছিলেন এবং এই সূত্রে তিনি জমিদারীর অংশ পাইয়াছিলেন।[২০]

কুমিল্লা জিলার রূপসায় মুসলমান জমিদারী ছিল। সিঙ্গারগাঁওয়ের স্বাধীন ভূস্বামীদের হইতে রূপসা জমিদারীর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।[২১]

ভুলুয়ার (নোয়াখালী) জমিদার অনন্তমাণিক্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। মোগল সৈন্যরা ভুলুয়া আক্রমণ করিলে তিনি আরাকানে পলায়ন করেন। ইহার পর নোয়াখালী জিলায় কয়েকটি মুসলমান জমিদারীর উৎপত্তি হয়। জনশ্রুতি আছে যে, আবদুল্লাহ ও সানাউল্লাহ নামে দুই ভাই সম্রাট মুহম্মদ শাহের নিকট হইতে আমীরাবাদ পরগণার বন্দোবস্ত পান এবং এখানে জমিদারী স্থাপন করেন। রাজস্ব আদায়ের অব্যবস্থার দরুন পরে আমীরাবাদ জমিদারী অনেকগুলি তালুকে বিভক্ত হয় এবং ১৭৯৫ সালে ইহার দেয় রাজস্ব ৯৫,০০০ টাকা নির্দিষ্ট হয়।[২২]

নোয়াখালী জিলার দান্দ্রা ও এলাহাবাদ পরগণা দুইটি মুসলমানদের শাসনকালে একজন মুসলমান সামরিক কর্মচারীকে জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হয়। নবাব সুজাউদ্দীনের

www.bjilibrary.com

সময়ের রাজস্ব তালিকা হইতে জানা যায় যে, ১৭২৮ সালে মুহম্মদ আরিফাত চৌধুরী দান্দ্রা ও এলাহাবাদের জমিদার ছিলেন এবং তিনি ৭৪৮৬ টাকা নবাব সরকারের রাজস্ব দিতেন। ১৭৯০ সালে এই জমিদারী দুই অংশে ভাগ হইয়া যায় এবং দান্দ্রা ও এলাহাবাদে দুইটি পৃথক জমিদারীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে দান্দ্রা জমিদারী পাঁচ অংশে এবং এলাহাবাদের জমিদারী দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দান্দ্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীগুলি বেশি দিন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই। ১৮৬১ সালে দেখা যায় যে, দান্দ্রা জমিদারীর অতি সামান্য অংশ পুরাতন জমিদার পরিবারের বংশধর মুহম্মদ আরসাদ ও আফরুন্নেসা বেগমের অধিকারে আছে।[২৩]

চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রত্যন্ত জিলা ছিল। চট্টগ্রামের পরে আরাকান রাজ্য অবস্থিত ছিল। সীমান্ত জিলা হিসাবে চট্টগ্রামের সামরিক গুরুত্ব ছিল। এইজন্য এখানে সৈন্যদল ও নৌবহর রাখিবার ব্যবস্থা ছিল এবং সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত সামরিক কর্মচারীদিগকে জায়গীর দেওয়া হইত। জেম্‌স গ্রান্ট লিখিয়াছেন যে, মুর্শিদ কুলী খান ও সুজাউদ্দীনের শাসনকালে চট্টগ্রাম জিলার বার্ষিক রাজস্ব ১,৭৬,৭৯৫ টাকা ছিল এবং এই রাজস্ব নিম্নলিখিত খাতে বরাদ্দ হইয়াছিল :

১। জায়গীর আশাম, সৈন্যদের জন্য	১,৫০,০০০
২। জায়গীর মাশরূত জৌজদারী সৈন্যাধ্যক্ষদের	২৪,০০০
৩। জায়গীর নওয়ারা, নৌবহরের জন্য	২,৫৪৪

সামরিক কর্মচারিগণ সীমান্ত রক্ষার জন্য সৈন্যদল রাখিতেন। ১৭৬০ সালে কোম্পানী মীরজাফরের নিকট হইতে চট্টগ্রাম জিলার অধিকার লাভ করে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মুসলমান আমলের সামরিক জায়গীরদারদিগকে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব হইতে অব্যাহিত দেয় এবং তাহাদিগকে জমিদার বলিয়া গ্রহণ করে। জেমস্ গ্রান্টের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৭৬০ সালে চট্টগ্রামে জমিদারদের সংখ্যা ১৪০০ ছিল। এই জমিদারদের অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। মহাসিংহ ১৭৫৩ হইতে ১৭৫৯ পর্যন্ত চট্টগ্রামের দীউয়ান ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুকে নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। ইহার ফলে চট্টগ্রামে অনেকগুলি হিন্দু জমিদারীর উৎপত্তি হয়। গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল একটি জাল সনদের বলে চট্টগ্রাম জিলার বিস্তৃত অঞ্চলে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের মতে তাঁহারা ভেরেলস্টের নিকট হইতে এই সনদটি পাইয়াছিলেন।[২৪] কোম্পানীর শাসনকালে মুসলমান জমিদারগুলির দ্রুত অবনতি হয় এবং ইহাদের অধিকাংশ হিন্দু জমিদারদের হস্তগত হয়।

আগা বাকর বরিশালের বুযুর্গ-উমেদপুর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এইরূপ মনে করা হয় যে, তাঁহার নাম হইতে বাকরগঞ্জ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বুযুর্গ - উমেদপুর পরগণা ও সলিমাবাদ পরগণায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আগা বাকরের বুযুর্গ-উমেদপুর জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি নবাব আলীবর্দী খাঁর সমসাময়িক ছিলেন। গোলাম হোসেন তাবাতাবাই ও অন্যান্য সমসায়িক ইতিহাস লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, আগা বাকর সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মুহম্মদ সাদেক

www.bjilibrary.com

জাহাঙ্গীরনগরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মুহম্মদ সাদেক জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব-নাযিমের প্রতিনিধি হোসেন কুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও নায়েব হুসামুদ্দীনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে জড়িত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। হুসামুদ্দীনের সমর্থকগণ ইহার প্রতিশোধে আগা বাকরকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করে। মুহম্মদ সাদেক কোন রকমে পালাইতে সমর্থ হন; পরে তিনি নিহত হন।[২৫]

আগা বাকর ও তাঁহার পরিবারের দুর্দশা এবং মুর্শিদাবাদের সে সময়কার রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়া জাহাঙ্গীরনগরের দীউয়ান রাজবল্লভ বুযুর্গ-উমেদপুর জমিদারী হস্তগত করিয়া লন। মীরজাফর নবাব হইয়া রাজবল্লভকে বুযুর্গ-উমেদপুরের জমিদারী স্বত্ব দান করেন। রাজবল্লভের পরিবার বেশি দিন বুযুর্গ-উমেদপুর জমিদারী ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজবল্লভ ও তাঁহার পুত্র বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নবাব মীরকাসিমের আদেশে প্রাণ হারান। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁদের জমিদারী ভগ্নদশায় পতিত হয়। ভূকৈলাশের ঘোষালগণ রাজবল্লভ পরিবারের নিকট হইতে সলিমাবাদ পরগণা ক্রয় করেন। বুযুর্গ-উমেদপুর পরগণায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র জজিদারী ও তালুকের সৃষ্টি হয়।[২৬]

বরিশাল জিলার নাযিরপুর পরগণায় মুসলমান আমলের একটি জমিদারী ছিল। সৈয়দজান নাযিরপুর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জানা যায় যে, তিনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নাযিরপুর পরগণার বন্দোবস্ত লাভ করেন। ১৭৭৪ ও ১৭৭৭ সালের রাজস্ব তালিকায় সৈয়দ জানের বংশধর ইমামুদ্দিনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজস্ব তালিকায় ইমামুদ্দিনকে নাযিরপুরের জমিদার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে এই জমিদারীর খুব ক্ষতি হয়। রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার জমিদারগণ আর্থিক সংকটে পড়িয়া যান এবং ১৮১৯ সালে ঠাকুর পরিবারের নিকট জমিদারী বিক্রি করিয়া দেন।[২৭]

মুসলমানদের শাসনকালে দক্ষিণ শাহবাজপুর জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মির্যাজান দক্ষিণ শাহবাজপুর ও শ্রীরামপুর এই দুইটি পরগণার বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন। কোম্পানীর আমলে দক্ষিণ শাহবাজপুরের জমিদারগণ অতিরিক্ত রাজস্বের দাবী মিটাইতে অসমর্থ হন। ইহার ফলে ১৭৮০ হইতে ১৭৮৬ সালের মধ্যে তাহাদিগকে জমিদারীর অনেকাংশ বিক্রয় করিতে হয়। তাঁহাদের হাতে অতি সামান্য অংশ বাকি থাকে। দক্ষিণ শাহবাজপুরের জমিদারগণ ঢাকায় বাস করিতেন। ঢাকায় তাঁহারা মির্যা সাহেব নামে পরিচিত।[২৮]

বরিশালের শায়েস্তাবাদ পরগণায় একটি মুসলমান জমিদারী ছিল। সম্ভবত বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর নামানুসারে শায়েস্তাবাদ পরগণার নামকরণ হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে ইরিচ খান নামক একজন সামরিক কর্মচারী নবাবের নিকট হইতে শায়েস্তাবাদ পরগণার জায়গীর পান। ইরিচ খান শায়েস্তার জমিদারী নিজ কন্যাকে দান করেন এবং তাঁহার কন্যা ইহা মুহম্মদ হানিফ খান চৌধুরীর সহিত মেয়াদী স্বত্বে বন্দোবস্ত করেন। মুহম্মদ হানিফখান চৌধুরীর মৃত্যুর পর

www.bjilibrary.com

তাঁহার কন্যা শায়েস্তাবাদ জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হন। ইহার পর কন্যার সন্তান-সন্ততিগণ জমিদারীর মালিক হয়। তাঁহার পুত্র সৈয়দ আসাদ আলীর সহিত ১৭৯৩ সালে শায়েস্তাবাদ জমিদারীর বন্দোবস্ত হয়। সৈয়দ আসাদ আলীর তিন পুত্র আববাস আলী, ইমদাদ আলী ও গোলাম আলী পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন।[২৯] শায়েস্তাবাদের জমিদারগণ নিজদিগকে সৈয়দ বলিয়া দাবী করিতেন। শায়েস্তাবাদ পরগণা ছাড়াও সুলতানাবাদ পরগণার কিছু অংশ এবং সুন্দরবনের আউলা ফুলঝুরির কতক অঞ্চল তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। চারামনের নিকট আইলাতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। শায়েস্তাবাদের জমিদারগণ বাকরগঞ্জ জিলার প্রতিপত্তিশালী মুসলমান পরিবার ছিলেন।[৩০]

মুসলমানদের শাসনকালে বরিশাল জিলার মৈজর্দী পরগণায় একটি মুসলমান জমিদারী ছিল। মৈজর্দী জমিদারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবদুল গফুর। কোম্পানীর শাসনকালে আবদুল গফুরের বংশধরদের অবস্থার অবনতি হয়। আর্থিক সংকটে পড়িয়া তাঁহারা জমিদারীর অধিকাংশ বিক্রী করিতে বাধ্য হন। ইহার অতি সামান্য অংশ তাঁহাদের অধিকারে থাকে।[৩১] এই জিলার ইদ্রাকপুর পরগণায় মুসলমান আমলের একটি জমিদারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আমিরুন্নেছা, আবিদুন্নেছা ও করিমুন্নেসা ইদ্রাকপুর জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। ১৭৮৪ সালে ইমামুদ্দিন চৌধুরী এই জমিদারীর কতক অংশ খরিদ করেন। পরবর্তীকালে লৌহ জঙ্গের কুন্ডু পরিবার ও কার্তিকপুরের নাযিমুদ্দীন চৌধুরী ইদ্রাকপুর জমিদারীর অনেকাংশ ক্রয় করেন। ইহার ফলে এই জমিদারীর নামমাত্র বজায় থকে।[৩২]

মুসলমানদের সময় হইতে বরিশালের বাঙ্গোরা পরগণায় মুসলমান পরিবারের জমিদারী ছিল। কোম্পানীর শাসনকালে বাঙ্গোরা জমিদারী প্রায় এক হাজার তালুকে বিভক্ত হইয়া যায়।[৩৩] এই জিলার সুলতানপুর পরগণায় এক প্রাচীন মুসলমান পরিবারের জমিদারী ছিল। সৈয়দ আবদুল্লাহ চৌধুরী এই পরিবারের বংশধর ছিলেন। সুলতানপুরে চৌধুরীগণ জমিদারীর অর্ধিকাংশ ঢাকার খাজা আহসানউল্লার নিকট বিক্রি করেন। তাঁহাদের অবশিষ্ট জমিদারী ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে।[৩৪] তরফ রায় হরিচরে এক মুসলমান পরিবারের জমিদারী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই জমিদারীর অস্তিত্ব লোপ পায়।[৩৫] এই সমস্ত জমিদারী ছাড়াও বরিশাল জিলায় মুসলমানদের বহু তালুক ছিল। কোম্পানীর সময়ে ইহাদের অধিকাংশ অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে।[৩৬]

মুসলমান আমলে ফরিদপুরের নাম ছিল ফতেহাবাদ। মজলিস কুতুব ফতেহাবাদের একজন বড় জমিদার ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে ফতেহাবাদের জায়গীর প্রাপ্ত হন।[৩৭] ফতেহাবাদ জমিদারীর পরবর্তী ইতিহাস জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সীতারাম রায় ফতেহাবাদ ও ভূষণা (যশোহর) দখল করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। মুর্শিদ কুলি সীতারামকে পরাজিত

www.bjilibrary.com

ও নিহত করিয়া তাঁহার জমিদারী নাটোরের রামজীবন ও অন্যান্য জমিদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন।

আগা মোতাহার হুগলী জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় তিনি হুগলী জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন। ১৭২৯ সালে আগা মোতাহারের মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা মন্নুজান জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হন। মন্নুজানের বিধবা মাতা হাজী ফয়জুল্লাহ নামক এক ব্যবসায়ীকে বিবাহ করেন। ১৭৩০ সালে ফয়জুল্লাহ এক পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং ইহার নাম মুহম্মদ মহসিন রাখেন। এই সন্তান পরে হাজী মুহম্মদ মহসিন নামে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে দানশীলতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ১৭৫২ সালে মহসিন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নি মন্নুজানকে হুগলীর ফৌজদার মির্যা সালাহউদ্দীনের সহিত বিবাহ দেন। ১৭৫৮ সালে সালাহউদ্দীন খুলনা জিলায় অবিস্থত সৈয়দপুরের জমিদারী ক্রয় করেন। কলিকাতার নিকটে তাঁহার একটি জায়গীর ছিল। ১৭৬৪ সালে সালাহ উদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। মন্নুজান স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন।[৩৮]

মহসিন খুব ধর্মপরায়ণ ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তিনি মক্কা শরীফে হজ করিতে যান। হজের পর তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ২৭ বৎসর পর ভগ্নি মন্নুজানের অনুরোধে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। মন্নুজান বেগম ১৮০৩ সালে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হুগলী কলিকাতা ও সৈয়দপুরের জমিদারী এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উইল করিয়া হাজী মুহাম্মদ মহসিনকে দিয়া যান। মহসিন অবিবাহিত ছিলেন এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁহার কোন লোভ ছিল না। তিনি ১৮০৬ সালের ৩০ এপ্রিল তাঁহার বিশাল সম্পত্তি মুসলমনাদের ধর্ম কার্যে সাহায্যের জন্য ওয়াকফ্ করিয়া দেন।[৩৯] হাজী মুহাম্মদ মহসিনের ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজে খুব সাহায্য করিয়াছিল।

চব্বিশ পরগণা জিলার আজিমাবাদ পরগণায় মুসলমানদের একটি জমিদারী ছিল। ১৭৫৮ সালে কোম্পানীর কৃর্তপক্ষ আজিমাবাদের জমিদার সালেহর নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লন।[৪০]

বীরভূম জমিদারী মুসলমানদের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ জমিদারী ছিল। বীরভূম জিলা দেওগড় মহকুমা ও সাওতাল পরগণা বীরভূম জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জমিদারীতে মোট ২২টি পরগণা ছিল। বীরভূমের জমিদারগণ রাজা উপাধি ধারণ করিতেন। এই বংশের আসাদুল্লাহ খান, বদিউজ্জামান খান ও আসাদুজ্জামান খান মুর্শিদাবাদের নবাবদের সমসাময়িক ছিলেন।[৪১] কোম্পানীর রাজস্বনীতির দরুন বীরভূম জমিদারীর খুব ক্ষতি হয়। ১৭৬৫ সালে ইহার দেয় রাজস্ব ৮ লক্ষ হইতে বাড়াইয়া ১৩ লক্ষ টাকা করা হয়। ১৭৭০ খ্রীস্টব্দের মন্বন্তরে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বীরভূমের অসংখ্য প্রজা মারা যায় এবং জমি অনাবাদী থাকে। অনশনক্লিষ্ট প্রজাগণ খাজনা দিতে অসমর্থ হয়। এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও ইংরাজ বণিকদের দালান ও নীলকরদের দৌরাত্ম হইতে প্রজাগণ অব্যাহতি পান নাই। দুর্দশাগ্রস্ত প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়

www.bjilibrary.com

করিতে না পারিয়া জমিদার বাহাদুর জামান রাজস্ব কমাইবার জন্য আবেদন করেন, কিন্তু কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করেন। ১৭৮৬ সালে বকেয়া রাজস্বের জন্য কোম্পানীর সরকার্ বীরভূমের জমিদারকে কারারুদ্ধ করে এবং তাঁহার জমিদারী বাযেয়াফত করে। এক বৎসর পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং জমিদারী প্রত্যর্পণ করা হয়। এই সময় জমিদারীর দেয় রাজস্ব ৬,১১,৩২১ টাকা ধার্য হয়।

বাহাদুর জামানের পুত্র মুহম্মদ জামান খাঁর সহিত ১৭৯৩ সালে বীরভূম জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং ইহার দেয় রাজস্ব ৬ সমস্ত ২ ভাগের ১ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট হয়। জমিদার পরিবারের বিলাসিতা ও প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ে অব্যবস্থার দরুন মুহম্মদ জামান নিয়ম মত রাজস্ব দিতে অসমর্থ হন। এইজন্য কোম্পানীর কর্মচারীগণ বীরভূম জমিদারী খন্ড খন্ড করিয়া বিক্রয় করে। ১৮০০ সালের মধ্যে এই জমিদারীতে দুই শতেরও বেশি ছোট ছোট জমিদারীর সৃষ্টি হয়; শুধু সারনাথ দেওগড় ও ঘনটিয়া জমিদারদের হাতে থাকে এবং পরে এইগুলিও একজন ইংরাজ দালালকে মেয়াদী স্বত্বে দেওয়া হয়। জমিদারীর আরও অবনতি হয়। ১৮৮৮ সালে নাগর শহরে অবস্থিত তাঁহাদের ধ্বংসপ্রায় রাজপ্রসাদ ও আবাসভূমি ঋণের দায়ে বিক্রী হয়। পর বৎসর রাজা উপাধিধারী শেষ জমিদার মুহম্মদ জোহরুজ্জামান নিজ সন্তানদিগকে নিঃস্ব অবস্থায় রাখিয়া মারা যান।[৪২] অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রংপুর জিলায় মহীপুর জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কাজীরহাট জমিদারী নামেও পরিচিত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহম্মদ আরিফ চৌধুরী। তাঁহার পুত্র আমিন চৌধুরীর সহিত ১৭৯৩ সালে জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। পরবর্তীকালে আর্থিক কারণে এনায়েতুল্লাহ চৌধুরী মহীপুর জমিদারীর অনেকাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। খানবাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী এই জমিদার পরিবারের অন্যতম বংশধর ছিলেন।[৪৩]

আওরঙ্গযেবের রাজত্বকালে বগুড়ার সিলবার্সা জমিদারীর পত্তন হয়। ১৬৭৫ সালে সৈয়দ আহমদ সিলবার্সা পরগণার চৌধুরী নিযুক্ত হন এবং ইহার দেয় রাজস্ব ৩৭,২০৩ টাকা নির্দিষ্ট হয়। তাঁহার বংশধরগণ এই পরগণার স্বত্ব বজায় রাখেন। নবাব আলীবর্দীর সময়ে সিলবার্সা জমিদারী দুই অংশে বিভক্ত হয়। সৈয়দ আলতাফ আলী সিলবার্সা জমিদারীর অন্যতম উত্তরাধিকারী ছিলেন।[৪৪] সাবেক পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী সৈয়দ আলতাফ আলীর পুত্র। বগুড়া ও রাজশাহী জিলায় মুসলমানদের কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র জমিদারী ছিল। বৃটিশ আমলে ইহাদের কয়েকটির অস্তিত্ব ছিল।[৪৫]

নূতন জমিদারী : ঢাকার নবাব পরিবার

কোম্পানী আমলে মুসলমানদের পুরাতন জমিদারীগুলির অবনতি ও পতন হয়। এই সময় একটি নতুন মুসলমান জমিদারীর অভ্যুত্থান হয় এবং ইহা ছিল ঢাকার নবাব পরিবারের জমিদারী। খাজা আবদুল হাকিম ও মৌলবী আবদুল্লাহ্ এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহাদের পরিবার প্রথমে কাশ্মীরে ছিলেন এবং পরে দিল্লীতে বসতি

www.bjilibrary.com

স্থাপন করেন। ১৭৩৯ সালে যখন নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করেন, তখন তাঁহারা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শ্রীহট্টে চামড়া ইত্যাদির ব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায়ে তাঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। খাজা আবদুল হাকিমের মৃত্যুর পর মৌলবী আবদুল্লাহ্‌র পুত্র আহসান উল্লাহ্ ও হাফিজুল্লাহ ভূসম্পত্তিতে অর্থনিয়োগ আরম্ভ করেন। আহসান উল্লাহ ও হাফিজুল্লাহ্ কয়েকটি জিলায় জমিদারী ক্রয় করেন। তাঁহারা ১৮১১ সালে ২১,০০০ টাকায় বাকরগঞ্জ জিলার বুযুর্গ উমেদপুর পরগণাস্থিত আইলা টিয়ারখালি ও ফুলঝুরির বিস্তৃত অঞ্চল খরিদ করেন। এই মূল্যবান জমিদারী হইতে তাঁহাদের পরিবারের বাৎসরিক একলক্ষ টাকা মুনাফা হইত।[৪৭] ইহা ছাড়াও তিনি বরিশাল জিলার আওরঙ্গপুর পরগনা, কচুয়ার চন্দ্রদ্বীপ জমিদারী,[৪৮] সলিমাবাদ ও সুলতানপুর পরগনা ক্রয় করেন।[৪৯] এইরূপে হাফিজুল্লাহ বরিশাল জিলায় এক বিরাট জমিদারী স্থাপন করেন। ১৮৩৫ সালে তিনি কুমিল্লা জিলার বরদাখাল পরগণা খরিদ করেন।[৫০] ময়মনসিংহ জিলাতেও ঢাকার নবাব পরিবারের জমিদারী বিস্তৃত হয়। ১৮৭৬ সালে তাঁহার করটিয়ার সাদত আলী খান পন্নির জমিদারীর এক বৃহৎ অংশ ক্রয় করেন।[৫১]

মৌলভী আবদুল কাফুর ও খাজা আলীমুল্লাহ হাফিজুল্লাহর উত্তরাধিকারী ছিলেন। খাজা আলীমুল্লাহ মৌলভী আবদুল্লার পৌত্র ছিলেন। আলীমুল্লাহর সময়ে তাঁহাদের পরিবার ঢাকার সামাজিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। ১৮৩৮ সালে তিনি ঢাকায় ফরাসীদের কুঠি ক্রয় করেন। ১৮৪৩ সালে জাহাঙ্গীরনগরের প্রাক্তন নায়েব-নাযিম পরিবারের শেষ বংশধর নবাব গাজীউদ্দীন হায়দারের মৃত্যুর পর খাজা আলীমুল্লাহ হোসেনী দালান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পর বৎসর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে হোসেনী দালানের মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করেন।[৫২] আলীমুল্লাহর পুত্র খাজা আবদুল গণি বহু জনহিতকর কাজে মুক্ত হস্তে দান করেন। তিনি ঢাকা শহরে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনেক অর্থ দান করেন। সরকার তাঁহাকে 'নবাব ও নাইট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁহার নবাব উপাধি বংশানুক্রমিকভাবে দেওয়া হয়। নবাব আবদুল গণির পুত্র ও উত্তরাধিকারী নবাব আহসানউল্লাহ ১৮৮৮ সালে ঢাকার ডাফারিন লেডি হাসপালাতাল স্থাপনের জন্য বহু টাকা দান করেন।[৫৩]

নবাব আহসানউল্লাহর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন খ্যাতনামা নবাব সলিমুল্লাহ। নবাব সলিমুল্লাহ বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে তিনি বাংলার মুসলমানদের নেতার আসন লাভ করেন এবং মুসলিম রাজনীতিতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁহার উদ্যোগে ১৯০৯ সালে ঢাকা নগরীতে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নূতন হিন্দু জমিদারী

কোম্পানীর আমলে অনেকগুলি নতুন হিন্দু জমিদারীর উৎপত্তি হয়। কোম্পানীর রাজস্ব নীতির ফলে প্রাচীন জমিদারগুলির ক্ষতি হয়। ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছা ব্যতীত

www.bjilibrary.com

দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহীর দিঘাপতিয়া, বর্ধমান, নদিয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বড় হিন্দু জমিদারগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৫৪] নূতন হিন্দু ব্যবসায়ী ও বেনিয়া শ্রেণী এবং কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অনুচরেরা বিবিধ উপায়ে বড় বড় জমিদারী স্থাপন করে। এই নূতন জমিদারগুলির ভূকৈলাসের ঘোষাল, কলিকাতার ঠাকুর কলিকাতার শোভা বাজার, কাসিমবাজার, কান্দি ও নসীপুর জমিদার পরিবারদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘোষাল পরিবারের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলস্টের দীউয়ান ছিলেন। রাজস্ব ও জমিদারী বন্দোবস্তের ব্যাপারে তাঁহার হাত ছিল। এই সুযোগে তিনি ১৭৭১ সালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে চট্টগ্রাম জিলায় এক বিস্তীর্ণ জমিদারী স্থাপন করেন। গোকূলচন্দ্র ঘোষাল বাংলার অন্যান্য জিলায়ও জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮২ সালে তিনি রাজবল্লভ পরিবারের বুযুর্গ উমেদপুরের কিছু অংশ খরিদ করেন। তিনি কুমিল্লা জিলার পইটকারা জমিদারীর কতকাংশ ক্রয় করেন। এইভাবে ঘোষাল পরিবার বাংলাদেশের এক বৃহৎ জমিদারীর অধিকারী হন।[৫৫]

কলিকাতার ঠাকুর পরিবার কুমিল্লা জিলার পাইটকারা ও গঙ্গামণ্ডল জমিদারীর অংশ ক্রয় করেন এবং নদীয়া ও অন্যান্য জিলায় ও অনুরূপভাবে জমিদারী স্থাপন করেন। ১৮১২ সালে মোহিনীমোহন ঠাকুর বিস্তৃত ইদিলপুর পরগণার জমিদারী খরিদ করেন এবং বরিশাল জিলায় ঠাকুর পরিবারের বিশাল জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৬] ক্লাইভের দীউয়ান নবকিষেণ কয়েকটি জিলায় রাজস্বের ঠিকাদারী আরম্ভ করিয়া জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কুমিল্লা জিলার গঙ্গামণ্ডল পরগণা ক্রয় করেন এবং কলিকাতার সুতানটি তালুকের বন্দোবস্ত লাভ করেন (১৭৭৭)।[৫৭]

দেবী সিংহ নসীপুর জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য করেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি কোম্পানীর দীউয়ান নিযুক্ত হন। ১৭৭২ সালে তিনি পূর্ণিয়া ও রংপর জিলার রাজস্বের ঠিকাদারী লাভ করেন। দেবী সিংহ খুব অত্যাচারী ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে নির্যাতন করিয়া খাজনা ও নানারকমের কর আদায় করিতেন। ১৭৮০ সালে কোম্পানী তাঁহাকে দিনাজপুর জমিদারীর ম্যানেজার নিয়োগ করেন। এখানেও তিনি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া টাকা আদায় করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ১৭৮৩ সালে দিনাজপুর ও রংপুরের প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়। ইহার ফলে তাঁহাকে দিনাজপুর জমিদারীর ম্যানেজারের পদ হইতে অপসারণ করা হয়। প্রজা উৎপীড়ণ করিয়া এবং দিনাজপুর ও অনান্য জমিদারীর ক্ষতি করিয়া দেবী সিংহ এক বিরাট জমিদারী স্থাপন করেন। তিনি ১৮০৫ সালে মারা যান। তাঁহার উত্তরাধিকারী উদ্বন্ত সিংহ মুর্শিদাবাদের নসীপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারা নসীপুরের জমিদার পরিবার বলিয়া পরিচিত হন।[৫৮]

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনিয়া ছিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে বোর্ড অব রেভিনিউর দীউয়ান নিযুক্ত হন। নদীয়া ও বর্ধমানের জমিদারীর ক্ষতি করিয়া তিনি ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ নোয়াখালী জিলাতেও কয়েকটি জমিদারী ক্রয় করেন। এইভাবে তিনি একটি বড় জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। বহরমপুরের ১৮ মাইল

www.bjilibrary.com

দূরে কান্দিতে তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাঁহাদের বংশ কান্দির জমিদার বংশ নামে পরিচিত।[৫৯]

কৃষ্ণকান্ত নন্দী কাসিমবাজার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনিয়া ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি অর্জন করেন এবং কাসিমবাজার জমিদারী স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ নানাভাবে জমিদারী বৃদ্ধি করেন। কুমিল্লা জিলার সরাইল পরগণা এবং মুর্শিদাবাদ, হুগলী, কলিকাতা, বীরভূম ও মুঙ্গের জিলার অনেক ভূসম্পত্তি কাসিমবাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জমিদারীর আয় ৪ লক্ষ টাকা ছিল।[৬০] ইহাদের ছাড়া ভবানী মিত্র, রামচন্দ্র রায়, শান্তিরাম সিংহ, দুলাল রায়, হুজুরীমল এবং আরো অনেক বেনিয়া ও ব্যবসায়ী কোম্পানীর শাসনের প্রথম দিকে বাংলাদেশে জমিদারী স্থাপন করেন।[৬১]

www.bjilibrary.com

চতুর্থ অধ্যায়
কোম্পানীর রাজস্ব—নীতি ও মুসলমান

মুসলমানদের শাসনকালে প্রজাদের কয়েকটি অধিকার ও সুবিধা ছিল। জমির উপর তাহাদের মালিকানা-স্বত্ব ছিল; তাহারা নির্দিষ্ট খাজনা দিত ও পুরুষাণুক্রমে জমি ভোগদখল করিত। সরকার ও প্রজার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন মুসলমান শাসকদের রাজস্ব-ব্যবস্থার আদর্শ ছিল। বাংলাদেশে এই ব্যবস্থা পুরাপুরি প্রচলিত হইতে পারে নাই; অনেক ক্ষেত্রে জমিদার ও ঠিকাদারদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে হয়। জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা বাবদ আদায় করিতেন। শস্য অথবা টাকায় খাজনা দেওয়া চলিত। জমিদারগণ খাজনার এক দশমাংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইতেন এবং নয় দশমাংশ রাজস্বরূপে সরকারকে দিতেন। জমিদারদের অধীনে থাকিলেও প্রজাদের ভূমি-স্বত্ব বজায় ছিল। জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না।

কোম্পানী একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিল। এইজন্য রাজস্ব ব্যবস্থায় মুনাফা ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রজাদের ভালমন্দের প্রতি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর ছিল না। ক্লাইভ প্রথম রাজস্বের ভার গ্রহণ করেন এবং শাসন দায়িত্ব এড়াইয়া চলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা হইতে মুনাফার জন্য তিনি বাংলাদেশে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন। কোম্পানী রাজস্ব ব্যবস্থা হইতে প্রচুর অর্থ মুনাফা করিত। প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্বের মুনাফা বিলাতে প্রেরিত হইত এবং ইহা কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হইত। বাংলাদেশের রাজস্বে ইহার কৃষকদের কোন উপকার হইত না। তাহা ছাড়া কোম্পানী রাজস্বের ব্যাপারে যে পুঁজি নীতি (Investment Policy) অবলম্বন করে, তাহা বাংলাদেশের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজস্ব ব্যবসায়ে নিয়োগ করিত এবং এই টাকায় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইত ও লাভজনক ব্যবসায় করিত। শাসনকার্য চালাইবার জন্য টাকার অভাব হইত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হাউস অব কমনসের সিলেক্ট কমিটি ইহার রিপোর্টে স্বীকার করে যে, কোম্পানীর রাজস্ব সম্পর্কে পুঁজিনীতির ফলে বাংলা ও বিহার খুবই আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে।[১]

মুনাফার উদ্দেশ্যে কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও সরাসরি গ্রহণ করে নাই। রাজস্ব আদায়ের জন্য মুহম্মদ রেজা খাঁকে বাংলাদেশের এবং সিতাব রায়কে বিহারের নায়েব দীউয়ান নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাদের কার্য তত্ত্বাবধানের জন্য মুর্শিদাবাদের একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট ও পাটনায় একজন ইংরাজ এজেন্ট নিয়োগ করা হয়। কোম্পানী কেবল চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদেনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলার রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করে। দালালদের মাধ্যমে কোম্পানী প্রজাদের অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে। ১৭৬৪-৬৫ সালে মীর জাফরের আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮১৭,৫৫৩ পাউণ্ড।[২]

www.bjilibrary.com

দীউয়ানীর প্রথম বৎসরেই (১৭৬৫-৬৬) কোম্পানী বাংলাদেশে হইতে ১, ৬৮১,৪২৭ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করে।[৩] ইহার উপর কোম্পানীর দালাল ঠিকাদার ও অন্যান্য অনুচরগণ প্রজাদের নিকট হইতে নিজেদের জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায় করে। দালালগণ জমিদার ও ঠিকাদারদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিত এবং জমিদার ও ঠিকাদারগণ প্রজাদিগকে নির্যাতন করিয়া টাকা আদায় করিত।[৪] এইভাবে প্রতি বৎসর রাজস্ব ২, ৬৮০, ০০০ পাউণ্ডে পৌঁছে।[৫] ১৭৬৯ সালের ২৪শে মে মুর্শিদাবাদের ইংরাজ রেসিডেন্ট রিচার্ড বেকার গবর্ণর ভেরেলস্টকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, ইংরাজদের পক্ষে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কোম্পানীর দীউয়ানীর ভার গ্রহণ করার পর হইতে এদেশের প্রজাদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হইতেছে।[৬] কোম্পানীর আমলা ও দালালগণ দুর্ভিক্ষের বৎসরও (১৭৭০) বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করিয়াছে। ১৭৭২ সালের ৩রা নভেম্বর ওয়ারেন হেস্টিংস বিলাতের ডিরেক্টর বোর্ডকে জানান, "দুর্ভিক্ষে এই প্রদেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক মারা গিয়াছে; এবং ইহাতে চাষাবাদের খুব ক্ষতি হইয়াছে; এই অবস্থা সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের আদায়কৃত রাজস্ব ১৭৬৮ সালের রাজস্ব হইতে অনেক বেশি হইয়াছিল। বোর্ড অব রেভিনিউর নিম্নোক্ত চার বৎসরের রাজস্বের হিসাব হইতে ইহা প্রকাশ পায়।[৭]

১৭৬৮-৬৯ ঃ ১৫২, ৫৪, ৮৫৬ টাকা
১৭৬৯-৭০ ঃ ১৩১, ৪৯, ১৪৮ টাকা
১৭৭০-৭১ ঃ ১৪০, ০৬, ০৩০ টাকা
১৭৭১-৭২ ঃ ১৫৩,৩৩, ৬৬০ টাকা

ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থা প্রচলন করেন। তিনি রেজা খান ও সিতাব রায়কে অপসারিত করেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রত্যেক জিলায় একজন ইংরাজ কালেক্টর নিয়োগ করেন। তিনি নিলামে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। যাহারা বেশি রাজস্ব দিতে স্বীকার করে তাহাদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। এই রাজস্ব ঠিকাদারদের অধিকাংশই বেনিয়া ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক ছিল। ইহারা প্রজাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে। ১৭৭১ সালে পাঁচসালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হইলে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতি বৎসর নিলামে রাজস্ব বন্দোবস্তের রীতি অনুসরণ করেন। পাঁচশালা ও একসালা বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং প্রজাগণ ঠিকাদারদের দৌরাত্ম্যে অশেষ দুর্দশা ভোগ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বাংলা-বিহারের রাজস্ব সমস্যা বিলাতের পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্লামেন্ট ১৭৮৪ সালে পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (Pitt's India Act) পাশ করে এবং কোম্পানীর রাজস্ব নিলাম ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে স্থায়ী নিয়মকানুন প্রণয়ন

www.bjilibrary.com

করিতে কোম্পানীকে নির্দেশ দেয়। এই সময় পার্লামেন্টে বিলাতের জমিদার শ্রেণীর প্রতিপত্তি ছিল। নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজেও অভিজাত জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বাংলা-বিহারের রাজস্ব ব্যবস্থার ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি চার্লস গ্রান্ট ও স্যার জন শোর নামক দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে রাজস্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে নিয়োগ করেন। অনুসন্ধানের পর তাহারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। শোর বলেন যে, জমিদারগণই জমির মালিক এবং প্রথামত সরকারকে রাজস্ব দিয়া তাহাদের জমিদারী ভোগদখলের অধিকার আছে। গ্রান্টের মতে সরকার জমির মালিক এবং ইহা ইচ্ছামত জমিদার বা ঠিকাদারদের সহিত বন্দোবস্থ করিতে পারে। বিলাতের কর্তৃপক্ষ শোরের মত গ্রহণ করে এবং যথাসম্ভব জমিদারদের সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে নির্দেশ দেয়। ১৭৮৯ সালে কর্নওয়ালিস প্রথমে জমিদারদের সহিত দশ বৎসর মেয়াদের বন্দোবস্ত করেন। ১৭৯৩ সালে তিনি ইহা চিরস্থায়ী করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেন। কলিকাতার রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি শোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার বিরোধিতা করেন। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ কর্নওয়ালিসের সুপারিশ গ্রহণ করে। ইহার পর কর্ণওয়ালিশ জমিদারদের সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। জমিদারদিগকে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয়; তাহাদের দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট করা হয়। রীতিমত রাজস্ব দিলে তাহারা চিরদিন জমিদারী ভোগ করিবে।

জমিদারদের সহিত রাজস্ব বন্দোবস্তের পক্ষে স্যার জন শোর দুইটি যুক্তি প্রদর্শন করেন : ইহাতে সরকারের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইবে। তিনি বলেন, "জমিদার বা ভূস্বামীদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, কারণ তাহাদের ভূসম্পত্তি সরকারের নিরাপত্তা বিধান করিবে। সংগত কর নীতি অনুসরণ করিলে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অন্যায়ভাবে কর ধার্য করা হইবে না। করদাতার জন্য করের নিশ্চয়তা অত্যাবশ্যক। কর কখন দিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে।"[৮] শোর দশশালা ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার মতে জমির ভাল জরীপ না হওয়া পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সংগত হইবে না।

কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া বলেন, "যদি জমির প্রকৃত মালিক জমিদারকে মাত্র দশ বৎসর মেয়াদে জমিদারীর ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় এবং পক্ষে অন্যায়ভাবে তাহার নিকট অতিরিক্ত কর দাবী করা হয়, তাহা হইলে জমির উন্নতি দূরের কথা আবাদী জমি অনাবাদী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।" তিনি আশা করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির উন্নতি ও অনাবাদী জমি আবাদীর ব্যবস্থা করিতে উৎসাহিত হইবে। তিনি বলেন, "আমি ভালভাবে জানি যে, হিন্দুস্থানের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল জঙ্গলময় এবং সেখানে বন্যজন্তুর বসতি। দশ বৎসরের মেয়াদে জমির বন্দোবস্ত হইলেকোন ভূস্বামী বা ঠিকাদার জঙ্গল পরিষ্কাররের ব্যবস্থা করিবে না এবং কৃষকগণও ইহা আবাদ করিতে উৎসাহ পাইবে না। কারণ দশ বৎসর পর তাহাদের উপর যে করের বোঝা চাপিবে না, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই এবং এই কয় বৎসর তাহারা যে পরিশ্রম করিবে, সেই অনুযায়ী তাহাদের পারিশ্রমিক

www.bjilibrary.com

পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমি মনে করি যে, এই প্রদেশগুলির রাজস্বের স্বল্প মেয়াদী বন্দোবস্ত হইলে দেশের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িবে।"[৯] কর্ণওয়ালিস ইহাও উল্লেখ করেন, যে কোম্পানীর শাসনে বাংলাদেশের রাজস্বের বিপুল অর্থ বিলাতে প্রেরিত হয় এবং অনেক ইংরাজ বহু অর্থ সম্পদ স্বদেশে লইয়া যায়। ইহাতে বাংলাদেশের কৃষি ও বাণিজ্যের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। দেশের উন্নতির জন্য এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য তিনি রাজস্ব নীতি পরিবর্তন ও রাজভক্ত জমিদার শ্রেণী গঠন যুক্তিযুক্ত মনে করেন।[১০]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকারের কয়েকটি উপকার হয়। জমিদারদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট রাজস্ব পাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী বাজেট প্রস্তুত করিতে সুবিধা হয়। চিরদিনের জন্য জমিদারী স্বত্ব লাভ করায় জমিদারগণ সরকারেরর খুব অনুরক্ত হয় এবং তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ কাজ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের খুব উপকার হয়। তাহারা বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারী ভোগদখলের অধিকার পায়। কিন্তু এই বন্দোবস্তের দরুন বহু পুরাতন জমিদার পরিবারেরর ক্ষতি হয়। জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৭৯০-৯১ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যা হইতে কোম্পানীর রাজস্ব ২৬, ৮০০, ৯৮৯ টাকা (২, ৬৮০, ০০০ পাউণ্ড) আদায় হয়। ইহা মুর্শিদ কুলি ও সুজাউদ্দিনের সময়ে ধার্য রাজস্বের দুই গুণ এবং মীরজাফরের ১৭৬৪-৬৫ সালের রাজস্বের তিনগুণ ছিল।[১১] এত বেশী রাজস্ব ধার্য করায় অনেক প্রাচীন জমিদারদের পক্ষে জমিদারী রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। সরকার তাদের জমিদারী বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের সহিত বন্দোবস্ত করে। এই নূতন জমিদারদের জমি ও প্রজাদের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বেশি রাজস্ব দিয়াও তাহারা জমিদারী রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনাবাদী জমি আবাদীর ফলে তাহাদের জমিদারীর আয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা জমিদারী হইতে প্রচুর মুনাফা করে। তাহাদের দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট থাকায় সরকার এই মুনাফার অংশ হইতে বঞ্চিত হয়। জমিদারগণ সরকারকে ৩৭, ৫০, ০০০ পাউণ্ড রাজস্ব দিত, কিন্তু তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে প্রায় ১৩০, ০০, ০০০ পাউন্ড খাজনা আদায় করিত।[১২] ১৭৯৩ সালে যখন রাজস্ব নির্ধারিত হয়, তখন ইহা ভূমিকরের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল, পরে ইহা কমিয়া শতকরা ২৮ ভাগ হয়। পরবর্তীকালে রাস্তা ও জনকল্যাণকর কার্যের জন্য সরকার জমিদারদের রাজস্বের উপর শতকরা সাড়ে ৬ টাকা কর ধার্য করে।[১৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদিগকে কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের দয়ার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। খুব কম জমিদারেরই কৃষির উন্নতি ও প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য ছিল। প্রজাদের পরিশ্রমে জমির উন্নতি হইত, কিন্তু তাহারা ইহার ফল ভোগ করিতে পারিত না। জমিদার ইচ্ছামত প্রজাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিত। ১৮৫৯ সালে বঙ্গীয় ভূমি আইন (Bengal Land Act) বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্রজাগণ জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা হইতে কিছুটা রেহাই পায়।

www.bjilibrary.com

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানগণ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহাদের সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। হান্টার লিখিয়াছেন যে, মুসলমান আমলে রাজস্ব শাসনে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং ইহা হইতে তাহাদের প্রচুর অর্থ সমাগম হইত। পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের মুসলমানদের আর্থিক জীবনে তীব্র আঘাত করে।[১৪] কোম্পানী শাসনের প্রারম্ভে বাংলাদেশে অনেক পুরাতন মুসলমান জমিদার ছিল। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জমিদারদের রাজস্ব বৃদ্ধি করায় মুসলমান জমিদারদের পক্ষে জমিদারী রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহাদের জমিদারী অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারী অথবা বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবিচারের কথা স্বীকার করিয়া মেটকাফ বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থায় জমির প্রকৃত মালিকদের নিকট হইতে জমি ছিনাইয়া লইয়া এরূপ এক শ্রেণীর বাবুদিগকে দেওয়া হয়, যাহারা ঘুষ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে ধনী হইয়াছেন।[১৫] জেমস ও কেনেলী মন্তব্য করিয়াছেন, যে সকল হিন্দু কর্মচারী পূর্বে রাজস্ব বিভাগের সামান্য পদে ছিল, এই বন্দোবস্তে তাহারা জমিদার পদে উন্নীত হয়, তাহাদিগকে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে সুযোগ দেওয়া হয়। এই অর্থ মুসলমানদের শাসনকালে মুসলমানদের হাতে আসিত।"[১৬] বড় জমিদারদের অধীনে অনেক তালুকদার ও পত্তনিদার ছিল। তাহারা। জমিদারদের নির্দেশ মত চলিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহারা স্বাধীন হইয়া পড়ে।[১৭]

লাখেরাজ বাযয়াফতি

মুসলমান শাসকগণ অনেক কর্মচারীকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয়াছেন এবং বহু আলেম ও ধার্মিক লোককে এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি দান করিয়াছেন। কর্মচারীদিগকে প্রদত্ত জমিকে জায়গীর বা আল-তামগাহ্ বলা হইত এবং আলেম ও অন্যান্যকে যে জমি দেওয়া হইত, তাহা আয়মাহ্ ও মাদাদ-ই মা'শ নামে পরিচয় ছিল। মুসলমানদিগকে ১৫ প্রকারের ও হিন্দুদিগকে তিন রকমের নিষ্কর জমি দানের প্রথা চিল। বুকানন বলেন যে, তিনি যে সময় বিহার পরিদর্শন করেন, তখন তিনি সেখানে ২৩ রকমের নিষ্কর জমি দেখিতে পান।[১৮]

বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকেই নিষ্কর জমির প্রতি কোম্পানীর কর্মকর্তাদের নজর পড়ে। নিষ্কর জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, ইহাতে বাংলাদেশের রাজস্বের এক চতুর্থাংশ ক্ষতি হইত। ওয়ারেন হেস্টিংস অনেক লাখেরাজ জমির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহাদের কতকগুলির দানপত্র সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল। মোগল রাজত্বের শেষের দিকে বিশেষত পলাশী যুদ্ধের পর রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগণ বহু নিষ্কর জমি তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে দান করার ব্যবস্থা করে। অনেকে উৎকোচের সাহায্যে নিষ্কর জমির অধিকার পায়। ওয়ারেন হেস্টিংস এই দানপত্রের সত্যতা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার

www.bjilibrary.com

প্রচেষ্টা বিফল হয়।[১৯] লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের আইনের ১৯ ও ৩৭ প্রবিধান বলে নিষ্কর জমির মালিকদিগকে নির্দেশ দেন, তাহারা যেন এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের দানপত্র পরীক্ষার জন্য জিলা কালেক্টরের অফিসে দাখিল করে। নির্দেশে বলা হয় যে, যে সব দানপত্র কালেক্টরের অফিসে দাখিল করা হইবে না, সেগুলি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে না এবং ইহাদের মালিকদিগকে নিষ্কর জমি হইতে উৎখাত করা হইবে। যদি কোন দানপত্রের সত্যতা সম্বন্ধে কালেক্টরের সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তিনি ইহার মালিকের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন। যে সকল জমি বাযয়াফত করা হইবে, কালেক্টর সেগুলির প্রথম বৎসরের খাজনার এক চতুর্থাংশ কমিশন স্বরূপ পাইবে।

লাখেরাজ জমির দানপত্রের সত্যতা পরীক্ষার সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথমত সরকারের আদেশ জনসাধারণের মধ্যে ভালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই; এইজন্য অনেক লাখেরাজদার সরকারী নির্দেশ জানিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক জিলায় লাখেরাজ দানপত্রের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, কালেক্টরের অফিসের পক্ষে ইহাদের সবগুলি রসিদ দিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। একমাত্র বর্ধমান জিলায় ৭২০০০ দানপত্র দাখিল করা হয়। কালেক্টর এক বৎসরে ইহাদের মাত্র পাঁচ হাজার পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় এবং বাকিগুলির নকল রাখিয়া সেগুলি মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেয়। তৃতীয়ত দানপত্রে সত্য-মিথ্যা যাচাই করিতে সরকার কি মাপকাঠি ব্যবহার করিবে, সে বিষয়ে সরকারী অদেশে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই; ইহা কালেক্টরের বিচারবুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কমিশনের লোভে কালেক্টরের স্বভাবতই নিষ্কর জমি বাযয়াফত করার দিকে ঝোঁক ছিল। তাছাড়া বাংলা-বিহারের জমিদারগণ আইনত ১০০ বিঘার কম নিষ্কর জমি নিজেদের জমিদারীভুক্ত করিয়া লইয়াছিল।[২০]

১৮১১ সালেল ৮ প্রবিধান অনুযায়ী কালেক্টরকে নিষ্কর জমি সংক্রান্ত মকদ্দমা বিচারের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। সরকারী বাদী ও বিচারকের উভয়বিধ ক্ষমতা তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮১৭ সালের ১১ও ১৩ প্রবিধান অনুসারে কালেক্টরগণ ১৭৯৩ সালের প্রবিধান বিষয়ক মামলাগুলি বিচারের ক্ষমতা পায়। লাখেরাজদারদিগকে অধিকার দেওয়া হয় যে, তাহারা কালেক্টরের রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ আদালতে বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবে। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে ব্যয়সাপেক্ষ আদালতের আশ্রয় নিতে লাখেরাজদের সাহস হয় নাই।[২১] ১৮১৯ সালের ১১ প্রবিধানে কালেক্টরের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। কালেক্টর একাধারে বাদী, বিচারক ও কার্যনির্বাহকের ক্ষমতা লাভ করে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কালেক্টরগণ যে অন্যায়ভাবে লাখেরাজ সম্পত্তি বাযয়াফত করিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী ও তীব্র মন্তব্য করিয়ছেন।[২২]

১৮২৮ সালের ৩ প্রবিধানের বলে নিষ্কর জমি বাযয়াফতির কার্যবিধি আরও শক্ত করা হয়। কালেক্টরের রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ আদালতে আপীলের অধিকার প্রত্যাহার করা হয়; পরিবর্তে বিশেষ কমিশনারের নিকট লাখেরাজ মামলার আপীলের ব্যবস্থা

www.bjilibrary.com

হয়। বিশেষ কমিশনারদের রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। যে সমস্ত লাখেরাজ সম্পত্তির আয় বেশি ছিল, কেবল সেগুলির ক্ষেত্রে রাজার পরিষদে (King's council) আপীল করিবার অধিকার ছিল। ১৮২৮ সালের ৯জুন একটি সরকারী আদেশ জারী করা হয় যে, যাহারা লাখেরাজ জমি সম্বন্ধে খবর সরবরাহ করিবে, তাহারা সরকারের নিকট হইতে দস্তুরী বা কমিশন পাইবে; এই কমিশন পূর্বে কালেক্টরকে দেওয়া হইত। এই সকল সংবাদ সরবরাহকারীগণ লাখেরাজদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলে এবং ইহাতে সমাজে উৎকোচ ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।[২৩]

গ্রামাঞ্চলে বহু লাখেরাজদার সরকারের আদেশ সম্বন্ধে জানিতে পারে নাই। তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সম্পত্তি বাযয়াফত করা হয়। ইহার পরে দানপত্র দাখিল করিলেও পর্যাপ্ত জরিমানার বিনিময়ে তাহারা সম্পত্তি ফিরিয়া পাইতে পারিত।[২৪] অনেক মুসলমান লাখেরাজদার কায়েক শতাব্দী পূর্বে মুসলমান শাসকদের নিকট হইতে দানপত্র পাইয়াছিল। অনেকের দানপত্র হারাইয়া যায় অথবা কীটদষ্ট হয়। মুসলমান আমলে মুসলমানগণ দানপত্র রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয় নাই। কিন্তু হিন্দুগণ এই বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। এইজন্য মুসলমান লাখেরাজদারদের বেশি ক্ষতি হয়।[২৫] অনেক ক্ষেত্রে লাখেরাজদের বৈধ দানপত্র থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সম্পত্তি বাযয়াফত করা হয়। আদালতের আশ্রয় নিয়া সুবিধা হয় নাই; দীর্ঘকালের ব্যয় সঙ্কুল মকদ্দমায় অনেকে সর্বস্বান্ত হয়। আদালতের বিচার প্রহসনের উল্লেখ করিয়া কোম্পানী ডিরেক্টরস বোর্ড মন্তব্য করিয়াছে যে, ইহা জঘন্য রকমের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল, কারণ বিচার অপেক্ষা প্রতিকার বেশি ভয়াবহ ছিল।[২৬] অনেকের পক্ষে আদালতের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয় নাই। তা ছাড়া আপীল করিলেও বিশেষ ফল হইত না, কারণ বিশেষ কমিশনার সাধারণত কালেক্টরের রায় বহাল রাখিত। লাখেরাজ মামলার ব্যাপারে কালেক্টরগণ স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেয়। দানপত্র নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দাখিল না করায় অথবা মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইতে না পারায়, বহু লাখেরাজ মামলা এক তরফা সরকারী অনকূলে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে একজন লাখেরাজদার বিশেষ কমিশনারের বিচারালয়ে দরখাস্ত করে। বিশেষ কমিশনার দরখাস্তটি ডেপুটি গভর্নরের নিকট প্রেরণ করে। ডেপুটি গভর্নর টেইলারের নিষ্পত্তি বহাল রাখেন। এ ব্যাপারে যখন ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন এই মামলাগুলির পুনর্বিচারের ব্যবস্থা হয়। চট্টগ্রামে ১৪৮৬৩টি মামলা এক তরফা নিষ্পত্তি করা হয়।[২৭] মামলার দিন সম্বন্ধে লাখেরাজদারদিগকে নিয়ম মত জানান হয় নাই।[২৮]

যে সকল নিষ্কর জমি বাযয়াফত করা হয় সেইগুলি লাখেরাজদারদের সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া অন্যদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৫১ সালে সরকার ইহাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু খুব কম লোকেরই এই সামান্য অর্থ সাহায্য পাইবার সৌভাগ্য হয়।[২৯] বিলাতের ডিরেক্টরস সভা কয়েকবার ভারত সরকারের লাখেরাজ

www.bjilibrary.com

সম্পত্তি বাযয়াফতি নীতি অন্যায় বলিয়া মন্তব্য করে, কিন্তু ইহা বন্ধ করিতে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোকের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং ১৮৫২ সালে সরকার লাখেরাজ বাযয়াফত করার নীতি বন্ধ করিতে বাধ্য হয়।[৩০]

লাখেরাজ সম্পত্তি বাযয়াফত করার ফলে ১৮৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত সরকারের যাহা খরচ হয়, তাহা এই বার্ষিক আয়ের প্রায় চারগুণ ছিল। হান্টার লিখিয়াছেন যে, এই আয়ের অধিকাংশই মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হইতে হইত। লাখেরাজ বাযয়াফতির দরুন বাংলার মুসলমানদের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া হান্টার বলিয়াছেন শত শত পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে এবং যে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিষ্কর জমির আয়ের উপর চলিত সেগুলি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সরকারের আঠার বৎসর ব্যাপী স্বেচ্ছাচারিতামূলক কার্যকলাপের দরুন মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।[৩১] কোম্পানীর আমলে মুসলমানদের ঐশ্বর্যের উপর একের পর এক আঘাত আসে। তাহারা সরকারী চাকুরী হারায় এবং জমিদারী হইতে বিচ্যুত হয়। ইহাতে ঐশ্বর্যশালী মুসলমান সমাজ দারিদ্রদশায় পরিণত হয়। এই সত্য স্বীকার করিয়া হান্টার বলেন, "একশত সত্তর বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল; এখন তাহাদের পক্ষে ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব।[৩২]

www.bjilibrary.com

পঞ্চম অধ্যায়
মুসলমানদের উপর বৃটিশ শাসন—নীতির ফল

ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথমে ইংরাজদের হস্তগত হয় এবং ইহা একশত বৎসর কোম্পানীর ও সর্বমোট একশত নব্বই বৎসর বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। ভারতে সাম্রাজ্যভূক্ত অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশ বেশি দিন বৃটিশ শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই কারণে এই প্রদেশের ভাগ্যের উপর বৈদেশিক শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বেশি হইয়াছিল। বাংলাদেশে মুসলমানগণ ছিল শাসক সম্প্রদায়। শাসন ক্ষমতা হারাইয়া স্বভাবতই মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাড়ে পাঁচশত বৎসর বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসন ছিল। এই সময় তারা আর্থিক জীবনে সমৃদ্ধ ছিল এবং শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ছিল। শাসন ক্ষমতা হারাইবার কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা দরিদ্র ও অনুন্নত হইয়া পড়ে।

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ পুতুল নবাব মীর জাফর সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাঁহারা সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া ৮০,০০০ সৈনিককে কর্মচ্যুত করা হয় এবং তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল রাখিতে দেওয়া হয়। নজমউদ্দৌলার সময় এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল আরও ক্ষুদ্রতর করা হয়। ১৭৭২ সালে যখন কোম্পানী শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন নবাবের ক্ষুদ্র সেনাদলকে বিদায় দেওয়া হয়। সামরিক বিভাগ মুসলমানদের আয় ও ঐশ্বর্যের একটি উৎস ছিল। বহু সৈনিক ও সামরিক কর্মচারী বেকার হইয়া পড়ে। সমরিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট বেসামরিক কর্মচারীগণও চাকুরী হারায় এবং ইহাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়।

মুসলমানদের আমলে রাজস্ব সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল এবং রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদগুলি মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। হিন্দুদিগকে সাধারণত নিম্নপদে নিয়োগ করা হইত। কয়েকজন হিন্দুকে খালসা বিভাগের দীউয়ান নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সুবার দীউয়ান বা প্রদেশের প্রধান দীউয়ানের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ন্যস্ত হইত। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে সৈয়দ রেজা খান ও সরফরাজ খান, এবং আলীবর্দী খার আমলে নওয়াজিশ মুহম্মদ খান ও ঘষেটি বেগম এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১] দীউয়ানী বিভাগে কয়েক সহস্র মুসলমান কাজ করিত। দীউয়ানী লাভের পর ক্লাইভ কিছুকাল মুসলমান ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে বহাল রাখেন, কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে ইংরাজদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি মুহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দীউয়ান নিয়োগ করেন। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস নায়েব দীউয়ানের পদ ও অফিস উঠাইয়া দেন এবং রাজস্ব শাসনের জন্য ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে রাজস্ব বিভাগের বহু সংখ্যক মুসলমান কর্মচ্যুত হয়।

মুর্শিদাবাদের সদর রাজস্ব অফিস ছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর আজিমাবাদ (পাটনা) ও কটকে নায়েব দীউয়ানের অফিস ছিল এবং সেখানে অনেক মুসলমানদের চাকুরীর

www.bjilibrary.com

সংস্থান ছিল। মুর্শিদকুলি বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি মহালে বিভক্ত করিয়াছিলেন।[২] মহালকে পরগণাও বলা হইত। প্রত্যেক মহালে আমিল, আমীন, কারকুন, খাজাঞ্চি, কানুনগো প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত হইত। আমিন পদে সাধারণত মুসলমানদিগকে নিয়োগ করা হইত। অন্যান্য পদে মুসলমান হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোককে নিয়োগ করা হইত। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আমিলের স্থলে কালেক্টর নিয়োগ করে এবং পরগণার রাজস্ব শাসন ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া রাজস্ব শাসনের দায়িত্ব জিলা কালেক্টরের উপর ন্যস্ত করে। ইহাতে বহু সংখ্যক মুসলমানকে চাকুরী হারাইতে হয়। কোম্পানীর রাজস্ব নীতিতে মুসলমান জমিদারদের খুব ক্ষতি হয়। রাজস্ব নিলাম প্রথা প্রচলন এবং রাজস্ব অত্যধিক বৃদ্ধি করায় মুসলমান জমিদারদের পক্ষে জমিদারী রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তাহাদের জমিদারী বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়।[৩]

১৭৯০ সালে লর্ড কর্নেওয়ালিস ক্ষমতাহীন নবাবকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাশূন্য করেন। নায়েব নাযিমের পদ ও অফিস উঠাইয়া দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদের নিয়ামতে বহু কর্মচারীদের সংস্থান ছিল। জাহাঙ্গীরনগর আজিমাবাদ ও কটকের নায়েব নাযিমদের অফিসে বহু সংখ্যক কর্মচারী কাজ করিত। প্রত্যেক চাকলার ফৌজদারের অফিসে লোক নিযুক্ত হইত। প্রতি শহরে শান্তিরক্ষা কাজের জন্য কোতোয়াল ও বহু অধীনস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সমস্ত অফিসের অনেক মুসলমান চাকুরী হারায়। বিচার বিভাগের কাজী, মুফতি মীর আদল প্রভৃতি পদে বহু মুসলমান চাকুরী পাইত। প্রত্যেক শহর চাকলা ও পরগণায় কাজির বিচারালায় ছিল। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কয়েক বৎসর মুসলিম আইন ও বিচার বিভাগের মুসলমান কাজী মুফতি প্রভৃতি কর্মচারীকে বহাল রাখে। ইহার পর তাহারা ক্রমশ বিচার বিভাগের উচ্চ পদগুলিতে মুসলমানদের জায়গায় ইংরাজদিগকে নিয়োগের ব্যবস্থা করে। শাসন ক্ষমতা হারাইয়া বাংলাদেশের মুসলমানগণ বহু বৎসর পর্যন্ত বিদেশী শাসন গ্রহণ করিতে পারে নাই এবং ইংরাজ শাসকগণও তাহাদিগকে বিশ্বাস করে নাই। পলাশী যুদ্ধের পর যখন বাংলাদেশে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মুসলমানগণ বুঝিতে পারে নাই যে, শাসনক্ষমতা ও স্বাধীনতা হারাইয়া তাহারা কত বড় ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াছে। মীরকাসিক শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের গোপন বিদ্বেষের প্রবাহ চলিতে থাকে। সমসাময়িক ইতিহাস লেখক গোলাম হোসেন তাবাতাবাই ইংরাজদের একজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহারও লেখার মধ্যে বিদেশী শাসনের প্রতি চাপা বিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

মসিয়ে রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হাজী মুস্তফা নামে পরিচিত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি বহু বৎসর মুর্শিদাবাদে বাস করেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস ও অন্যান্য ইংরাজ শাসকদের ব্যবহারের জন্য গোলাম হোসেনের সিয়ারুল মুতাখখিরীন ইতিহাস খানি ফরাসী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ

www.bjilibrary.com

করেন। হাজী মুস্তফা তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় এদেশের লোকদের প্রতি ইংরাজদের মনোভাব এবং বৃটিশ শাসনের প্রতি এ দেশবাসীর মনোভাব সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের নিকট উপকার পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইংরাজগণ এদেশের লোকদিগকে হেয় চোখে দেখিত এবং মৃতের শামিল বলিয়া মনে করিত। হাজী মুস্তফা ইংরাজদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, এদেশবাসীগণ স্পন্দনহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহারা মৃত নয়, নির্জীবও নয়। গোলাম হোসেনের ইতিহাসের বিষয়ে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "আমাদের ঐতিহাসিকদের বিবরণের সর্বত্র একটা চাপা জাতীয় ক্রোধের প্রবাহ বহিয়া চলিাছে, ইহা সময় সময় বাষ্পের মতো নিগত হইয়াছে এবং ইংরাজদের ভূয়সী প্রশংসা করা সত্ত্বেও তিনি এই ভাব লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তবু তাঁহারই একমাত্র সুর যাহা প্রকাশ পাইয়াছে; আরও এমন লক্ষ লক্ষ লোক একই সুরে কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহারা এখন নীরব আছে। ষোল বৎসর যাবৎ এই জাতীয় অসন্তোষের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। আমি মুর্শিদাবাদ শহরে বাস করিয়াছি। এবং হিন্দুস্থানী পোশাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কথা বলিবার জন্য একজন অনুচর আমার সঙ্গে থাকিত এবং তাঁহার মাধ্যমে আমি বাজারেও অন্যান্য জায়গায় অনেক লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি। এইভাবে আমি নানা রকমের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।" হাজী মুস্তফা ইংরাজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের গোপন ক্রোধের আভাস পান। তিনি এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যাহার মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসন্তোষ পরিস্ফুট হইয়াছে।[৪]

মুসলমানগণ বৃটিশ শাসন মানিয়া লইতে পারে নাই; ইংরাজ শাসকগণও তাহাদিগকে বিশ্বাস করে নাই। হিন্দুগণ বৃটিশ শাসন মানিয়া লয় এবং কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে। স্বভাবতই ইংরাজ শাসকগণ হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করে এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ করে। ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির এক প্রশ্নের জবাবে স্যার জন ম্যালকল্‌ম বলেন, "আমাদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের অনুরক্তি আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রধান উৎস।"[৫]

ইংরাজ শাসকগণ প্রথম থেকেই মুসলমানদিগকে অবিশ্বাস করিয়া চলিয়াছে ১৭৬৭ সালের ২৮ শে নভেম্বর ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট এক পত্রে ক্লাইভ লিখিয়াছেন, "ইহা আপনি ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন যে, আমাদের নিকট হইতে সহৃদয় ব্যবহার পাইলেও মুসলমানগণ কখনও আমাদের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিবে না। তাহাদের নিজেদের বিপদের আশঙ্কাই কেবল তাহাদিগকে চুক্তি বজায় রাখিতে বাধ্য করিতে পারে।"[৬] মুলমানদের অসন্তোষ সম্বন্ধে কোম্পানীর শাসকদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে। ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির নিকট এক সাক্ষ্যে ক্যাপটেন টি, মাকান বলেন যে, যদি মুসলমানগণ এইরূপ সামান্যতম আশাও দেখিতে পায় যে, অন্য কোন য়ুরোপীয় শক্তির সহিত যোগ দিলে তাহারা আমাদের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবে, তাহা হইলে তাহারা সেইরূপ সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিবে না।

www.bjilibrary.com

তিনি মন্তব্য করেন যে, মুসলমানগণ অপেক্ষা হিন্দুগণ বৃটিশ শাসনের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত।"[৭] কর্ণেল টমাস মনরো তাহার সাক্ষ্যে

বলেন যে, যতদিন হিন্দু জনসাধারণ বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, ততদিন মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট থাকিয়াও কোম্পানীর সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবে না।"[৮] পরবর্তী ইংরাজ শাসকগণও মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসের নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ১৮৪৩ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবারা ডিউক অব ওয়েলিংটনকে লিখিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলমান জাতি মূলত আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। হিন্দুদের আস্থা অর্জন করা আমাদের শাসন নীতির লক্ষ্য।"[৯] হিন্দুদিগকে খুশী করিবার জন্য এলেনবারা মুসলমানদিগকে আঘাত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি গজনী হইতে তথাকথিত সোমনাথ মন্দিরের দরজা আনয়ন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা সোমনাথে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।[১০]

কোম্পানীর প্রধানগণ হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন এবং মুসলমানদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয়বিধ কাজে হিন্দুদের নিয়োগ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস নবকিষেণ নামক একজন হিন্দুকে নিজের ফার্সীর শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাঁহার অনুগ্রহে নবকিষেণ জমিদারীর মালিক হন এবং রাজা উপাধি লাভ করেন। ফার্সী মুসলমানদের রাজ ভাষা এবং এই ভাষায় তাহাদের ব্যুৎপত্তি ছিল। মুসলমানকে ফার্সী ভাষার শিক্ষক নিয়োগ না করিয়া তিনি হিন্দুকে নিয়োগ করেন। ইহা হইতে মুসলমানদের প্রতি তাঁহার উপেক্ষার আভাস পাওয়া যায়।

মুসলমানদের কার্যকলাপে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। ফকীর বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ ও সীমান্তের জিহাদে ইহা ব্যক্ত হয়। এই জন্য ইংরাজ শাসকগণও মুসলমানদের বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ১৮৩৮ সালে 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া নামক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের উল্লেখ করিয়া বলে, "একটি মুসলমান সংবাদ পত্র বৃটিশ সরকারের এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়াছে যে, মনে হয় ইহা সিন্ধুনদের অপর পারে অবস্থিত আমাদের শত্রুদের স্বার্থের নিকট নিজেকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।" ইহা সন্তোষ প্রকাশ করে যে, কোনো হিন্দু পত্রিকা আলোচনার ন্যায্য অধিকারের মাত্রা লংঘন করে নাই এবং ইহারা সবসময় সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছে।[১১] এই প্রসঙ্গে হান্টার লিখিয়াছেন, "ভারতীয় মুসলমানগণ বহু বৎসর যাবৎ বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের একটি স্থায়ী বিপদস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।[১২] বৃটিশ সরকার যে মুসলমানদের প্রতি দমন নীতি অনুসরণ করিয়াছে, বৃটিশ কর্মচারীদের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। হান্টার লিখিয়াছেন, "ইংরাজ সরকার সশস্ত্র রাজদ্রোহীদের সহিত কোনরূপ আপোষ করিতে পারে না। যাহারা অস্ত্রের সাহায্যে মীমাংসা করিতে চায় তাহাদিগকে অস্ত্রের দ্বারাই শায়েস্তা করা হইবে"।[১৩] তিনি বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদিগকে সৈন্য বাহিনী ও উচ্চ রাজপদগুলি হইতে অপসারিত করা প্রয়োজন ছিল। তিনি স্বীকার করেন

www.bjilibrary.com

যে, এই নীতির ফলে মুসলমানগণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়।"[১৪] সৈন্যবাহিনী, রাজস্ব, বিচার ও অন্যান্য শাসন বিভাগ মুসলমানদের ঐশ্বর্যের উৎস ছিল। কোম্পানীর শাসনকালে তাহাদের এই সব উৎসপথ রুদ্ধ হইয়া যায়।[১৫]

বাংলাদেশের শাসনকার্যে ইংরাজদের অনভিজ্ঞতার দরুন এবং মুসলমানদের অভিজ্ঞতার জন্য নূতন শাসকগণ কোন কোন বিভাগের চাকুরী হইতে মুসলমানদিগকে অপসারিত করিতে পারে নাই। বিচারকার্যের জন্য বৃটিশ সরকার মুসলমান আইন বজায় রাখিতে এবং মুসলমান কাজী মুফতি, মৌলবী ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। কলিকাতার সদর নিযামত আদালতে একজন কাজী-উল-কুজ্জাত (প্রধান কাজী) দুই জন মুফতি, তিন জন মৌলবী ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত হইত। সারকুইট কোর্ট এবং জিলার দীউয়ানী আদালতগুলিতেও কিছু সংখ্যক আইনজ্ঞ মুসলমান নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল।[১৬] মুসলমানদের আমলে ফার্সী রাজভাষা ছিল। কোম্পানীর সরকার বহু বৎসর ফার্সীকে রাজ ভাষারূপে ব্যবহার করে। ইংরাজ শাসকদের ফার্সী ভাষায় জ্ঞান ছিল না। এই জন্য তাহারা অধস্তন পদগুলিতে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক মুসলমান নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৩৭ সালে গভর্ণর জোনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক সরকারী অফিস ও আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী বা স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ইহাতে সরকারী চাকুরীতে বাংলাদেশের মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয়। এতদিন তাহারা ইংরাজী ও স্থানীয়-ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় নাই। সরকার অপ্রত্যাশিতভাবে সরকারী ভাষা পরিবর্তন করে এবং মুসলমানগণ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।[১৭]

সরকারী ভাষা পরিবর্তনের পরেও কয়েক বৎসর মুসলমানগণ কয়েকটি বিভাগের চাকুরীতে নিজেদের আসন বজায় রাখে। ১৮৫১ সাল পর্যন্ত মুসলমান উকিলদের সংখ্যা হিন্দু ও ইংরাজ উকিলদের মিলিত সংখ্যার সমান ছিল। সেই সময় ইংরাজী ও ফার্সী উভয় ভাষায় বুৎপন্ন ইংরাজ ও হিন্দুর সংখ্যা খুব কম ছিল। ইহার পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৮৫২ হইতে ১৮৬৮ সালের মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয়কে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ছিল ২৩৯ জন এবং মুসলমান ছিল মাত্র ১ জন। সরকারী অফিসগুলিতে কচিৎ মুসলমান দেখা যাইত।[১৮] সরকারী ভাষা পরিবর্তনের সমালোচনা করিয়া সৈয়দ আমীর আলী বলেন যে, ইংরাজ শাসকদের এই ব্যবস্থার ফলে সরকারী চাকুরী প্রার্থীদের জন্য ইংরাজী জানার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তখনও সরকার ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া কোনো আদেশ জারী করে নাই। "পক্ষান্তরে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের মনে আশা থাকে যে, তাহাদের আরবী -ফার্সী শিক্ষা সরকারী চাকুরী বা আইনের পেশায় প্রবেশ করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। তখন মুন্সেফগিরি ও ওকালতি পরীক্ষা উর্দু ও ইংরাজী উভয় ভাষার মাধ্যমে দেওয়া যাইত। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। ইহার এক বৎসর পর সরকার হঠাৎ এই ব্যবস্থা উঠাইয়া দেয় এবং শুধু ইংরাজী ভাষাকে পরীক্ষার মাধ্যমরূপে প্রচলিত করে। এই নতুন আদেশের ফলে মুসলমানগণ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে। আমীর আলী বলেন,

www.bjilibrary.com

মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার পূর্বেই সরকারী অফিসের দ্বার তাহাদের অন্য রুদ্ধ হয়।"[১৯]

আমীর আলী বলেন যে, ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী রাজভাষা করার পর হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদেরর দুরবস্থা শুরু হয়। মিশনারী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকগণ দলে দলে সরকারী অফিসে প্রবেশ করে। মিশনারী স্কুলের ইংরাজী শিক্ষা মুসলমানদের মনঃপুত হয় নাই। এইজন্য তাহারা সরকারী অফিসে ঢুকতে পারে নাই। কয়েকটি নিম্নতম পদে তাহারা প্রবেশ করিতে পারিত, কিন্তু সেখানেও দিন দিন তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পায়।[২০] এই পদগুলির জন্যও সাধারণত হিন্দুদিগকে পছন্দ করা হইত এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদিগকে বাদ দেওয়া হইত। এমনকি বিজ্ঞাপনেও বলা হইত যে, কেবলমাত্র হিন্দুদিগকেই করা হইবে। ১৮৬৯ সালে 'দূরবীণ' নামক কলিকাতার এক ফার্সী সংবাদপত্র এই বিষয়ের সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করে, "ছোটবড় সকল রকমের সরকারী পদ মুসলমানদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে বিশেষত হিন্দুদিগকে দেওয়া হইতেছে।" এই সংবাদপত্র প্রকাশ করে যে, সুন্দরবনের কমিশনার তাহার অফিসে লোক নিয়োগের জন্য কেবলমাত্র হিন্দু প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করিয়াছে।[২১] হান্টার মন্তব্য করিয়াছে যে, চাকুরী-ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে এইরূপ সর্বতোভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে যে, কলিকাতার অফিসগুলিতে চাপরাশী, কলম মেরামতকারী প্রভৃতি নিম্নতম পদগুলি ব্যতীত অন্য কোনো পদে মুসলমান নাই বলিলেই চলে।'[২২] কালেক্টরের অফিসগুলিতেও মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। হান্টার বলেন যে, পূর্বে নাযির ও প্রধান পেয়াদার পদে মুসলমান ছিল। "কিন্তু এখন জেলের দুই একটি পদ ছাড়া ভারতের ভূতপূর্ব শাসকগণ আর কিছুই আশা করিতে পারে না।"[২৩]

হান্টার মন্তব্য করেন যে, একশত বৎসর পূর্বে উচ্চ রাজপদগুলি মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু ১৮৭১ সালে কলিকাতার একটি বড় অপিসে খোঁজ নিয়া জানা যায় যে, সেখানে মুসলমানদের ভাষা পড়িতে পারে এইরূপ একজন লোকও নাই।[২৪] সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগে ১৮৮২ সালে বাংলাদেশের মুসলমানদের পক্ষ হইতে লর্ড রিপনের কাছে একটি স্মারকলিপিতে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের শোচনীয় সংখ্যাল্পতার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। চাকুরীতে মুসলমানদের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল : [২৫]

কলিকাতার অফিস	খ্রীস্টান	হিন্দু	মুসলমান	মোটসংখ্যা
বৈদেশিক বিভাগ	...৩৯	১৪	১	৫৪
অভ্যন্তরীণ বিষয়, রাজস্ব	...৩৯	২৩	১	৬৩
অর্থ বাণিজ্য	...১৭	৫৮	-	৭৫

www.bjilibrary.com

কম্‌পট্রোলার জেনারেল অঃ	...১৮	৪৫	-	৬৩

বাংলাদেশ সরকারের অফিস

রাজস্ব, অর্থ, ইত্যাদি	...১৫	৭৫	-	৯০
বিচার রাজনৈতিক বিষয় ইত্যাদি	...১৬	৬৪	২	৮২
একাউন্টেন্ট জেনারেল অঃ	...১২	১৬৯	-	১৮১
রাজস্ব বোর্ড	...২৪	৮৮	১	১১৩
কাগজের মুদ্রা বিভাগ	...১১	৭	-	১৮
ডাক ডিরেক্টর জেনারেল অঃ	...১১	২৯	-	৪০
কম্পট্রোলার জেঃ অঃ	...৩৪	২২৬	৫	২৬৫
পোস্ট মাস্টার জেঃ অঃ	...৬৫	২৬৪	৩৭	৩৩৬
অফিস	খ্রীস্টান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
পশ্চিম বঙ্গ ডাক বিঃ	...৭	৭৬৩	২২	৭৯২
পূর্ববাংলা ডাক বিঃ	...৩	১৫১	৯	১৬৩
বিহার উরিষ্যা ডাক বিঃ	...১৯	৩৫৩	৩৭	৪০৯
রেজিস্ট্রেশন ইনস্পেক্টর অঃ	...৫	৬	১	১২
শুল্ক (কাস্টমস) বিঃ	...-	১৩০	-	১৩০
জনশিক্ষা অঃ	...১১৪	৪২১	৩৮	৫৭৩
জনশিক্ষা ডিরেক্টর অঃ	...১	২১	-	২২
হাইকোর্ট (originsl) :	...২৫	৯১	-	১১৬
হাইকোর্ট (আপীল)ঃ	...১	১১	১	১৩
প্রেসিডেন্সী কোর্টঃ	...৮	১৮	১	২৭
সার্ভেয়ার জেনারেল অঃ	...৫৫	১৮	১০	৮৩

মফস্বল অফিস

মফস্বল অফিস

জিলা ২৬	হিন্দু	মুসলমান	মোট
ভাগলপুর	...১১৩	২২	১৩৫
বগুড়া	...৯১	৩৩	১২৪
বর্ধমান	...১১৭	১৪	১৩১
ফরিদপুর	...৩৩৩	৩০	৩৬৬
হাওড়া	...২০৬	৮	২১৪
মুর্শিদাবাদ	...৩৪৩	৩৯	৩৮২
ময়মনসিংহ	...৩২৪	২০	৩৪৪

www.bjilibrary.com

মেদেনীপুর	...৪৬০	৩৯	৪৯৯
পাবনা	...১৭৯	২৬	২০৫
পূর্ণিয়া	...১২৯	৫৯	১৮৮
রাজশাহী	...২৮৭	৫৭	৩৩৮
বরিশাল	...৩৮৯	৩৪	৪২৩

গেজেটেড্ কর্মচারীর সংখ্যা

অফিস	খ্রীস্টান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
হাইকোর্ট জজ	...১২	১	-	১৩

অফিস	খ্রীস্টান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
সিভিল সার্ভিস	...২৪৮	৭	-	২৫৫
বিচার (অনুন্নত জিলা)	...১	-	-	১
ডিপুটি কালেক্টর	...৪১	১৫৩	২২	২১৬
স্মল জজ কোর্ট	...৯	৪৪	৩	৫৬
জিলা, সেসন জজ	...২৯	১	-	৩০
মুন্সেফ	...-	৩৪৭	১৪	৩৬১
পুলিশ বিভাগ	...১১৮	৩৮	৯	১৬৫
পূর্ত বিভাগ	...১৬৭	২১৭	১৭	৪০১
চিকিৎসা বিভাগ	...৯৮	২৪	৩	১২৫
জনশিক্ষা বিভাগ	...৫৩	৯৮	৬	১৫৭
রেজিস্ট্রেশন	...৪	১৮	৩	২৫
বন, আবগারী বিভাগ ইত্যাদি	৩০০	২	-	৩০২
মোট -	১০৮০	৮৫০	৭৭	২০০৭

বৃটিশ শাসকদের অবিশ্বাসের নীতি, সরকারী ভাষা পরিবর্তন এবং মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি কারণে বাংলার মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীতে স্থান পায় নাই। ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুগণ সরকারী চাকুরীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা মুসলমানদের চাকুরী পাইবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আমীর আলী বলেন, "গত বিশ বৎসর যাবৎ মুসলমানগণ যোগ্যতা লইয়া চাকুরীতে ঢুকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকগণ প্রত্যেক সরকারী চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখায় তাহাদের পক্ষে কোনো অফিসে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।" তিনি আরও বলেন, যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন মুসলমান চাকুরী পায়, তাহা হইলে ইহা রক্ষা করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ তখন তাহাকে তাড়াইবার জন্য অফিসে ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে।"[২৭]

www.bjilibrary.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে ভয়ানক অরাজকতা সৃষ্টি হয়। পলাশী যুদ্ধের পর কার্যত ইংরাজগণ বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়, কিন্তু তাহারা ১৭৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। নবাব শাসন-দায়িত্ব বহন করিতেন, কিন্তু তাঁহার সামরিক ক্ষমতা বা অর্থ কিছুই ছিল না। তিনি ইংরাজদের আজ্ঞাবহ ছিলেন। এজন্য জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত না। ইহাতে দেশে শাসন বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, কোম্পানীর মুনাফা-প্রসূত রাজস্ব নীতি এবং ইহার দালালদের অর্থলালসা ও অত্যাচারের দরুন দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়। তৃতীয়ত, ১৭৭০ সালের মন্বন্তরে প্রজাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছে। দেশে চুরি-ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, নবাবের সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে এবং অন্য কোন কাজের সংস্থান না হওয়ায় তাহাদের অনেকে ডাকাতি শুরু করে। পঞ্চমত, কোন কোন জমিদার ডাকাতদিগকে আশ্রয় দেন এবং পার্শ্ববর্তী জমিদারীগুলিতে লুটতরাজ করিতে ইহাদিগকে সাহায্য করেন। রংপুর, যশোহর ও অন্যান্য জিলার কয়েকজন জমিদার দস্যুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইহাতে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হয়।[১]

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মনে উচ্চাকাঙ্খার উদ্রেক হয়। সাধারণত আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত এই নিরীহ সাধক-সম্প্রদায় এই সময় তাঁহাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সুযোগ পায়। ইহারা বাংলাদেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সংঘ বদ্ধভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

ফকীরগণ সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ছিল। তাহারা সুফী মতবাদের সহিত হিন্দু যোগীদের ভাবধারা গ্রহণ করে। ইহাতে সুফীবাদের সহিত সন্ন্যাসীদের যোগ প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটে। মাদারী সম্প্রদায়ের ফকীরদের মধ্যে এই মিশ্র মরমীবাদ প্রসার লাভ করে। মহসিন ফানীর রচিত 'দাবিস্তান' গ্রন্থ হইতে মাদারী ফকীরদের সম্বন্ধে জানা যায়। মাদারী ফকীরগণ অবধূত সন্ন্যাসীদের মতো লম্বা চুল রাখিত, শরীরে ভস্ম মাখিত, হাতে ও গলায় লোহার শিকল পরিত এবং কালো পাগড়ী ও কালো পতাকা ধারণ করিত। তাহারা সর্বদা আগুন জ্বালাইয়া বসিত এবং খুব ভাঙ্গ খাইত। সাধনায় সিদ্ধ ফকীরগণ প্রায় নগ্ন থাকিত এবং এই অবস্থায় ভীষণ শীতের মধ্যেও কাশ্মীর, কাবুল ও অন্যান্য পার্বত্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। কথিত আছে যে, শাহমাদার হিন্দুস্থানে যোগী হইয়াছিলেন এবং অনেক হিন্দুও তাঁহাকে ভক্তি করিত। তিনি গোরক্ষপুর জিলার মাখনপুরে আস্তানা করেন। মাখনপুর মাদারী ফকীরদের তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়।[২]

কলন্দর ফকীরগণও যোগীদের ভাবধারা কিছুটা গ্রহণ করে। উত্তর বাংলায় ইহাদের খুব প্রভাব পড়ে। দিনাজপুর জিলার বালিয়াদগি গ্রামে ফকীরদের কেন্দ্র ছিল। তাহারা

www.bjilibrary.com

বুরহানা নামে কথিত এক টুকরা কাপড় পরিধান করিত। এই জন্য তাহারা বুরহানা ফকীর নামে পরিচিত ছিল। ইহারা যোগীদের ন্যায় লম্বা চুল রাখিত ও পায়ে লোহার বলয় পরিত। শাহ্ সুলতান হাসানী মাদিয়া বুরহানা ইহাদের অন্যতম ধর্ম গুরু ছিলেন। শাহ্ সুজা যখন বাংলাদেশের সুবাদার ছিলেন তখন তিনি বুরহানা ধর্ম গুরুকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দান করিয়া সনদ দেন। ইহার ফলে বুরহানা ফকীরদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাহারা উরস বা বাৎসরিক উৎসবের সময় পাণ্ডুয়া, দিনাজপুর ও মহাস্থানের দরগায় মিলিত হইত। ফকীরগণ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। কালক্রমে তাহারা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া নযরানা আদায় করিতে শুরু করে।[৪]

হিন্দু সন্ন্যাসী বা বৈরাগীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর সাধক ছিল। এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীগণ তীর্থক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইত। অন্য শ্রেণীর সন্ন্যাসীগণ মঠে বাস করিত। প্রত্যেক মঠে একজন মোহান্ত থাকিতেন। তিনি ধর্মগুরু ও অধ্যক্ষ ছিলেন। মঠে মন্দির নির্মিত হইত এবং সেখানে দেবদেবীর, বিশেষত শিবের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত। মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য জমি দান করা হইত। ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীগণ সময় সময় মঠগুলিতে আসিয়া আশ্রয় লইত। মঠের আবাসিক সন্ন্যাসীদিগকে সব কিছু ত্যাগ করিয়া সাধনায় নিয়োজিত থাকার ব্রত গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু তাহাদের অনেকে লোভের বশবর্তী হইয়া ব্যবসায় ও সুদের কারবারে লিপ্ত হয় এবং অর্থোপার্জন করে। তাহারা সোনার কানবালা, হীরাখচিত শিকল এবং সোনা ও রূপার বালা পরিত। তাহাদের মঠ প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত থাকিত। সন্ন্যাসীগণ অনেক সময় গুপ্তচরের কাজ করিত এবং গোপন সংবাদ সরবরাহ করিত। বাৎসরিক স্নান উৎসবের সময় বিভিন্ন স্থান হইতে সন্ন্যাসীগণ আসিয়া মহাস্থান, চীলমারী (রংপুরে), সিংজানী (ময়মনসিংহে) ও লাঙ্গলবন্দে (নারায়ণগঞ্জে) সমবেত হইত।[৫]

পলাশী যুদ্ধের পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে ফকীর ও সন্ন্যাসীগণ বিদ্রোহী হয় এবং বাংলাদেশে তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিবার কাজে নিয়োজিত হয়। শাহ্ মজনু মাজযুব নামক নেতার পরিচালনাধীনে ফকীরগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়। চাকুরীহারা অনেক সৈনিক ও দুর্দশাগ্রস্ত বহু কৃষক ইহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফকীর ও সন্ন্যাসীগণ জমিদার ও প্রজাদিগকে টাকা ধার দিত। টাকা ফিরাইয়া না দিলে তাহারা খাতকদের বাড়ীঘর লুঠ করিত এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিত। তাহারা জমিদার ও তাঁহার কর্মচারীদিগকে ধরিয়া নৌকায় লইয়া আসিত এবং টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখিত।[৬]

ফকীরগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে আয়োজন করে। ওয়ারেন হেস্টিংসের এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৭৬৩ সালে ফকীরগণ বরিশালে ইংরাজ কুঠির উপর হামলা করে, কিন্তু তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ক্লাইভের এক রিপোর্ট হইতে প্রকাশ পায় যে, ১৭৬৩ সালে ফকীরগণ ইংরেজদের ঢাকা কুঠি আক্রমণ করে এবং তাঁহারা ইহা দখল করিয়া লুণ্ঠন করে। ইংরাজগণ পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। পরে ইংরাজগণ শক্তি বৃদ্ধি

www.bjilibrary.com

করিয়া ফকীরদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া কুটি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ফকীরগণ রামপুর বোয়ালিয়ার (রাজশাহী) ইংরাজ কুঠি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে এবং ইহার এজন্ট মিঃ বেনেটকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং পরে হত্যা করে। পর বৎসর (১৭৬৪) ফকীরগণ রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠিতে লুটতরাজ করে। ফকীর ও সন্ন্যাসীগণ উত্তর বাংলা ছাইয়া ফেলে। ১৭৬৭ ও ১৭৬৯ সালে ফকীরদের সহিত কোম্পানীর সৈন্যদের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ মার্টল ও লেফটেনান্ট কিথ ও অনেক সৈন্য নিহত হয়। এই সাফল্যের ফলে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের সাহস বাড়িয়া যায়।[৭]

জিলার রিপোর্টগুলি হইতে জানা যায়, যে শাহ মজনুর নেতৃত্বে ফকীরগণ প্রতি বৎসর রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর পাবনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় লুটতরাজ করে এবং কয়েকটি পরগণার সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন করে। তাহারা পরগণার সৈন্যদিগকে পরাজিত করে এবং দুইজন সেনানায়ককে নিহত করে। ফকীরগণ তাহাদের আধ্যাত্মিক খানকাহ্ বালিয়াদগিকে সামরিক কেন্দ্রে পরিণত করে এবং ১৭৭৬ সালে মহাস্থানেও তাহারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে।[৮] ১৭৭৩ সালে এক পত্রে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখিয়াছেন যে, ভারতের মধ্যে ফকীর ও সন্ন্যাসীগণ সর্বাপেক্ষা বেশি সাহসী ও কর্মক্ষম লোক। জনসাধারণ তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এইজন্য তাহারা ফকীর ও সন্ন্যাসীদের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন তথ্য সরকারী কর্মচারীদিগকে সরবরাহ করে না।[৯] শাহ মজনুর ফকীর বাহিনী রংপুর ও অন্যান্য জিলায় প্রতিপত্তি স্থাপন করে এবং গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করে। তাহারা ঘোড়া, উট ও হাতীতে চড়িয়া ঘুরিত এবং সব রকমের অস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। ফকীর-বাহিনীর সংখ্যা কোন কোন সময় পঞ্চাশ হাজারে পৌছিত।[১০]

১৭৮০ সালে শাহ মজনু বগুড়া জিলার করাইয়ের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর নিকট ৫০,০০০ টাকা দাবী করে এবং জানান যে, নির্দিষ্ট দিনে টাকা না দিলে তাঁহার জমিদারীতে ডাকাতি হইবে। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ভয় পাইয়া পরিবার পরিজনসহ বাড়ীঘর ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পার হইতে পূর্ব পারে চলিয়া যান। ১৭৮১ সালে শাহ মজনু মধুপুর জঙ্গলে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার ফকীরবাহিনী চতুর্দিকে লুটতরাজ করিতে থাকে। তাহারা জামালপুরে অধিকার বিস্তার করে। এইজন্য জামালপুর সন্ন্যাসীগঞ্জ নামে অভিহিত হইত। ময়মনসিংহের জমিদারগণ ফকীরদের বিরুদ্ধে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন।[১১] সরকার হেনরী লজের অধীনে একদল সৈন্য পাঠায়। ইহারা বেগুনবাড়ীতে ছাউনি স্থাপন করে। ১৭৮২ সালে চরকায়থ নামক স্থানে সরকারী সৈন্যদের সহিত ফকীরদের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফকীরগণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের ২৫ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়। শাহ মজনু তাহার লোকজন নিয়ে মধুপুর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব বশত ইংরাজ সৈন্যগণ ফকীরদের অনুসরণ করিতে অসমর্থ হয়। ফকীর বাহিনীর সহিত জঙ্গলে বাজার থাকিত। এই জন্য তাহাদের খাদ্যাভাব হইত না। হেনরী লজ দুই বৎসর

www.bjilibrary.com

ধরিয়া ফকীরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৭৮৪ সালে তিনি মজনুর বাহিনীকে মধুপুর ও ময়মনসিংহের অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন।[১২] ফকীর ও সন্ন্যাসীগণ পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের অভিযান চালাইত। কোন কোন সময় এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিত। পরে ইহারা মিলিত ভাবে ইংরাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। ১৭৮২ সালে হেনরী লজ লিখিয়াছেন যে, ময়মনসিংহে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ হয় এবং ইহাতে সন্ন্যাসীদের পরাজয় হয়। এই ঘটনার পর সন্ন্যাসীদের কোন কোন দল ফকীরদের সাথে যোগ দেয়। এই বৎসর ১০ই ডিসেম্বর রংপুরের কালেক্টর গুডল্যান্ড জানান যে, ফকীর ও সন্ন্যাসীদের একটি মিলিত বাহিনী ভিতরবন্দ অঞ্চল সমবেত হইয়াছে। লেফটেনান্ট ম্যাকডোনাল্ড সৈন্যদল লইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৮৩ সালে দুই পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফকীর-সন্ন্যাসী বাহিনী পরাজিত হয় এবং তাহাদের দুই জন নায়ক মোহনগিরি ও মনজু (শাহ্ মনজু হইতে ভিন্ন ব্যক্তি) বন্দী হন।[১৩] গুডল্যান্ড তাঁহার বিবরণে উল্লেখ করেন যে, মোহান্তমান গিরি, বাবুইগিরি ভবানীগিরি এবং আরও কয়েকজন নায়কের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীগণ ময়মনসিংহ জিলায় ভীষণ উৎপাত সৃষ্টি করে।[১৪]

স্থানীয় কয়েকজন দস্যু সরদার শাহ্ মজনুর অনুগত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের দস্যুসর্দার ভবানী পাঠকের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। শাহ্ মজনুর সহিত ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল। রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া জিলার জঙ্গলে ভবানী পাঠকের কর্মস্থল ছিল। গভীর জঙ্গলে তাঁহার অনুচরগণ সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিয়াছিল। সেখান হইতে তাহারা বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি করিত।[১৫] রংপুর বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী ও দিনাজপুর জিলাগুলিতে সাধারণত ইহাদের লুটতরাজ চলিত। ১৭৮৭ সালে ভবানী পাঠকের অনুচরগণ কয়েক জন সওদাগরের কয়েকটি তামাক বোঝাই নৌকা লুঠ করে। ইহার পর সরকার ভবানী পাঠকের বিরুদ্ধে লেফটেনান্ট ব্রেনারের অধীনে একদল সৈন্য পাঠায়। অনেক অনুসন্ধানের পর সৈন্যগণ ভবানী পাঠকের খোঁজ পায়। ভবানী পাঠক তখন ৬০ জন অনুচর সহ নৌকায় ছিলেন। সৈন্যগণ হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে ভবানী পাঠক ও তাঁহার দুইজন সহকারী নিহত হন, ৮জন আহত হয় এবং ৪২ জন বন্দী হয়। ভবানী পাঠক বাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। লেফটেনান্ট ব্রেনারের রিপোর্ট হইতে দেবী চৌধুরাণী নাম্নী একজন মহিলা দস্যুসর্দারের সম্বন্ধে জানা যায়। দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণী নৌকায় থাকিতেন এবং বেতন ভোগী বহু অনুচর রাখিতেন। তাঁহার অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। তিনি ডাকাতি করিতেন। ভবানী পাঠকের ডাকাতির অর্থ সামগ্রীতেও তাঁহার অংশ ছিল। লেফটেনান্ট ব্রেনার নিজে দেবী চৌধুরাণীকে দেখেন নাই, তিনি তাঁহার সম্বন্ধে শুনিয়াছেন। ব্রেনার মনে করেন যে, 'চৌধুরাণী' উপাধি হইতে বুঝা যায় যে, দেবী চৌধুরাণী একজন জমিদার ছিলেন। তিনি অবশ্যই সুন্দরী ছিলেন।[১৬] বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠককে বাংলাদেশে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

www.bjilibrary.com

রংপুর জিলার বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল দস্যুদের একটি আশ্রয়স্থল ছিল। রংপুরের কালেক্টর ইহাদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে অভিযান চালান। জঙ্গল হইতে বাহির হইবার সকল পথের মুখে তিনি সৈন্যদল মোতায়েন করেন। দস্যুদের কেহ কেহ পলাইয়া নেপাল ও ভুটানে আশ্রয় লয়। কিন্তু ইহাদের অধিকংশ পালাইতে অসমর্থ হয়।[১২] মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবার পর ইহারা নেতাসহ ধরা পড়ে। ৫৪৯ জন দস্যুর বিচার হয় (১৭৮৯)।[১৭]

ফকীর বাহিনীর নেতা শাহ মজনু ১৭৮৭ সালে মারা যান। তাঁহার অনেক সহকারী ছিল এবং তাহাদের নাম ছিল চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বক্‌শ, জরিশাহ, করিম শাহ ও রওশন শাহ। মুসা শাহ, শাহ মজনুর ভাই ছিলেন এবং শাহ মজনুর মৃত্যুর পর তিনি ফকীরদের নেতা হন। মুসা শাহের নেতৃত্বে ফকীরগণ রংপুর ও দিনাজপুরের অনেক স্থানে ডাকাতি করে। ১৭৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দিনাজপুরে একদল ইংরাজ সৈন্যকে পরাজিত করেন। তাঁহার সহকারী চেরাগ আলী শাহ ও পরাগল শাহ দিনাজপুর ও মালদায় লুটতরাজ করেন। ১৭৯১ সালে মুসাশাহ ও চেরাগ আলী রংপুর ও ময়মনসিংহের কয়েক জায়গায় ডাকাতি করেন। এই ঘটনার পর ফকীরদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।[১৮]

পঞ্চানন দাস নামে একজন বাঙ্গালী 'মজনুর কবিতা' নামে একখানি কবিতার বই রচনা করেন। মজনুর ফকীর বাহিনীর কার্যকলাপের ফলে দেশে যে ত্রাসের সঞ্চার হয় তিনি তাহা বর্ণনা করেন।[১৯]

www.bjilibrary.com

সপ্তম অধ্যায়
জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ

কোম্পানীর আমলে মুসলমান কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের শাসনকালে বহু সংখ্যক মুসলমান সামরিক বাহিনী এবং শাসন ও রাজস্ব বিভাগের চাকুরীতে ছিল। কোম্পানীর শাসনকালে চাকুরীহারা হইয়া তাহাদের অনেকে কৃষিকার্য অবলম্বন করে। কেহ কেহ দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার বিস্তর অনাবাদী ও জঙ্গলময় অঞ্চলে আবাদের কাজ শুরু করে। লাখেরাজ বাযেয়াফতির পর বহু মুসলমান পরিবার কৃষিজীবী হইয়া পড়ে। কোম্পানীর ব্যবসায় নীতির দরুন বাংলার বয়ন শিল্পের অবনতি হয় এবং বহু সংখ্যক তাঁতী জীবনধারণের জন্য কৃষিকার্য গ্রহণ করে।

কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থায় মুনফা-মূলক নীতি অনুসরণ করে। ইহা ঠিকাদারদের সহিত অতিরিক্ত হারে রাজস্বের বন্দোবস্ত করে। রাজস্বে অত্যধিক বৃদ্ধি করায় অনেক পুরাতন জমিদার জমিদারী হারান এবং হিন্দু বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই নতুন অর্থশালী ব্যবসায়ীগণ জমিদারীর মালিক হন। এই নতুন শ্রেণীর জমিদারদের ভূমি বা প্রজার সহিত বিশেষ সম্পর্ক ছিল না এবং ইহাদের উন্নতির প্রতি তাহাদের কোন নজর ছিল না। জমিদারী হইতে মুনাফা করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই নতুন শ্রেণীর জমিদারগণ নিজেরা রাজস্ব আদায় করিতেন না। তাঁহারা অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারদিগকে রাজস্ব আদায়ের ভার দিতেন। "যেমন স্ক্রোর উপর স্ক্রো তেমনি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ঠিকাদারীর পর ঠিকাদারী চলিয়াছিল এবং ইহাদের সকলের চাপ সর্বনিম্নে অবস্থিত প্রজার উপর পড়িয়াছিল।"[১] ১৮৩২ সালে সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্যে রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি হিউগ স্টোক এই বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে পাটনিদার ও তস্য পাটনিদারদের উদ্ভব হওয়ায় প্রকৃত জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে চারটি স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে; উপরের স্তরের প্রত্যেকেরই মুনাফার প্রতি লক্ষ্য এবং ইহাদের মুনাফার সমস্ত টাকা হতভাগ্য কৃষকদিগকে শোষণ করিয়া আদায় হয়।[২] সরকার প্রজাদের খাজনা নির্ধারিত করিবার ক্ষমতা জমিদারগণকে দিয়াছিল। জমিদারগণ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া খাজনা অত্যধিক বৃদ্ধি করেন। ইহা ব্যতীত জমিদারদের দালাল ও গোমস্তাগণ বিবিধ অজুহাতে প্রজাদের নিকট হইতে নানা রকমের কর আদায় করিত।[৩]

জমিদার, পাটনিদার, তস্য পাটনিদার, দালাল ও গোমস্তাদের অতিরিক্ত খাজনা ও বিবিধ করের দাবী মিটাইতে প্রজাগণ সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িত। অনেকে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। ঋণের জন্য অতিরিক্ত সুদ দিতে হইত এবং জমি ও ফসল মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিতে হইত। ফসল কাটা হইলে ইহা মহাজনের বাড়ীতে রাখা হইত এবং কখনও কখনও মহাজন ফসলের ব্যাপারে প্রজাদিগকে প্রতারিত করিত।[৪] এতদ্ব্যতীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদারগণ

www.bjilibrary.com

ভূমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। প্রজাদের জমির উপর কোন স্বত্ব ছিল না। রীতিমত খাজনা না দিলে অথবা যে কোন অজুহাতে জমিদার প্রজাদিগকে জমি হইতে উৎখাত করিতে পারিত। কোম্পানীর আমলে আদালতের বিচারকার্য এরূপ মন্থর গতিতে চলিত এবং প্রজাদের পক্ষে তাহা এত ব্যয়সাধ্য ছিল যে, তাহাদের পক্ষে জমিদারদের জুলুম হইতে রেহাই পাইবার কোন উপায় ছিল না। লর্ড হেস্টিংস প্রজাদের এই অসহায় অবস্থার কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা যে বন্দোবস্ত বহু সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত প্রচলন করিয়াছিলাম তাহা যে জনসাধারণকে চরম অত্যাচারের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছে, সে কথা এখন আমরা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি। আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রজাদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি।"[৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। মুসলমানদের শাসনকালে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তাহাদের উন্নতি ও অবনতি একসূত্রে গাঁথা ছিল। তাহাদের মধ্যে সামাজিকতার বন্ধনও ছিল। প্রজাগণ ভূমিস্বত্বের অধিকারী ছিল। কৃষির উন্নতিতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের স্বার্থ ও কল্যাণ জড়িত ছিল। জমিদার প্রজাদের অভিভাবক ও রক্ষক ছিলেন এবং প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার মতো ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। এই প্রাচীন জমিদারদিগকে জমিদারী হইতে সরাইয়া দিয়া এবং ব্যবসায়ীদের সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়া বৃটিশ সরকার জমিদার ও প্রজার মধ্যকার ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয়। প্রজাদের সহিত ব্যবসায়ী জমিদারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বৃটিশ আমলের জিলা কর্মচারীদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নানা ভাবে খাজনা ও কর আদায় করা ব্যতীত প্রজাদের সুখদুঃখের প্রতি জমিদারদের কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না।[৬]

মুসলমান আমলের জমিদারগণ স্থানীয় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব বহন করিতেন। তাঁহারা কিছু সংখ্যক পাইক ও পিয়াদা রাখিতেন এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব হইতে প্রজাদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতেন। কোম্পানীর সময়ে জমিদারদের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল না। প্রজাদের নিরাপত্তার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। কোন কোন জমিদার দস্যুদিগকে আশ্রয় দিতেন এবং ইহাদের লুণ্ঠিত অর্থ হইতে অংশ পাইতেন। ১৮৪২ সালে বাংলাদেশের পুলিশের প্রধান জানান যে, ফরিদপুরের হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান কৃষকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিতেছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি লুটতরাজ করাইতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। জমিদারদের প্রতিপত্তি ও অর্থের প্রভাবের দরুন প্রজারা কোনরূপ প্রতিকার পাইত না।[৭] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন ইংরাজ কর্মচারী লিখিয়াছেন, "জমিদারগণ বাংলাদেশের প্রতি জিলায় বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ইহা ফরাসী বিপ্লবের সময়কার রবস্‌পিয়ারের যুগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জমিদারদের বিভীষিকার রাজত্ব রবস্‌পিয়ারের

www.bjilibrary.com

যুগের বিভীষিকার রাজত্বের মতো দুইটি জিনিষের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাদের একটি মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপরটি কসাইখানা স্বরূপ বিচারালয়।"[৮]

১৭৮৩ সালের প্রজা–বিদ্রোহ

বাংলাদেশের কৃষকগণ অত্যাচার ও অবিচার সকল সময়ে নীরবে সহ্য করে নাই। কোন কোন সময় তাহারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানীর আমলে রাজস্ব ঠিকাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার অনুগত অনুচর দেবী সিংহকে রংপুর ও পুর্নিয়া জিলার রাজস্ব ঠিকদারী দিয়াছিলেন। দেবী সিংহ প্রজাদেরকে নানা ভাবে অত্যাচার করিয়া অত্যধিক টাকা আদায় করেন। ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস তাহাকে দিনাজপুর জমিদারীর ম্যানেজার নিয়োগ করেন।[৯] দেবী সিংহ প্রজাদের উপর কর বসান এবং অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে থাকে। যে সকল প্রজা টাকা দিতে অসমর্থ হইত তাহাদিগকে নির্মমভাবে বেত মারা হইত আলোবায়ুহীন কোঠায় আটক করিয়া রাখা হইত। দেবী সিংহের বর্বরোচিত অত্যাচার হইতে মেয়েলোকগণও বাদ পড়িত না। তাঁহার পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু প্রজা বাড়ীঘর ছাড়িয়া জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৭৮৩ সালে দিনাজপুর ও রংপুরের প্রজাগণ সংঘবদ্ধ ভাবে দেবী সিংহের দৌরাত্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। কোচবিহারের প্রজাগণও তাদের সহিত যোগ দেয়। প্রজা বিদ্রোহের কয়েক জন নেতা ছিলেন। তাদের প্রধান নেতা নবাব উপাধি ধারণ করেন। জয়দুর্গা নাম্নী একজন মহিলা জমিদার প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনিও প্রজাদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন। নেতৃস্থানীয় প্রজাগণ বিদ্রোহের খরচ নির্বাহের জন্য ডিঙ্গাবার্চা নামক একটি কর আদায় করিতেন।[১০]

প্রজা বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। ইহা দমনের জন্য সরকারকে সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করিতে হয়। প্রজাবাহিনীর সহিত সৈন্যদের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। মোঘলহাট নামক স্থানে একটি যুদ্ধে প্রজাবাহিনীর পরাজয় হয় এবং নবাব উপাধিধারী নেতা আহত অবস্থায় বন্দী হন। ১৭৮৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রজাদের সহিত বৃটিশ সৈন্যদের পটগ্রাম নামক স্থানে আর একটি যুদ্ধ হয়। লেফটেনান্ট ম্যাকডোনাল্ড এই যুদ্ধে সিপাহীদের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। পটগ্রামের যুদ্ধে প্রজাবাহিনীর অনেকে আহত হয় এবং অনেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ইহার পর প্রজা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকার দুইটি কমিশন নিয়োগ করে। দেবীসিংহকে দিনাজপুর জমিদারীর ম্যনেজারের পদ হইতে অপসারিত করা হয়। প্রজা বিদ্রোহের পাঁচজন নেতাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়।[১১]

১৭৮৩ সালের প্রজা বিদ্রোহ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে যে চেতনা ছিল এবং প্রয়োজন

www.bjilibrary.com

হইলে তাহারা যে অবিচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারিত, এই বিদ্রোহ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী কৃষকগণ সাধারণত শান্তপ্রকৃতির; কিন্তু নিজেদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে তাহারা সকল সময়ে সচেতন। যখনই তাহাদের উপর ক্রমাগত অন্যায় হইয়াছে তখনই তাহারা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৭৮৩ সালের বিদ্রোহের পর আরও কয়েক বার নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বাংলার প্রজাগণ বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হয়।

নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ

মুসলমানদের আমলে কৃষকগণ ইচ্ছামত নীলচাষ করিত ও বিক্রয় করিত। বাংলাদেশে ও বিহারে প্রধানত নীলের চাষ হইত। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে য়ুরোপীয় বণিকগণ বাংলাদেশের নীল য়ূরোপে রপ্তানী করিত। আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর ইংরাজ বণিকদের সেখানকার নীলের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়। তখন বাংলাদেশ নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংরাজ বণিকগণ বাংলাদেশের নীলের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লয়। তাহারা বহুস্থানে নীলের কারখানা বা নীলকুঠি স্থাপন করে। ফরিদপুর যশোহর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জিলায় নীলের চাষ হইত। ১৮০৫ সালে বাংলাদেশে ৬৪,০০০ মণ নীল উৎপন্ন হয় এবং ১৮৪৩ সালে উৎপন্ন নীলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হয়।[১২]

প্রথমে নীলের চাষ লাভজনক ছিল। কিন্তু কোম্পানীর শাসনকালে নীলকরগণ প্রজাদের উপর জোর-জবরদস্তি করিত এবং এত কম মূল্য দিত যে প্রচুর নীল উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কৃষকের বিঘা প্রতি প্রায় সাত টাকা ক্ষতি হইত।[১৩]

নীলচাষের জন্য নীলকরগণ কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বাছিয়া লইত এবং তাহাকে প্রতি বিঘায় মাত্র ২ $\frac{১}{৪}$ পারিশ্রমিক দিত। ১৮৫৪ সালে যশোহরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট জে, ডানবার লিখিয়াছেন যে, নীলকরগণ উৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষ করিতে প্রজাকে বাধ্য করিত, কিন্তু তাহাকে মজুরী অপেক্ষা কম মূল্য দিত।[১৪] তাহারা ১৭৯৫ সালে নীলের যে মূল্য নির্ধারিত করিয়া ছিল অর্ধশতাব্দী পরেও কৃষকদিগকে সেই মূল্যে নীলচাষ করিতে বাধ্য করিত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নীলের চাষে খরচও বাড়িয়াছিল। নীলকরগণ তাহা বিবেচনা করিত না। প্রথম দিকে নীলকরগণ বিনামূল্যে কৃষকদিগকে নীলের বীজ সরবরাহ করিত। নীল বুনিয়া গাছ হইলে কৃষকগণ গাছ কাটিয়া আটি বাধিয়া তাহা নীলকুঠিতে পৌছাইয়া দিত। এই সময় তাহারা পারিশ্রমিক পাইত। পরে নীলকরগণ চাষীদিগকে দাদন বা অগ্রিম টাকা দিবার প্রথা প্রচলন করে। তাহারা বিঘা প্রতি ২ টাকা দাদন দিত এবং বাকী ১ $\frac{১}{৪}$ টাকা নীলের ফসল সরবরাহের সময় শোধ করিত।[১৫]

www.bjilibrary.com

শুরুতে দাদন গ্রহণ করা কৃষকের ইচ্ছাদীন ছিল। পরে নীলকরগণ ইহা বাধ্যতামূলক করে এবং কৃষকদিগকে দাদন লইতে ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। কোন কৃষক দাদন লইতে ও চুক্তি করিতে অনিচ্ছুক হইলে তাহাকে নীলকরের কয়েদখানায় রাখা হইত ও কষ্ট দেওয়া হইত। অনেক সময় নীলকরগণ জাল চুক্তিপত্র তৈয়ার করিত এবং ইহার বলে তাহার অনুচরগণ কৃষকদের জমিতে নীলের চাষ করিত। কোন কোন সময় জমিদারগণও এই ব্যাপারে নীলকরকে সাহায্য করিত। নীলকরদের দালাল ও অনুচরদের দৌরাত্ম্যে কৃষকদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ইহারা কৃষকদের নিকট হইতে দাদনের টাকার অধিকাংশ ছলেবলে কাড়িয়া লইত। ১৮৫৬ সালে নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোপাল লাল মিত্র বলিয়াছেন যে, কৃষককে দাদনের টাকা হইতে নীলকরের গোমস্তা, আমীন ও তাগিদারদিগকে দিতে হইত। এ. স্কনস নামে একজন জজ মন্তব্য করিয়াছেন যে, নীলকরের দালালদের অর্থলালসা মিটাইয়া কৃষকগণ দাদনের এক তৃতীয়াংশ টাকাও বাঁচাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।[১৬]

কৃষকদের পক্ষে নীলকরদের অত্যাচার হইতে প্রতিকার পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ১৮৩০ সালে বিলাতের ডিরেক্টর সভা নীলচাষ সংক্রান্ত আইনের প্রজার স্বার্থ বিরোধী কয়েকটি নিয়মকানুন রহিত করিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ইহাতেও কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। কোন কোন সময় প্রজাগণ নীলকরের অবিচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিত। কিন্তু প্রতিপত্তিশালী নীলকরের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হইত না। গ্রামের কেহ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করিত না। গণি দফাদার নামে একন চৌকিদার এক নীলকরকে একটি গ্রামে আগুন লাগাইতে দেখিয়াছিল। সে তখন চীৎকার করিয়া এই কথা সকলকে জানাইয়া দিয়াছিল। এইজন্য নীলকর তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চার মাস একটি অন্ধকার কক্ষে কয়েদ করিয়া রাখে। নীলকর পুলিশদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করে।[১৭]

নীলকরগণ ইংরাজ ছিল। ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ নীলকরদিগকে খাতির করিত। এই সম্বন্ধে ১৮৬০ সালে নীলকর কমিশন মন্তব্য করে "ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট স্বভাবতই তাহার স্বদেশবাসী ইংরাজ নীলকরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিত।"[১৮] সাংঘাতিক অপরাধ করিলেও নীলকরকে শাস্তি দেওয়া অসম্ভব ছিল। নদীয়ার নীলকর জেমস্ হোয়াইট একজন নীল চাষীকে হত্যা করে নিম্ন হইতে উচ্চ আদালত পর্যন্ত জেমস্ হোয়াইটের প্রতি জুরীদের পক্ষপাতিত্বের দরুন এই সাংঘাতিক অপরাধের জন্যও তাহাকে কোনরূপ শাস্তি পাইতে হয় নাই।[১৯] যদি কোন ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের অত্যাচার বন্ধের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিত তাহা হইলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইত। একজন মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কোন কৃষকের জমিতে নীল করের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অন্য জিলায় বদলি করে।[২০]

দীনবন্ধু রচিত 'নীল দর্পন' নাটক এবং হিন্দু পেট্রিয়ট ও অমৃত বাজার পত্রিকার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নীলকরগণ নীলচাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত।[২১] যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৫৪ সালে লিখিয়াছেন যে, খুলনার নীলকর এম,

www.bjilibrary.com

রেনির অত্যাচারের দরুন তাহার নীলকুঠির এলাকাস্থ প্রজাগণ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। নীলকরগণ বৎসরের পর বৎসর কৃষকদিগকে দাদনের ধারের মধ্যে রাখিয়া দিত। জজ এ. স্কনস এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। জনৈক নীলকর এক কৃষককে ৩ $\frac{১}{৪}$ বিঘা জমিতে নীল চাষের জন্য $\frac{১}{২}$ টাকা নগদ ও ৬ $\frac{১}{২}$ টাকা পূর্বের বকেয়া টাকার দাদন দিয়াছিল। নীলকরের দালালগণ জমি মাপিবার সময় কৃষকদিগকে ফাঁকি দিত। দেড় বিঘা জমি মাপিয়া এক বিঘা করিত। ছয় বাণ্ডিল নীলের গাছ দুই বাণ্ডিল গণনা করিত। এইভাবে তাহারা কৃষককে প্রতারিত করিত এবং তাহাকে ঋণের মধ্যে রাখিয়া দিত।[২২] একজন ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন যে, নীলের যে সকল বাক্স বিলাতে প্রেরিত হয় সেগুলির মধ্যে এরূপ কোন বাক্স নাই যাহা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়। এশলী ইডেন বলিয়াছেন যে, খুন, দাঙ্গা, ডাকাতি, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, মানুষ চুরি প্রভৃতি এমন কোন অপরাধ নাই যাহা নীলকরগণ করিত না।[২৩] এশলী ইডেন, লুই জেকসন প্রমুখ কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারী কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাহাদের চেষ্টায় সরকার আদেশ জারী করেন যে, নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন।[২৪]

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। অন্যায়ের প্রতিকারে জন্যে তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে শুরু করে। ইহার ফলে প্রজাদের সহিত নীলকরদের কায়েকটি স্থানে সংঘর্ষ বাধে। ১৮৫৯ সালে যশোহর, নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুরের কৃষকগণ একতাবদ্ধ হয় এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাহারা কোন অবস্থাতেই আর নীলের চাষ করিবে না।[২৫] কলিকাতায় নীলকরদের সমিতি অভিযোগ করে যে, সরকার নীলের চাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন বলিয়া আদেশ জারী করায় তাহাদের নীলের ব্যবসায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। তাহারা নবনিযুক্ত ছোট লাট জন স্যার পিটার গ্রান্টকে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন করিতে সম্মত করে। এই কুখ্যাত আইনটি ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ প্রণয়ন করা হয়। ইহার বলে নীল চাষের চুক্তি ভঙ্গ করা অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। এই আইন ছয় মাসের জন্য বলবৎ করা হয়। নীলকরগণ এই আইনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কৃষকদের উপর ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করে। ইংরাজ কর্মচারীদের সহযোগিতায় তাহারা যশোহর ও নদীয়া জিলার কৃষকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিতে থাকে। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ নীলকরদের কর্মচারীর মত তাহাদের কার্য সমর্থন করে।[২৬]

কৃষকগণ একতার মূল্য বুঝিয়াছিল এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে শিখিয়াছিল। তাহারা সাহসের সহিত নীলকর ও তাহাদের সমর্থকদের শক্তির সম্মুখীন হয়। তখনকার সংবাদপত্রগুলি হইতে অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে নিরীহ কৃষকদের সংগ্রামের বিবরণ জানা যায়। ১৮৬০ সালের ৮ এপ্রিল হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত একজন দেশবাসীর পত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,

www.bjilibrary.com

"যশোহর জিলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। প্রায় ৮৮টি গ্রামের কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া নীল চাষ না করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। নীলকরগণ জিলা ম্যাজিস্ট্রেটেদিগকে নিজেদের পক্ষে টানিয়া লইয়াছে এবং প্রজাদের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট রিপোর্ট করাইতে সম্মত করাইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেটগণ সরকারকে জানাইয়াছে যে, প্রজাগণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এক সময় তাহারা জিলা কর্মচারীদের উপর হামলা করিয়াছে। নীলকরগণ এইরূপ চক্রান্ত করিয়া প্রজাদের শান্তির ব্যবস্থা করিতে এবং তাহাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।" পত্রপ্রেরক আরও জানাইয়াছেন যে, যশোহরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ৫৫ জন কৃষককে কয়েদ করেন এবং আরও ৩০০ জনকে গ্রেফতার করেন। এই অত্যাচারের প্রতিবাদের ৯০০ জন প্রজা সরকারের নিকট এক আবেদনপত্র দাখিল করিতে কালাপুর হইতে কলিকাতায় যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে সৈনিকগণ গ্রামগুলিতে লুটতরাজ করে এবং অনেক লোককে ধর পাকড় করে।[২৭]

১৮৬০ সালে ২৬ মে হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত আর একটি পত্র হইতে প্রজা বিদ্রোহের বিবরণ পাওয়া যায়। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ হইবার খবর পাইয়া যশোহরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার কালাপুর থানায় যান এবং সেখানে ঘোষণা করেন যে, তিনি কৃষকদের অভিযোগের প্রতিকার করিতে আসিয়াছেন। প্রায় দশহাজার কৃষক তাহার নিকট হাজির হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে উপদেশ দেন। প্রজাগণ তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য করে এবং তাহারা একবাক্যে নীলচাষ করিবে না বলিয়া মত প্রকাশ করে। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার চারিদিকের দশ হাজার কৃষকের জনতা দেখিয়া ভয় পাইয়া যান। তখন তিনি দারোগার সাহায্যে প্রতি গ্রামের একজন করিয়া ৪৯ জন মণ্ডলকে বাছিয়া লন এবং অন্যদিগকে জানান যে, তিনি তাহাদের মণ্ডলদের সহিত নীলচাষের ব্যাপারে আলোচনা করিবেন। এই মণ্ডলগণ থানায় আসিলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদশে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হয়। ইহাদের ৪৫ জন নীলের চাষ করিবার জন্য স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাকী ৪ জন মন্ডল কিছুতেই নীলের চাষ করিতে স্বীকার করে নাই। এই জন্য তাহাদিগকে ৬ মাস কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। (পত্রপ্রেরক ৪ জনের স্থলে ৬ জনের নাম দিয়েছেন।) ইহাদের নাম ছিল আফি, কাদিম, গরীবুল্লাহ, মাদারী শেখ, আবদুল বিশ্বাস ও বাউল।[২৮] হিন্দু পেট্রিয়টে ৫ জুলাই প্রকাশিত আর একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, নদীয়া জিলার ২৭ টি গ্রামের কৃষকগণ নীলকরের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ২০ জুন মীরগঞ্জ কুঠির নীলকর জন মেক আর্থার একদল লাঠিয়াল লইয়া মল্লিকপুরের কৃষকদের উপর আক্রমণ করে। কৃষকগণ হঠাৎ এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই সংঘর্ষে কয়েকজন মারা যায়। পাঞ্জু শেখ, উজির মাহমুদ, বসিরউদ্দীন, আসগর এবং আরও অনেকে আহত হয়।[২৯]

নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহের সমালোচনা করিয়া ১৮৬০ সালের ১৯ মে পেট্রিয়টে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে হরিশচন্দ্র মুখার্জী লিখিয়াছেন, "বাংলাদেশ বাঙ্গালী

www.bjilibrary.com

কৃষকদের জন্য গর্ব করিতে পারে। বাংলাদেশের কৃষকগণ নীল চাষের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে শুরু হইতে যে সকল গুণের স্পষ্টত পরিচয় দিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষমতা, অর্থ ও রাজনৈতিক জ্ঞান ও নেতৃত্বের অভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষকগণ আর একটি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। এই বিপ্লব ইহার ব্যাপকতা ও গুরুত্বের দিক দিয়া যে কোন দেশের সামাজিক বিপ্লব হইতে কোন অংশে ছোট নয়। তাহারা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে, আইন তাহাদের প্রতিকূলে বিচারালয় তাহাদের শত্রু পক্ষে, সংবাদপত্রগুলিও তাহাদের প্রতিপক্ষে ছিল; ইহা সত্ত্বেও তাহারা সংগ্রাম করিয়া যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা দেশের সর্ব শ্রেণীর লোকের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপকারে আসিবে। ধৈর্য, অধ্যবসায়, দৃঢ়সংকল্প প্রভৃতি গুণের বলে এবং কোন হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন না করিয়া তাহাদের এই বিরাট সাফল্য অর্জিত হইয়াছে।[৩০]

নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিপ্লব এইরূপ প্রবল আকার ধারণ করে যে, সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। গবর্ণর জেনালের লর্ড ক্যানিং মন্তব্য করেন যে, ১৮৬০ সালের নীল সংকটের সময় তিনি যেরূপ উৎকণ্ঠিত হন ১৮৫৭ সালে দিল্লী পতনের সংবাদেও তিনি সেরূপ উৎকণ্ঠিত হন নাই। বাংলাদেশের ছোটলাট স্যার জন, এফ, গ্রান্ট ১৮৬০ সালে যখন ঢাকা হইতে ষ্টীমারে ফিরিতেছিলেন তখন তিনি যমুনা নদীর উভয় তীরে হাজার হাজার কৃষকদের জনতা দেখিয়াছিলেন; ইহারা নীলকরদের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাহার নিকট আবেদন করিয়াছিল। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই হাজার হাজার প্রজা তাঁহার নিকট একই আবেদন জানাইয়াছে।[৩১]

প্রজা-বিপ্লবের জয় হয়। ১৮৬০ সালে সরকার নীলের চাষ সংক্রান্ত বিষয় তদন্তের জন্য নীল কমিশন নিয়োগ করে। নীল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার নীলচাষ কৃষকদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন বলিয়া আদেশ জারী করে।[৩২]

১৮৭২ সালে পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রজারা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। প্রজারা বেআইনী কর দিতে অস্বীকার করে। ইহাতে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং এক বৎসর পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে। সরকার হস্তক্ষেপ করায় প্রজাদের বিদ্রোহ বন্ধ হয়। পাবনার বিদ্রোহ বগুড়ার প্রজাদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়। এই বিদ্রোহের পর সরকার প্রজাদের অভিযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে। ইহার ফলে প্রজারা জমিদারদের দৌরাত্মা ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে কিছুটা রেহাই পায়।

www.bjilibrary.com

অষ্টম অধ্যায়
মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন

শাসন ক্ষমতা হারাইবার পর বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের দ্রুত অবনতি হয়। তাহাদের আর্থিক ঐশ্বর্য নষ্ট হয় এবং তাহারা বিত্তহীন কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাসংকট দেখা দেয় এবং তাহারা অনুন্নত হইয়া পড়ে। শিক্ষার অভাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে নানা রকমের কুসংস্কার অনৈসলামিক রীতিনীতি দেখা দেয়। পীরপূজা, গোরপূজা, দরগাহ জিয়ারত সত্যপীর পূজা ইত্যাদি প্রথা সমাজে প্রবেশ করে। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় মুসলিম দেশগুলিতে রাজনৈতিক জীবনের অবনতি হয়। ইহার সঙ্গে তাহাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও অধঃপতন শুরু হয়। এই সময় মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি সংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আরবদেশের অন্তর্গত নেজদের অধিবাসী মুহম্মদ ইবন আবদুল ওহাব (১৭০৩-৯২) এক সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করিয়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত সরল আদর্শে মুসলিম সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর নেজদের শেখ মুহম্মদ ইবন সউদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও আরবের বিভিন্ন স্থানে প্রসারের ব্যবস্থা করেন। মক্কা ও মদীনায় প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং হজের সময় মুসলমানদের নিকট সংস্কারের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা হয়।

ফরায়েজী আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দুইটি সংস্কার-আন্দোলন গড়িয়া উঠে। উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ শহীদ তরীকায়ে মুহম্মদীয়া নামক সংস্কার আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে হাজী শরীয়াতুল্লাহ্ ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। এই দুইটি আন্দোলনের মধ্যে আদর্শগত সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে কিছুটা মৌলিক পার্থক্য ছিল।[১] হাজী শরীয়াতুল্লাহ ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার অর্ন্তগত শামাইল নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ৮ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা আবদুল জলিল পরলোকগমন করেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় যান এবং মাওলানা বাশারত আলীর নিকট কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি ফুরফুরাতে আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি তাঁহার শিক্ষক বাশারত আলীর সহিত হজ করিতে মক্কা শরীফে যান।[২] শরীয়াতুল্লাহ মক্কায় মুরাদ নামক এক বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকট ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি কয়েক বৎসর তাহের সম্বল

www.bjilibrary.com

নামক এক হানাফী শাস্ত্রবিদের শিক্ষাধীনে থাকেন এবং তাহার নিকট কাদীরিয়া তরীকার সুফী মতবাদে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দুই বৎসর কায়রোর জামিয়া-আল-আজহার শিক্ষকেন্দ্রে ছিলেন।[৩] আরবে অবস্থান কালে শরীয়াতুল্লাহ মুহম্মদ ইবন আবদুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং ইহার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৮১৮ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হাজী শরীয়াতুল্লাহ বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে নানারূপ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি লক্ষ্য করেন। মুসলমানগণ নিজেদের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। শরীয়াতুল্লাহ ইহাদের জন্য দুঃখ অনুভব করেন এবং ইহাদের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফরায়েজী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আদর্শে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তাহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী শিক্ষা দেওয়া তাঁহার সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। তিনি দ্বিতীয় বার মক্কা শরীফে যান এবং ১৮২০ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন।[৪] ইহার পর তিনি সমাজ সংস্কার কাজে নিয়োজিত হন। অল্পকালের মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জিলায় প্রসার লাভ করে। শরীয়াতুল্লাহর আদর্শের উল্লেখ করিয়া জেমস ওয়াইজ লিখিয়াছেন, "তাঁহার দেশবাসী তাঁহার নির্মল ও আদর্শ-মন্ডিত জীবনের প্রশংসা করিত ও তাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিত। তিনি তাহাদিগকে দুর্দিনে উপদেশ দিতেন ও দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন।"[৫]

ফরায়েজী মতবাদের সহিত সাবেকী মতবাদের বিরোধ দেখা দেয়। তায়াইয়ুনী মতবাদের অন্যতম প্রচারক মাওলানা কেরামত আলী সাবেকীদের নেতৃত্ব করেন।[৬] স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েজী আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। জেমস ওয়াইজ লিখিয়াছেন, "হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েজী আন্দোলনের বিস্তৃতিতে ভয় পাইয়া যান, কারণ এই সংস্কার আন্দোলন মুসলমান প্রজাদিগকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল।" জমিদারগণ প্রজাদের উপর নানা রকম অবৈধ কর বসাইতেন। দূর্গাপূজা, কালীপূজা, প্রভৃতি হিন্দু উৎসবের জন্যও মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত।[৭] হাজী শরীয়াতুল্লাহ প্রজাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তাহারা জমিদারকে কোন অবৈধ কর না দেয়। কোন কোন হিন্দু জমিদার গরু কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শরীয়াতুল্লাহ ঈদ প্রভৃতি উৎসবে মুসলমানদেকে গরু কুরবাণী করিতে উৎসাহিত করেন। হাজী শরীয়াতুল্লাহ শান্তিপ্রিয় সংস্কার ও প্রচারক ছিলেন। কিন্তু নানা রকমের অজুহাতে হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েজী প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন। তখন তিনি তাহাদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তিনি একটি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার শিষ্য জালাল উদ্দিন মোল্লার উপর এই কাজের ভার ন্যস্ত করেন। জমিদারগণ নানাভাবে তাঁহাকে

www.bjilibrary.com

হয়রানী করিতে চেষ্টা করেন। ১৮৩৯ সালে তাঁহার উপর পুলিশের নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। হাজী শরীয়াতুল্লাহ্ ১৮৪০ সালে পরলোকগমন করেন।

হাজী শরীয়াতুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহসিনউদ্দীন ওরফে দুধু মিয়া ফরায়েজীদের ওস্তাদ ও নেতা মনোনীত হন। ১৮১৯ সালে দুধু মিয়ার জন্ম হয়। ১২ বৎসর বয়সে দুধু মিয়া শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফে প্রেরিত হন। ৫ বৎসর পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি পিতার মত খ্যাতনামা আলেম ছিলেন না, কিন্তু অসাধারণ সংগঠক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ফরায়েজীদিগকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করিয়া তাহাদের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগরিত করেন। জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তিনি লাঠিয়াল বাহিনীকে শক্তিশালী করেন। তিনি ফরায়েজীদিগকে লইয়া একটি বিরাট প্রজা আন্দোলন গঠন করেন।

প্রজাগণ পূজাকর দিতে অস্বীকার করায় কানাইপুরের শিকদার জমিদারগণ ও ফরিদপুরের ঘোষ জমিদারগণ তাহাদিগকে নানারকম অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেন। তাঁহারা ফরায়েজী প্রজাদের উপর দাঁড়িকর বসান। জেমস ওয়াইজ লিখিয়াছেন যে, আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য হিন্দু জমিদারগণ প্রজাদিগকে বিবিধ উপায়ে শাস্তি দিতেন।[৮] অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য দুধু মিয়া ১৮৪১ সালে একদল লাঠিয়াল লইয়া কানাইপুর অভিমুখে রওয়ানা হন। জমিদার ভয় পাইয়া যান এবং দুধু মিয়ার সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হন। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, তিনি মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে অবৈধ কর ও পূজাকর আদায় করিবেন না। ইহার পর ১৮৪২ সালে দুধু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী ফরিদপুরের ঘোষ জমিদারদের বাসস্থান আক্রমণ করে এবং লুণ্ঠন করে। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে প্রজাদের ত্রাণকর্তা রূপে দুধু মিয়ার নাম পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে। প্রজাগণ দলে দলে প্রজা আন্দোলনে যোগ দেয়।[৯]

ফরায়েজী আন্দোলন ধ্বংস করিবার জন্য হিন্দু জমিদারগণ নীলকরদের সহিত যোগ দেন। মাদারীপুরের নীলকর ডানলপের প্ররোচনা ও প্রভাবে পুলিশ দুইবার দুধু মিয়াকে গ্রেফতার করে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ করে; কিন্তু সাক্ষীর অভাবে অভিযোগ বাতিল হইয়া যায়। পঞ্চচর নীলকুঠিতে ডানলপের গোমস্তা কালীপ্রসাদ কাঞ্চিলালের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এই গোমস্তা দুধু মিয়ার বাহাদুরপুরের বাড়ীতে লোকজন নিয়া ডাকাতি করে, অর্ধ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং চারজন চৌকিদারকে হত্যা করে। ডানলপের প্রভাবে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট এই ডাকাতির কেস উপেক্ষা করে।[১০] ইহার পর দুধু মিয়া কাঞ্চিলালের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁহার শিষ্য কাদির বখ্‌শ একদল লাঠিয়াল লইয়া ১৮৪৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর পঞ্চচর নীলকুঠি আক্রমণ করেন। তাহারা নীলকুঠি পুড়াইয়া দেয় এবং কাঞ্চিলালকে কাটিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়।[১১] এই ব্যাপারে দুধু মিয়া ও অন্যান্য ৬৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। জিলা কোর্টে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হয়। সদর নিযামত আদালতে আপীল করা হয় এবং ইহার বিচারে তাহারা খালাস পায়। পঞ্চচরের ঘটনার পর

www.bjilibrary.com

জমিদার ও নীলকরগণ দুধু মিয়াকে সমীহ করিয়া চলেন এবং ফরায়েজী প্রজাদের নিকট হইতে অবৈধ কর আদায় করিতে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে বিরত হন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় সরকার দুধু মিয়াকে গ্রেফতার করে, কারণ সরকারের আশঙ্কা হয় যে, তিনি বিদ্রোহে যোগ দিতে পারেন। তাঁহাকে কলিকাতার জেলে রাখা হয়। জেমস ওয়াইজ লিখিয়াছেন যে, দুধু মিয়া আদালতে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আহবানে ৫০,০০০ লোক সাড়া দিবে এবং তিনি তাহাদিগকে যেখানে যাইতে আদেশ করিবেন তাহারা সেখানেই যাইবে।১২ দুই বৎসর পর দুধু মিয়া জেল হইতে মুক্তি পান। বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে ফরিদপুরের পুলিশ কতৃপক্ষ আবার গ্রেফতার করে। ১৮৬০ সালে তিনি ছাড়া পান। ইহার পর তিনি ১৩৭ নং বংশাল রোডে বসতি স্থাপন করেন। দুধু মিয়া ১৮৬২ সালে পরলোকগমন করেন। বংশাল বাসস্থানের সংলগ্ন স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

দুধু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র গাযীউদ্দীন হায়দর (১৮৬২-৬৪), আবদুল গফুর ওরফে নয়ামিয়া (১৮৬৪-৮৩) এবং খান বাহাদুর সইদউদ্দীন আহমদ (১৮৮৩-১৯০৬) যথাক্রমে ফরায়েজীদের ওস্তাদ মনোনীত হন। সইদউদ্দীন আহমদের পর তাঁহার পুত্র আবু খালিদ রশিদউদ্দীন ওরফে বাদশা মিয়া ওস্তাদের আসন লাভ করেন। সইদউদ্দীন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। বাদশা মিয়া খিলাফল ও অসহযোগ আন্দোলন যোগ দেন। কিছুকাল তাঁহাকে অন্তরীণ রাখা হয়। বাদশা মিয়া ১৯৫১ সালের ১৯৫১ সালের১৩ ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।[১৩]

মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন ইসলামের আদর্শে সুনিয়ন্ত্রিত করা ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। শরীয়াতুল্লাহ্ জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তোলেন এবং তাহাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিক্ষা দেন। দুধু মিয়া প্রজাদের মধ্যে অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেন এবং ফরায়েজী আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটি শক্তিশালী প্রজা বিপ্লব গড়িয়া তোলেন। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে এই অসমসাহসিক ফরায়েজী নেতার সংগ্রামের কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অতি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। প্রজাদের জন্য পিতার দরদ নিয়া এবং অবিচারের বিরুদ্ধে গাযী বা ধর্ম যোদ্ধার তেজ নিয়া তিনি শক্তিশালী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। এই সংগ্রামে তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অপেক্ষা প্রজাদের স্বার্থ তাঁহার বেশি প্রিয় ছিল। তিনি প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রজাদের প্রতি জমিদারের অবিচারের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন। যখন তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন তিনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন। অক্লান্ত সংগ্রামের ফলে তিনি জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে সমর্থ হন।

ফরায়েজী প্রজা আন্দোলনের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক ছিল না। ফরায়েজীদের আদর্শ ও কর্মসূচী সম্বন্ধে এইচ. বেভারিজ লিখিয়াছেন, "অনেক সময় ফরায়েজীদিগকে ওহাবীদের সহিত এক বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে,

www.bjilibrary.com

এই দুই মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ধর্মীয় সংস্কার ইহাদের উদ্দেশ্য; মুহম্মদের প্রচারিত আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা উভয়েরই লক্ষ্য; ইহারা উভয়েই মুসলমান সমাজ হইতে কুসংস্কারপূর্ণ রীতিনীতি দূর করিতে প্রচারকার্য চালাইয়াছে। কিন্তু ইহা মনে হয় না যে, ফরয়েজীগণ ওহাবীদের মতো কোন বিপজ্জনক রাজনৈতিক মত পোষণ করিয়াছে অথবা তাহাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা হিন্দু জমিদারদের করের দাবীর বিরোধিতা করা ছাড়া ইহার বাহিরে অন্য কিছুতে বিস্তৃত হইয়াছে। হিন্দু জমিদারগণ ও ভীতি-প্রদর্শনকারীগণ ফরায়েজীদিগকে একটি রাজনৈতিক বিপদরূপে দেখাইতে অভ্যস্ত কিন্তু আমি মনে করি, এরূপ ধারণ ভিত্তিহীন। অবশ্য তাহারা সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ও সচেতন; কিন্তু ইহাকে তাহাদের চরিত্রের ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। তাহাদের বিবাহ-উৎসবে গান-বাজনা হয় না; পীর-প্রথায় তাহাদের অনুরাগ নাই।[১৪]

সৈয়দ আহমদ শহীদ

মোগল সাম্রাজ্যের পতন-যুগে ভারতের মুসলমান সমাজের অধঃপতন শুরু হয়। দিল্লীর বিখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০২-৬০) সমাজ সংস্কার বাণী প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র শাহ আবদুল আজিজ পিতার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সমাজ সংস্কারের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন এবং তরীকায়ে মুহম্মদীয়া নামে সংস্কার-আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করিয়া ইসলামের আদর্শে মুসলিম সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী অত্যাচারী শাসকের কবল হইতে মুসলমানদিগের মুক্ত করিবার জন্য জিহাদ আন্দোলন গঠন করেন।

১৭৮৬ সালে লক্ষ্ণৌর নিকটে রায় বেরেলীতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর জন্ম হয়। তিনি দুই বৎসর দিল্লীতে শাহ আবদুল আজিজের নিকট কুরআন ও হাদীস শিক্ষা করেন এবং তাঁহার সুফীমত ও সংস্কার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার পর তিনি পিন্ডারীদের নেতা আমীর খাঁর অধীনে সৈনিকের কাজ গ্রহণ করেন। তিনি নামাযে সৈন্যদের ইমামতি করিতেন।[১৫] ১৮১৭ সালে সৈয়দ আহমদ দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন এবং সমাজ সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শাহ আবদুল আজিজের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল ও জামাতা মাওলানা আবদুল হাই সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব করেন। সৈয়দ আহমদ সমাজ সংস্কারের জন্য প্রচারকার্য শুরু করেন। ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য তিনি মুসলমানদিগকে জিহাদ করিতে উপদেশ দেন।[১৬] তিনি১৮২১ সালে ৪০০ শিষ্য লইয়া। হজ করিতে যাত্রা করেন। তাঁহার কলিকাতা যাইবার পথে বহু লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রায় দুই বৎসর পর তিনি মক্কা হইতে দেশে ফিরেন। হজ হইতে ফিরিয়া সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হন। এই সময় পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর রণজিৎ সিংহের শাসনাধীন ছিল। শিখদের অত্যাচারে পাঞ্জাবের মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মুক্তির জন্য সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার

www.bjilibrary.com

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সীমান্ত এলাকা হইতে পাঠানদের সহযোগিতায় শিখরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে লইয়া ১৮২৬ সালের জানুয়ারী মাসে সীমান্তের পথে রওয়ানা হন। জিহাদীগণ গোয়ালিয়র, রাজপুতনা, সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্তান কান্দাহার, গজনী ও কাবুল হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অঞ্চলে পৌঁছে। বাংলা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারত হইতে জিহাদের জন্য লোক ও অর্থ সংগৃহীত হয়।[১৭]

১৮২৬ সালের ডিসেম্বরে সৈয়দ আহমদ নওশেরাতে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সেখান হইতে রণজিৎ সিংহের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করেন। রণজিৎ ইহা উপেক্ষা করেন। ইহার পর সৈয়দ আহমদ শিখরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। কয়েকটি যুদ্ধে শিখদিগকে পরাজিত করিয়া জিহাদীগণ পেশোয়ার দখল করে। সৈয়দ আহমদ পেশোয়ারে মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপন করেন। তিনি ইহার ইমাম বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু পাঠানদের মধ্যে দলগত বিরোধের দরুন জিহাদীগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে রণজিৎ সিংহ পেশোয়ার পুনরুদ্ধার করেন। সৈয়দ আহমদ সামরিক কেন্দ্র বালাকোটে স্থানান্তরিত করেন। রণজিতের খালসা বাহিনী বালাকোট আক্রমণ করেন। ১৮৩১ সালের মে মাসে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সৈয়দ আহমদ, শাহ ইসমাইল এবং আরও অনেকে যুদ্ধে নিহত হন। ইহার পর জিহাদীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর পর সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্যগণ আবার জিহাদ আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করে।

তিতুমীরের প্রজা–আন্দোলন

তিতুমীর ফরায়েজী নেতাদের মত একটি প্রজা-আন্দোলন গঠন করিয়াছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী। তিনি ১৭৮১ সালে চব্বিশ পরগণা জিলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মুনশী আমীর নামক স্থানীয় ভূস্বামীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তিতুমীর কলিকাতার একজন মল্লযোদ্ধা ছিলেন। স্থানীয় জমিদারগণ তাঁহাকে প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। এই ব্যাপারে এক বিবাদের সহিত জড়িত থাকায় তাঁহার কিছু কালের জন্য জেল হয়।[১৮] জেল হইতে খালাস পাইয়া তিতুমীর দিল্লীর রাজ-পরিবারের জনৈক ব্যক্তির অধীনে কাজ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহিত হজ করিতে যান। মক্কায় থাকাকালে তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে তিতুমীর দেশে ফিরেন এবং হায়দরপুরে বসতি স্থাপন করিয়া সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প কালের মধ্যে তিন চার শত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং ইসলামের আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। তাহারা দাঁড়ি রাখিত ও বিশিষ্ট ধরনের পোশাক পরিত। এইজন্য সমাজে তাহাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল[২৯]

www.bjilibrary.com

চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জিলার বহু কৃষক তিতুমীরের সংস্কার আন্দোলনে সাড়া দেয়। ইহার ফলে তাঁহার নেতৃত্বে এক গণ-আন্দোলন গড়িয়া উঠে। মুসলমান প্রজাগণ সংঘবদ্ধ হইতেছে দেখিয়া স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ ভয় পাইয়া যান এবং তাহারা তিতুমীরের অনুচরদের শক্তি বৃদ্ধির পথ বন্ধ করিতে সচেষ্ট হন। তারাগুনিয়া, নগরকোট ও কুমার গাছির জমিদারগণ তিতুমীরের শিষ্যদিগকে অপমান ও জরিমানা করিতে শুরু করেন। পুরয়ার কিষেন দেবরায় মুসলমান প্রজাদের উপর দাঁড়ি কর বসান। সরফরাজপুরের প্রজাগণ এই অপমানজনক কর দিতে অস্বীকার করে।[২০] তিতুমীর প্রজাদের উপর জমিদারের অত্যাচার বন্ধের জন্য জিলা ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে জমিদারের অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় তিতুমীর প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অস্ত্রের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। তিনি ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার শিষ্য মুইজউদ্দনের নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের বাড়ীতে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। মিসকিন শাহ্ নামক জনৈক ফকীর তাঁহার সহিত যোগ দেন। তিতুমীরের অনুচরগণ নারিকেলবেড়িয়ায় সমবেত হয়। তাহারা সেখানে বাশের কিল্লা নির্মাণ করেন এবং রসদ জমা করে। তাহারা জমিদারের অন্যায়ের প্রতিকার করিতে প্রস্তুত হয়। তাহারা পুরয়া গ্রামে প্রবেশ করে, সেখানে বাজারে গরু জবেহ করে এবং ইহার রক্ত মন্দিরে ছড়াইয়া দেয়। তাহারা নিজদিগকে দেশের মালিক বলিয়া ঘোষণা করে। তিতুমীরের সহচর গোলাম মাসুম সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী লাউঘাটা এবং আরও কয়েকটি গ্রাম আক্রমণ করিয়া দখল করে। চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার অনেকগুলি গ্রামে তিতুমীরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১]

বারাসতের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার ১২৫ জন সশস্ত্র সৈন্য লইয়া তিতুমীরের সামরিক কেন্দ্র নারিকেলবেড়িয়ার দিকে অগ্রসর হন। এক সংঘর্ষে আলেকজান্ডারের সৈন্যগণ পরাজিত হয়। তাহাদের ১৫ জন্য নিহত ও অনেকে আহত হয়। বশীরহাটের দারোগা আহত অবস্থায় বন্দী হয়। ইহার পর তিতুমীরের মুক্তি বাহিনী বারগুরিয়ার নীলকুঠি ও অন্য একটি নীলকুঠি লুণ্ঠন করে। ১৭ই নভেম্বর কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ৩০০ সৈন্য লইয়া নারিকেলবেড়িয়া আক্রমণ করেন। তিতুমীরের মুক্তি বাহিনী এই সৈন্যদলকেও পরাজিত ও বিতাড়িত করে এই বিপর্যয়ের পর সরকার আলেকজান্ডার ও মেজর স্কটের অধীনে পদাতিক, অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। ১৮৩১ সালের ১৯ শে নভেম্বর নারিকেলবেড়িয়ায় এক তুমুল যুদ্ধ হয়। তিতুমীরের অনুচর বাহিনী পরাজিত হয়। ইংরাজ সৈন্যগণ তাহাদের মৃতদেহ পুড়াইয়া দেয়। তিতুমীর ও তাঁহার অনুচরদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা হয় এবং সম্পত্তি বাযয়াফত করা হয়। গোলাম মাসুমের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং ১১ জনের যাবজ্জীবন ও ১২৮ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।[২২]

সমসাময়িক সরকারী তথ্য হইতে প্রকাশ পায় যে, তিতুমীরের আন্দোলন স্থানীয় সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বারাসত ও নদীয়া অঞ্চলের কৃষক ও তাঁতীগণ এই

www.bjilibrary.com

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার সহিত রাজনৈতিক বিষয় জড়িত ছিল না। কিছুকাল পর ধারণা করা হয় যে, বৃটিশ শাসন ধ্বংস করিয়া মুসলমান শাসন পুনরুদ্ধার করা তিতুমীরের উদ্দেশ্য ছিল। হান্টারও মনে করেন যে, তিতুমীরের আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল।[২৩] প্রথমে তিতুমীরের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন সংস্কার তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই সংস্কার আন্দোলনের ফলে মুসলমান কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হয়। ইহাতে জমিদারগণ ভয় পাইয়া যান এবং তিতুমীরের অনুচরদিগকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করেন। ইহার ফলে সংস্কার আন্দোলন প্রজা আন্দোলনে পরিণত হয়। তিতুমীরের অধীনে প্রজাগণ জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সংগ্রামে তাহারা সফলতা লাভ করে এবং স্থানীয় জমিদারদের এলাকার বহু গ্রাম তাহাদের অধিকারে আসে। এই সাফল্যের ফলে তাহাদের সাহস ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। তিতুমীর তাঁহার অধিকৃত এলাকায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিতুমীরের প্রজা-আন্দোলন একটি গণবিপ্লব ছিল। কৃষক ও তাঁতীগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়া জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। অত্যাচার, অবিচার ও অপমানের বিরুদ্ধে শাক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া প্রজাগণ আত্মসম্মান ও ন্যায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা

হজ করিতে মক্কায় যাইবার পথে সৈয়দ আহমদ শহীদ যখন কলিকাতায় আসেন তখন বহু মুসলমান তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। দীক্ষা-প্রার্থীদের সংখ্যা এত বেশি হয় যে, সাত আটটি পাগড়ি প্রসারিত করা হয় এবং তাহাদিগকে ইহাদের যে কোন প্রান্ত ধরিতে বলা হয়। এইভাবে দলে দলে মুসলমান কলিকাতায় তাঁহার শিষ্যভুক্ত হয়।[২৪] তিতুমীর হজ করিতে গিয়া মক্কায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদের জিহাদ অভিযানের সময় বাংলাদেশ জিহাদ-আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। জিহাদ প্রচারকগণ বিভিন্ন জিলায় জিহাদের বাণী প্রচার করেন এবং মুজাহিদ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাটনা কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। মৌলবী বেলায়েত আলী সৈয়দ আহমদের খলীফা ও পাটনা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি মুজাহিদ ও অর্থ জিহাদের জন্য সীমান্তে প্রেরণ করেন।[২৫]

বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদ হইবার হইবার পর তাঁহার শিষ্যগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং জিহাদ আন্দোলন সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার খলীফা মৌলবী এনায়েত আলী ও তাঁহার ভ্রাতা মৌলবী বেলায়েত আলী জিহাদ আন্দোলন পুনর্জীবিত করেন। বাংলাদেশ ও বিহার হইতে অর্থ ও মুজাহিদ সংগৃহীত হইয়া পাটনা কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং পাটনা হইতে তাহা সীমান্তের সিত্তানা সামরিক কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। মৌলবী এনায়েত আলী মুজাহিদ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে মৌলবী বেলায়েত আলীও সীমান্তের মুজাহিদদের সহিত মিলিত হন

www.bjilibrary.com

এবং তিনি আমীরের পদে নির্বাচিত হন। পাঠানদের কয়েকটি উপজাতির সহযোগিতায় মুজাহিদগণ কয়েক বৎসর শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু তাঁহারা সুবিধা করিতে পারে নাই।

১৮৪৯ সালে ইংরাজগণ শিখদের নিকট হইতে পাঞ্জাব অধিকার করে। ইহার পর সীমান্তের জিহাদ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। প্রথমে বৃটিশ সৈন্যদের সহিত মুজাহিদদের সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি খন্ড যুদ্ধ হয়। ইহাতে জয় পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। ১৮৫২ সালে মৌলবী বেলায়েত আলীর মৃত্যু হয়।[২৬] মৌলবী এনায়েত আলী মুজাহিদদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সিত্তানা সামরিক কেন্দ্র হইতে মুজাহিদ বাহিনী কয়েকবার বৃটিশ সৈন্যদের উপর হামলা করে, কিন্তু সুশিক্ষিত বৃটিশ বাহিনী তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় সরকার আশংকা করে যে, জিহাদ-আন্দোলনের নেতাগণ বিদ্রোহীদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন। এইজন্য পাটনা কেন্দ্রের নেতাদিগকে গ্রেফতার করা হয়। এই সময় সীমান্তের জিহাদীদের পক্ষে বাংলা-বিহারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মুজাহিদ ও অর্থের অভাবে মৌলবী এনায়েত আলী জিহাদ অভিযান বন্ধ করিতে বাধ্য হন। তিনি সিত্তানা হইতে সোয়াত যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৫৭)।[২৭]

১৮৫৮ সালে আবার জিহাদ অভিযান আরম্ভ হয়। স্যার হেনরী কটনের অধীনে বৃটিশ সৈন্যগণ মুজাহিদদিগকে সিত্তানা হইতে বিতাড়িত করে। মুজাহিদগণ মূলকায় নূতন সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করে। মৌলবী বেলায়েত আলীর পুত্র মৌলবী আবদুল্লাহ তাহাদের নেতা নিবাচিত হন। ১৮৬২ সালে আবদুল্লার নেতৃত্বে তাহারা সিত্তানা পুন-রুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। মুজাহিদগণ উৎসাহিত হইয়া টোপিতে বৃটিশ সামরিক ছাউনির উপর আক্রমণ করে এবং ইহা দখল করে। মুজাহিদদের সাফল্যের ফলে সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ দেখা দেয়। ব্রিগেডিয়ার নেভিল চেম্বারলেনের অধীনে এক বিরাট বাহিনী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। আম্বালা গিরি পথে বৃটিশ সৈন্যদের সহিত মুজাহিদদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনেক সৈন্য হতাহত হয়। জেনারেল গরভক নূতন সৈন্যদল লইয়া মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কূটনীতি ও অর্থের সাহায্যে তিনি কয়েক জন পাঠান সরদারকে মুজাহিদদের পক্ষ ত্যাগ করাইতে সফল হন। ইহাতে মুজাহিদ বাহিনী দুর্বল হাইয়া পড়ে। ইহার পর জেনারেল গরভক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন এবং তাহাদের মূলকা সামরিক কেন্দ্র আক্রমণ করেন। ১৮৬৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এক যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী মুজাহিদদিগকে পরাজিত করে এবং তাহাদের মূলকা সামরিক কেন্দ্র ধ্বংস করিয়া দেয়।[২৮] ইহার পরেও মুজাহিদগণ ১৮৯০ খ্রীস্টব্দ পর্যন্ত বৃটিশ শাসকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে।[২৯]

পাঞ্জাব ও সীমান্তের মুসলমানদিগকে মুক্ত করিতে জিহাদ অভিযান ব্যর্থ হয়। নানারকমের অসুবিধা ও বাধাবিপত্তির জন্য ইহা সফল হয় নাই। ইহা ব্যর্থ হইলেও

www.bjilibrary.com

ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে ইহার কিছুটা গুরুত্ব আছে। সীমান্তের জিহাদে অল্প সংখ্যক মুসলমান অংশগ্রহণ করে, কিন্তু ইহার পিছনে মুসলমান জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। তাহারা অর্থ ও মুজাহিদ দিয়া এই আন্দোলনকে সাহায্য করে। এমনকি রমণীগণ ইহার জন্য নিজেদের অলংকার পর্যন্ত দান করে।৩০ এই দিক দিয়া বিচার করিলে জিহাদ আন্দোলনকে মুসলমানদের একটি গণ-আন্দোলন বলা যাইতে পারে। ইহার প্রচারক ও নেতাগণ মুজাহিদ ও অর্থ সংগ্রহের কাজে মুসলমান জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। পাটনায় মৌলবী এনায়েত আলীর খানকাহ্ জেহাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল।৩১ এখানে জিহাদের জন্য সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রচারক, বার্তাবাহক ও মুজাহিদরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত।

১৮৬৪ সালে আম্বালায়, ১৮৬৮ সালে পাটনায়, ১৮৭০ সালে মালদহে ও রাজমহলে এবং ১৮৭১ সালে কলিকাতায় জিহাদ-আন্দোলনের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয়। এই সকল মামলার তথ্য হইতে প্রকাশ পায় যে, জিহাদ-আন্দোলনে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই প্রসঙ্গে হান্টার লিখিয়াছেন, "বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আবার অসাধারণ অবস্থা দেখা দিয়াছে। বহু বৎসর একটি বিদ্রোহী উপনিবেশ আমাদের সীমান্তে বিপদের সৃষ্টি করিয়াছে: সেখান হইতে ইহারা অভিযান করিয়া আমাদের সামরিক ছাউনি আক্রমণ করিয়াছে আমাদের গ্রাম পুড়াইয়া দিয়াছে, আমাদের প্রজাদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং আমাদের সৈন্যদলকে তিনটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে নামিতে বাধ্য করিয়াছে। মাসের পর মাস বাংলাদেশ হইতে নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগৃহীত হইয়া সীমান্তের এই শত্রু-উপনিবেশে প্রেরিত হইয়াছে। রাজদ্রোহের মামলার শুনানী হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের অধীনস্থ প্রদেশগুলিতে ষড়যন্ত্রর জাল বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পাঞ্জাব-সীমান্ত অঞ্চলের রাজদ্রোহী-কেন্দ্রগুলির সহিত গঙ্গা-বিধৌত উষ্ণ জলাভূমি এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এই রাজদ্রোহ কেন্দ্রগুলির তথ্য হইতে জানা যায় যে, বাংলাদেশ হইতে অর্থ ও লোক সংগৃহীত হইয়া নিয়মিতভাবে দুই হাজার মাইল দূরবর্তী উপনিবেশে প্রেরিত হইত।"৩২

১৮৫২ সালে হাজারার ডেপুটি কমিশনারকে লিখিত একটি বেনামী চিঠি হইতে সরকার ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারে। ইহাতে বলা হয় যে, বাংলাদেশের জওহর আলী করিমুদ্দীন ও কাসিম আলী বন্দুক ও তরবারী খরিদ করিয়া সীমান্তে পাঠাইয়াছে। দিল্লী বেরেলী ও আরও কয়েকটি শহরের সন্দেহজনক মহল্লায় খানাতল্লাশী করিয়া জিহাদ আন্দোলনে পাটনা কেন্দ্রের কার্যকলাপ এবং বাংলাদেশ ও বিহার হইতে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহের বিষয় প্রকাশ পায়।৩৩ কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়।৩৪ আম্বালা রাজদ্রোহের মামলায় জিহাদ-আন্দোলনের সহিত বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা প্রকাশ পায়। ১৮৬৭ সালে বাংলার ছোট লাট জানিতে পারেন যে, প্রদেশের কোন কোন জিলায় জিহাদের

www.bjilibrary.com

বাণী প্রচলিত হইতেছে। মালদহ ও রাজমহলে পুলিশী তদন্তের ফলে জানা যায় যে, জিহাদ-আন্দোলনের নেতাগণ প্রতি জিলায় প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।[৩৫] প্রচারকার্যের জন্য পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছে। তিনটি পুস্তিকা ঢাকায় প্রকাশিত হয়: (১) তুসের মুরাদিয়া (তফসীর আল মুরাদিয়া), ইহাতে উর্দু ভাষায় আমপারার ব্যাখ্যা করা হয়; (২) জিহাদের ফতুয়া, ইহা হাজী বদরুদ্দীন কর্তৃক বাংলাভাষায় রচিত হয়; (৩) তত্ত্ব, ইহাতে বাংলা পদ্যে ধর্ম ও জিহাদের বিষয় নিয়া আলোচনা করা হয়। পুস্তিকাগুলির রচয়িতাগণ প্রচার করিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারত মুসলমানদের জন্য দার উল হরব এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানদের আবশ্য কর্তব্য।[৩৬]

পাটনা, রাজমহল ও মালদহের রাজদ্রোহ মামলাগুলি হইতে বাংলদেশের জিলাগুলিতে জিহাদ-আন্দোলনের সংগঠন-ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। জিহাদের উদ্দেশ্য স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশকে কয়েকটি অঞ্চল ভাগ করা হয়েছিল। হান্টার লিখিয়াছেন যে, মালদহের ইসলামপুরের অধিবাসী মৌলবী ইব্রাহিম মন্ডল একটি অঞ্চলের নেতা ছিলেন এবং স্থানীয় নেতাগণ ও প্রচারকগণ তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন। হান্টার ইহার সংগঠন ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি মহাল হইত এবং মহালে একজন কর আদায়কারী নিযুক্ত হইত। বড় গ্রামগুলিতে কয়েকজন সর্দার নিয়োগ করা হইত: (১) দীন কী সর্দার ইমামতি ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করিতেন; (২) দুনিয়া কি সর্দার, মুজাহিদ সংগ্রহ করিতেন ও লোকের বৈষয়িক অবস্থা তদারক করিতেন; (৩) ডাক কী সর্দার, চিঠি পত্র ও দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেন।[৩৭] লোকদের নিকট হইতে জাকাত, ফিত্‌রাহ ও ইলাহী নামক খয়রাত সংগ্রহ করা হইত। মুষ্টি প্রথায় প্রত্যেক মুসলমান পরিবার হইতে চাউল সংগ্রেহ করা হইত এবং ইহার অর্থ জিহাদের জন্য দেওয়া হইত। বগুড়ার মুসলমানগণ একবার জিহাদের জন্য ৩০০০, টাকা পাঠাইয়াছিল।[৩৮]

বাংলদেশে জিহাদ আন্দোলনের প্রচারকদের মধ্যে মৌলবী আমীর উদ্দীন, নাযির সর্দার, সর্দার মৌলবী ইব্রাহীম মন্ডল, হাজী বদরুদ্দীন (ঢাকা) ও মৌলবী আজিম উদ্দীনের (ঢাকা) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সাধারণ মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং জিহাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ করেন। বহু বাঙ্গালী মুজাহিদ সীমান্তের জিহাদে অংশগ্রহণ করে। মৌলবী বেলায়েত আলীর পুত্র মৌলবী আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে সিত্তানা সামরিক কেন্দ্রে ৯০০ বাঙ্গালী মুজাহিদ ছিল।[৩৯] হান্টার লিখিয়াছেন যে, মৌলবী আমীরুদ্দীন এক সময় বাংলাদেশ হইতে ৪৩০ জন মুজাহিদ সীমান্তের জিহাদে পাঠাইয়াছিলেন।[৪০] মামলার শুনানী হইতে জানা যায় যে, বহু বাঙ্গালী মুজাহিদ সীমান্তের জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবং অতি সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানও পাঞ্জাবী মুসলমানদের মুক্তির জন্য তাহাদের স্বল্প আয়ের কিয়দংশ দান করিয়াছিল। এক সময় মালদহের একটি গ্রাম হইতে জিহাদের জন্য ৭৩০ টাকা মৌলবী ইব্রাহিম মন্ডলের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।[৪১]

www.bjilibrary.com

জিহাদ প্রচারকগণ সিপাহীদিগকে প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। মৌলবী আবদুল্লাহ্ নামে একজন প্রচারক বহরমপুর সৈন্যাবাসে প্রচারকার্য চালাইবার সময় ধরা পড়েন।[৪২] বাঙ্গালী প্রচারকগণ শুধু বাংলাদেশেই তাঁহাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তাঁহারা উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যেও জিহাদের প্রচারকার্য চালাইছিলেন। ১৮৬৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর একটি পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে, বাংলাদেশের মৌলবী নাযির হোসেন ও উমেদ আলী ও দিল্লী ও উত্তর ভারতে জিহাদ আন্দোলনের সংগঠন কার্যে লিপ্ত ছিলেন। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয় "বাংলাদেশের এই অঞ্চলে অধিকাংশ প্রভাবশালী মৌলবীগণ বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছে। মনে হয় ওহাবী গণ ষড়যন্ত্রের কার্যের জন্য বাঙ্গালী এজেন্টদিগকে খুব উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে এবং তাহারা হিন্দুস্থানীদিগকে টাকা, চিঠি ইত্যাদি আদান-প্রদানের কাজে লাগাইয়াছে।"[৪৩] নাযির হোসেন দিল্লী কেন্দ্রের একজন সুদক্ষ এজেন্ট ছিলেন। বাংলাদেশ হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ দিল্লীতে তাহার আশ্রয়ে থাকিত এবং তিনি তাহাদিগকে সীমান্তের সামরিক কেন্দ্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন।[৪৪] ঢাকা জিলার বিরয়ার জমিদার আবদুল্লাহ্ খাঁর পুত্র মৌলবী আহমদউল্লাহ্ ভূপালে জিহাদের প্রচারকার্য করেন এবং মাদ্রাজের সেনানিবাসগুলির সিপাহীদিগকে প্রভাবান্বিত করিতে প্রয়াস পান। তিনি মোগল বংশের শাহজাদা ফিরুয শাহের একজন সহচর ছিলেন।[৪৫] রাজমহলের এক পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, মৌলবী আমীনউদ্দীন ও উমেদ আলী নামক দুইজন বাঙ্গালী দিল্লী অঞ্চলে জিহাদ-আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৪৬] ১৮৬৯ সালের এপ্রিল মাসে উমেদ আলীকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহার জবানবন্দিতে প্রকাশ পায় যে, শাহজাদা ফিরয শাহ্ তাঁহাকে স্বীয় দূতরূপে দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিকট পাঠান এবং তাঁহাদিগকে জিহাদ-আন্দোলনে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।[৪৭]

১৮৬৮ সালের অক্টোবরে নাযির সর্দার, গোরান খান, আবদুল ওহাব, জুমান শেখ, শোকুম মোল্লা, ডুঙ্গো গাযী, নওয়াজিশ মোল্লা এবং আরও কয়েকজনকে মালদহে গ্রেফতার করা হয়।[৪৮] ইব্রাহিম মন্ডল, মুবারক আলী, তুবারক আলী, আমীনউদ্দীন হাজী, দীন মুহম্মদ ও অন্যান্যকে রাজমহল, পাটনা প্রভৃতি স্থানে গ্রেফতার করা হয়। আরও অনেককে বিভিন্ন জেলে আটক করা হয়।[৪৯] কলিকাতা কলটোলার চামড়ার ব্যবসায়ী ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ আমীর খাঁকে ১০ই জুলাই (১৮৬৮) হইতে বহুদিন জেল হাজতের দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। ১৮৭১ সালে পাটনায় রাজদ্রোহের বিচারে আমীর আলী খাঁর দ্বীপান্তর দণ্ড হয় এবং তাঁহার সম্পত্তি বাযয়াফত করা হয়। ১৮৭৭ সালে তিনি বড়লাটের ক্ষমা লাভ করেন এবং খালাস পান। কিছুদিন পর আমীর খান মারা যান। রাজদ্রোহের বিচারে বহু লোককে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয় এবং তাহাদের সম্পত্তি বাযয়াফত করা হয়। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে দুর্দশা ভোগ করিতে হয়।[৫০]

বিভিন্ন সূত্র হইতে পুলিশ বিভাগ বাংলাদেশে জিহাদ আন্দোলনের কার্যকলাপ আবিষ্কার করে। মৌলবী আব্বাস আলী প্রথমে জিহাদে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য শুরু

www.bjilibrary.com

করেন। তাঁহার প্রচারকার্য হইতে সরকার জিহাদ আন্দোলনের অস্তিত্বের আভাস পায়।[৫১] সরকার এই সম্পর্কে গুপ্তচর নিয়োগ করে এবং পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তাহাদের সাহায্যে জিহাদ প্রচারকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে।[৫২] এইভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া পুলিশ বিভাগ বাংলাদেশ ও বিহারে জিহাদীদের গোপন কার্যকলাপ আবিষ্কার করে।

www.bjilibrary.com

নবম অধ্যায়
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। স্যার জেমস আউটরাম মনে করেন যে, এই বিদ্রোহের মূলে ছিল মুসলমানগণ। মুসলমানগণ বৃটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তাহারা হিন্দুদিগকে দলে টানিয়া লয়। বিদ্রোহের সময় এই মত প্রাধান্য লাভ করে। পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক স্যার জন লরেন্সের মত গ্রহণ করেন। লরেন্সের মতে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ মূলতঃ কোম্পানীর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল এবং ইহাদের বিদ্রোহের সুযোগে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পায়।[১]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে সিপাহীদের বিদ্রোহ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। যাহারা ইহাকে সিপাহীদের বিদ্রোহ বলিয়া রায় দিয়াছেন তাঁহারা ইহার শুধু একটা দিক বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সিপাহীদের বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ও ইহার ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই বিদ্রোহে বেসামরিক লোকদেরও যে একটা ভূমিকা ছিল তাহা তাঁহারা গণ্য করেন নাই। সমসাময়িক তথ্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহের সূত্রপাত হইবার কমপক্ষে এক বৎসর পূর্ব হইতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল এবং বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছিল। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী হইতে সিপাহীগণ বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহা হইতে মনে হয়, তাহাদের বিদ্রোহের পিছনে কোন প্রতিপত্তিশালী লোকের উৎসাহ ও সমর্থন ছিল; অন্যথায় তাহারা শক্তিশালী বৃটিশশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের চাকুরী ও জীবন বিপন্ন করিতে সাহসী হইত না। এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু আয়োজন ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিক্ষুব্ধ সিপাহীগণ বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। ইহাতে পরিকল্পনা মত বিদ্রোহ আরম্ভ হইতে পারে নাই।

দুইজন ইংরাজ সামরিক কর্মচারী বিদ্রোহের সময় সৈন্যদলে ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বেনামীতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহারা অযোধ্যায় সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলীকে বিদ্রোহের জন্য দায়ী করেন। তাঁহারা বলেন যে, রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলী ১৮৫৬ সালের এপ্রিলে কলকাতায় নির্বাসিত হন এবং তখন হইতে তিনি বৃটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও সিপাহীদের সহযোগিতা লাভের জন্য তিনি গুপ্ত এজেন্ট নিয়োগ করেন। সিপাহীদের দুই তৃতীয়াংশ অযোধ্যার নবাবের অনুরক্ত ছিল। অযোধ্যাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করায় ইহাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন চাকুরী হারাইয়াছিল।[২] মেলেসন লিখিয়াছেন যে, অযোধ্যার নবাবের সভাসদ ও অনুচরগণ যে বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৩] বিদ্রোহের প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতে চাপাতি-রুটি বিতরণের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। চাপাতি-রুটি এক গ্রামের মন্ডলের নিকট অন্য গ্রামের মন্ডলের নিকট প্রেরিত হইতেছিল। এক সিপাহী দলের নিকট অন্য সিপাহী দলের মধ্যে জবা ফুল বিতরিত হইতেছিল।[৪] হল্‌মস লিখিয়াছেন যে, ইংরাজগণ চাপাতি-রুটি বিতরণের বিষয় অবগত ছিল। কিন্তু তাহাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই।[৫] পার্সিভেল স্পিয়ার মন্তব্য করেন যে, চাপাতি বিতরণের তথ্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কেবল মাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল না।[৬]

মেলেসন বলেন যে, মৌলবী আহমদউল্লাহ্ চাপাতি বিতরণ পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন এবং ইহার মধ্য দিয়া উত্তর ভারতের জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে সংকেত দেন। চাপাতি বিতরণ করিয়া তাহারা বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিত। অযোধ্যা সাম্রাজ্যভুক্ত করার অব্যবহিত পরে মৌলবী আহমদউল্লাহ কোন এক গোপনীয় কার্যে আগ্রা, দিল্লী, মীরাট পাটনা, ও কলিকাতা ভ্রমণ করেন। ১৮৫৭ সালের এপ্রিলে অযোধ্যায় কয়েকটি রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারপত্র বিলি করার অপরাধে তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হইবার পূর্বে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়। ইহার ফলে তিনি জেল হইতে মুক্তি পান এবং সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৭] মৌলবী আহমদউল্লাহ্ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গোপনে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য চালান। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারীতে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'দেশবাসীগণ আপনার জাগিয়া উঠুন; ফিরিঙ্গি কাফেরদিগকে বিতারিত করিতে আপনারা সংঘবদ্ধ হউন; তাহারা ন্যায়কে পদদলিত করিয়াছে এবং আমাদের স্বরাজ লুণ্ঠন করিয়াছে। এই কাফেরদের অত্যাচার হইতে মুক্তির জন্য আমাদিগকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করিতে হইবে। ইহা হইবে আমাদের স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য জিহাদ।"[৮]

নানা সাহেব ও তাঁহার সহচর আজিমউল্লাহ্ ১৮৫৭ সালে লক্ষ্ণৌ ভ্রমণে আসেন। এইরূপ মনে করা হয় যে, সেই সময় তিনি অয্যেধ্যার বিক্ষুব্ধ নেতাদের সহিত বিদ্রোহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন।[৯] নানা সাহেব এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে উত্তেজিত করেন। বেরেলীর খান বাহাদুর খান তাঁহার প্রচারপত্রে বিদেশী শাসন ধ্বংসের জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করেন।[১০] সম্রাট বাহাদুর শাহ ও অন্যান্য নেতাগণ তাঁহাদের ঘোষণা পত্রে বিদেশীদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন।[১১]

সিপাহীগণ প্রথমে বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহে বেসামরিক লোকগণ যোগদান করে। বিদ্রোহীদের নেতাদের মধ্যে সামরিক এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বিদ্রোহের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। বিদ্রোহ সম্বন্ধে চার্লস বল মন্তব্য করেন যে, আন্দোলন ঘটনাচক্রে গণবিদ্রোহে পরিণত হয়। জে, কেয়ি লিখিয়াছেন যে, আন্দোলন ক্রমশ জাতীয় আন্দোলনের আকার ধারণ করে এবং বিশেষত অযোধ্যা, রোহিলখন্ড, বুন্দেলখন্ড ও সওগড় প্রদেশের অধিকাংশ জনসাধারণ

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহে যোগ দেয়। লণ্ডন টাইমস ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা ইহা ভারতীয় প্রজাদের বিদ্রোহ বলিয়া উল্লেখ করে।[১২] ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের জন্য বৃটিশ সরকার মুসলমানদিগকে দায়ী করে এবং তাহাদের প্রতি দমননীতি অনুসরণ করে। মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ খান 'রিসালায়ে বাগায়াতে হিন্দু' পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি প্রকাশ করেন যে, বৃটিশের শাসন নীতির দরুন ভারতাবাসীর মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

বিদ্রোহের কারণ : হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বহুদিন হইতে গোপন বিক্ষোভ ছিল তাহা হইতে বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়। রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণে এই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রাজ্য ও ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানগণ তাহাদের বিরাট ক্ষতির কথা ভুলিতে পারে নাই। বৃটিশ শাসকগণও মুসলমানদিগকে অবিশ্বাস করিয়াছে। হান্টার লিখিয়াছেন, আমরা অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদিগকে সৈন্যদলে গ্রহণ করি নাই, কারণ আমরা মনে করিয়াছি যে, তাহাদিগকে সৈন্যদলে ঢুকিতে দিলে আমাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে।"[১৩] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাযয়াফতি প্রভৃতির ফলে মুসলমানদের আর্থিক সঙ্গতি নষ্ট হয় এবং তাহারা ক্ষুব্ধ হয়।[১৪] লর্ড ডালহৌসী প্রস্তাব করেন যে, সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল বংশের সম্রাট উপাধি রহিত করা হইবে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীকে লাল কেল্লার রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া মেহরালিতে বাস করিতে হইবে। মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু তিনি মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের ঐতিহ্যের বাহক ও ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ ছিলেন। ডালহৌসীর অমর্যাদাজনক প্রস্তাবে মুসলমানগণ রুষ্ট হয়। ইহার পর মুসলমানদের অন্যতম প্রধান রাজ্য অযোধ্যা সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় মুসলমানদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এইজন্য ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ আযোধ্যায় গণ-বিদ্রোহের আকার ধারণ করে।

স্বত্বলোপ-নীতির মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে বৃটিশ সরকার অনেক দেশীয় রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করে। সাতারা, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করায় ইহাদের হিন্দু শাসক, কর্মচারী ও প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ডালহৌসী ভূতপূর্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহাকে পুণাস্থ পৈতৃক রাজপ্রাসাদ হইতে কানপুরের নিকট বিঠুরে নির্বাসিত করেন। নানা সাহেবকে হিন্দুগণ তাহাদের জাতীয় নেতা পেশোয়ার উত্তরাধিকারীরূপে সম্মান করিত। তাঁহার অমর্যাদা করায় হিন্দুসম্প্রদায় বৃটিশ শাসকদের প্রতি রুষ্ট হয়। বৃটিশ শাসকদের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিতে দেশীয় রাজাগণ ভীত হইয়া পড়েন। চার্লস নেপিয়ার বলিয়াছেন যে, যদি তিনি বার বৎসরের জন্য ভারতের সম্রাট হইতেন তাহা হইলে দেশীয় রাজাদের অস্তিত্ব থাকিত না এবং নিযামের নাম আর শুনা যাইত না ও নেপাল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িত।[১৫]

বৃটিশ শাসকদের জাতীয় অহংকার ভারতবাসীর মনে আঘাত দেয়। ইংরাজ কর্মচারীগণ নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করিত। তাহারা শাসক ও শাসিতের-

www.bjilibrary.com

মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া চলিত এবং ভারতীয়দিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখিত ও 'নেটিভ' বলিয়া আখ্যায়িত করিত। হিন্দু ও মুসলমানদের কৃষ্টির প্রতি তাহাদের অবজ্ঞার ভাব ছিল। মেকলে মন্তব্য করিয়াছেন যে, একখানা ইংরাজী বই প্রাচ্য ভাষায় লিখিত সমস্ত জ্ঞানের বইয়ের সংগ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠ।[১৬] এদেশের ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ভারতীয়দের মনে সংশয়ের উদয় হয়, কারণ ইহার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচারিত হয়। মেকলে তাঁহার মাতার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমরা আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া চলি তাহা হইলে ত্রিশ বৎসর পরে বাংলাদেশের একজনও পৌত্তলিক থাকিবে না।"[১৭] খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপে ভারতীয়গণ অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা কোম্পানীর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মপ্রচার করিত। তাহাদের অনেকে সিপাহীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য সৈন্যদলে যোগ দিয়া ছিল। নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা সিপাহীদের ধর্মের নিন্দা করিত।[১৮] ইহার ফলে এই দেশবাসী বৃটিশ শাসকদের সকলরকম ব্যবস্থাই সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে। হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য উইলিয়াম বেন্টিংক সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ ইত্যাদি কুপ্রথা উঠাইয়া দেন এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। হিন্দু জনসাধারণ মনে করে যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিতেছে।[১৯] রেল, তার ইত্যাদি প্রচলনের ফলেও শাসকদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচলনও সমাজ সংস্কার লোকের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য করা হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশী ও ভিন্নধর্মীয় শাসকগণ এইগুলি ভারতীয়দের উপর চাপাইয়া দিয়াছিল। সরকার আইন প্রণয়ন ব্যাপারে এদেশবাসীর সহযোগিতা অর্জন করিতে চেষ্টা করে নাই। এইজন্য তাহাদের ব্যবস্থাগুলি কল্যাণপ্রসূ হয় নাই, বরং লোকের মনে আঘাত দিয়োছে।[২০]

বৃটিশ সৈন্যদলের ভারতীয় সিপাহীদের নানা রকমের অভাব-অভিযোগ ছিল। তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান প্রভৃতি দূরদেশে যুদ্ধের জন্য যাইতে হইত। জাতি ও ধর্ম নষ্ট হওয়ার আশংকায় ব্রাহ্মণ সিপাহীগণ সমুদ্র পাড়ি দিতে ও ভারতের বাহিরে গিয়া চাকুরী করিতে অনিচ্ছুক ছিল। ১৮৫৬ সালে বৃটিশ সরকার এইরূপ আইন করে যে, সিপাহীদিগকে যেখানে যাইতে আদেশ করা হইবে তাহাদিগকে সেখানে যাইতে হইবে। ইহার ফলে সিপাহীদের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই সময় সৈন্যবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতার অভাব ছিল। দূরবর্তী অভিযানের জন্য তাহারা অতিরিক্ত ভাতা দাবী করিত। কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার পর সরকার তাহাদের দাবী মানিয়া লইত। নিজেদের যুদ্ধ-কুশলতা সম্বন্ধে সিপাহীদের উচ্চ ধারণা ছিল। তাহারা মনে করিত যে, তাহাদের বাহুবলের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সৈন্যবাহিনীতে ইংরাজ সৈন্যদের সংখ্যা খুব কম ছিল। তাহাদের অনেকে চীন ও পারস্যে প্রেরিত হইয়াছিল। ফলে ইংরাজ সৈন্য ও সিপাহীদের সংখ্যানুপাত ১:৩ হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া বিক্ষুব্ধ সিপহীগণ বিদ্রোহী হইতে উৎসাহিত হইয়াছিল।

www.bjilibrary.com

এই সমস্ত কারণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বিক্ষোভ ও বৃটিশ বিরোধী মনোভাব চলিতেছিল। রাজ্যচ্যুত রাজা ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই ব্যাপক বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করিয়া গোপনে বিদ্রোহের জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত হন। সিপাহীদের সহিযোগিতা পাইবার জন্য তাহারা এজেন্ট নিয়োগ করেন। এই এজেন্টগণ গোপনে সিপাহীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইত। সিপাহীদের মনে যে পুঞ্জিভূত অসন্তোষ ছিল তাহা কার্তুজের ঘটনায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত প্রকাশ পায়। ইহাতে বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিদ্রোহ শুরু হইয়া যায়। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে এনফিলড নামে এক প্রকার বন্দুক সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য প্রচলিত হয়। ইহার কার্তুজ তৈলাক্ত ছিল এবং বন্দুকে পুরিবার সময় ইহার এক প্রান্ত দাঁতে কাটিতে হইত। জনরব উঠে যে, গরু ও শুকরের চর্বি দ্বারা এই কাতুর্জ তৈলাক্ত করা হইয়াছে।[২১] সিপাহীগণ সন্দেহ করে যে, তাহাদের ধর্মনাশের উদ্দেশ্যে সরকার এই বন্দুক প্রচলন করিয়াছে। তাহাদের বিক্ষোভ চরমে পৌছে। জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত কলিকাতা, বহরমপুর ও বারাকপুর সৈন্যাবাসে সিপাহীগণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

বিদ্রোহের ঘটনাবলী : ১৮৫৭ সালের ৯ই মে মীরাটের একদল সিপাহী ইনফিলডের কার্তুজ ব্যবহার করিতে অস্বীকার করে এবং সামরিক বিচারে তাহাদিগকে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। ১০ই মে মীরাট সৈন্যাবাসের তিনটি রেজিমেন্টের সিপাহীগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা তাহাদের সঙ্গীদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করে এবং বৃটিশ সামরিক কর্মচারীদিগকে হত্যা করে। ইহার পর তাহারা দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হয়। দিল্লীর সিপাহীগণ তাহাদের সহিত যোগ দেয় এবং তাহারা দিল্লী অধিকার করে। ১১ ই মে বিদ্রোহী সিপাহীগণ বিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। সম্রাটের একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং দসতুর-উল-আমল নামে অভিহিত শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হয়। সম্রাটের পুত্র মির্যা মোগলকে প্রধান সেনাপতি এবং শাহজাদা মির্যা মেনধু, শাহজাদা মির্যা, আবুবকর ও শাহজাদা মির্যা খিযর সুলতানকে সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। অযোধ্য রোহিলখন্ড ও বিজনরের মুসলমান প্রধানগণ সম্রাটকে নযর প্রেরণ করেন। বেরেলী সৈন্যাবাস হইতে ১৪০০০ সিপাহী লইয়া বখত খান দিল্লীতে আসেন। সম্রাট তাঁহাকে সিপাহীদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন।[২২]

সম্রাটের অর্থ ও রসদ ছিল না। সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগত জওহরাদি নীলামে বিক্রী করিতে হয়। সম্রাটের কয়েকজন পরামর্শদাতা বৃটিশ পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করে। তাহারা মির্যা মোগল ও বখত খাঁর মধ্যে মনোমালিন্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও বখত খান চার মাস ইংরাজ ও শিখদের মিলিত বাহিনীর আক্রমণ হইতে দিল্লী রক্ষা করেন। অবশেষে ২০শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরে প্রবেশ করে। সম্রাট ভীত হইয়া দুর্গ প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং হুমায়ুনের সমাধি সৌধে আশ্রয় লন। বখত খান সম্রাটকে

www.bjilibrary.com

দোয়াব অঞ্চল যাইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু চক্রান্তকারীদের পরামর্শে সম্রাট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বখত খান অযোধ্যায় চলিয়া যান। সে সময় অযোধ্যার অবস্থা নৈরাশ্যজনক ছিল। তিনি নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। হডসনের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্য সম্রাটকে হুমায়ুনের সমাধি হইতে বন্দী করে ও দুর্গে লইয়া আসে। হডসন সম্রাটের দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। বাহাদুর শাহকে রাজদ্রোহীতার অপরাধে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬২ সালে রেঙ্গুনে তাঁহার মৃত্যু হয়।[২৩]

অযোধ্যার বিদ্রোহ গণ-বিদ্রোহে পরিণত হয়। মৌলবী আহমদউল্লাহ বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[২৪] ইংরাজগণ লক্ষ্মৌ হইতে বিতাড়িত হয়। ১৫ই জুলাই এক যুদ্ধে স্যার হেনরী লরেন্স ও বহু ইংরাজ নিহত হন। নবাব ওয়াজিদ আলীর অল্প বয়স্ক পুত্র বিরজিস কাদিরকে অযোধ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বিরজিস কাদিরের মাতা হজরত মহল বালক নবাবের অভিভাবিকা নিযুক্ত হন।[২৫] হজরত মহল ও আহমদউল্লাহর নেতৃত্বে সিপাহীগণ বৃটিশ সৈন্যদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদের অভাবে তাহারা অসুবিধায় পড়ে। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে স্যার কলিন ক্যাম্পবেলের অধীনে বৃটিশ সৈন্যগণ লক্ষ্মৌতে প্রবেশ করে। অবস্থা নৈরাশ্যজনক দেখিয়া হজরত মহল বিরজিস কাদিরকে লইয়া বোন্ডিতে চলিয়া যান এবং সেখান হইতে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মৌলবী আহমদউল্লাহ শাহজাহানবাদে আশ্রয় লন এবং সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মুহম্মদী নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কন ও খুতবা পাঠ করেন। তিনি এক যুদ্ধে পরাজিত হন ও পরে ইংরাজদের হাতে ধরা পড়েন। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিক কেয়ি আহমদউল্লার স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "সকল জাতির বীর ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ মৌলবী আহমদউল্লার স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।"[২৬]

নানা সাহেব বিঠুর হইতে কানপুরের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। তিনি আজিমউল্লাহ খান ও তাতিয়া টোপি নামক মারাঠা নেতার সহায়তা লাভ করেন।[২৭] বিদ্রোহীগণ কানপুর শহর দখল করে এবং ইংরাজ সৈন্যদিগকে অবরুদ্ধ করে। পরে ইংরাজ সৈন্যদিগকে কানপুর হইতে এলাহাবাদে যাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু পথে সিপাহীগণ গুলি করিয়া ইহাদের অনেককে হত্যা করে। হেভলকের অধীনে ইংরাজ সৈন্যগণ এলাহাবাদ হইতে কানপুরের দিকে অগ্রসর হয় এবং এক যুদ্ধে নানা সাহেবের সিপাহীদেরকে পরাজিত করে। সিপাহীগণ কানপুরের বিবিগড়ে বন্দী ইংরাজদিগকে হত্যা করে। ১৭ই জুলাই হেভলক কানপুরে প্রবেশ করেন। নানা সাহেব অযোধ্যায় ও তাতিয়া টোপি গোয়ালিয়রে চলিয়া যান। তাতিয়া টোপি হেভলকের নিকট কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সহিত যোগ দেন। তাঁহাদের মিলিত বাহিনী ইংরাজদের নিকট পরাজিত হয়। ইহার পর তাতিয়া টোপি জঙ্গলে আশ্রয় লন। ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি ধরা পরেন। নানা সহেব বেশি দিন অযোধ্যায় থাকিতে

www.bjilibrary.com

পারেন নাই। ইংরাজগণ যখন অযোধ্যা পুনরুদ্ধার করে তখন তাঁহাকে নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় লইতে হয়। ঝাঁসীর বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাই বুন্দেলখন্ডে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেন। তিনি ২০,০০০ সৈন্যের একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে এক যুদ্ধে তিনি আহত হইয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরাজগণ সহজেই বুন্দেলখন্ডের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হয়।

রোহিলখন্ডে হাফিজ রহমতের পৌত্র খান বাহাদুর খান বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তাঁহার নেতৃত্বে সিপাহীগণ বেরেলি, বাদাউন, শাহজাহানপুরও অন্যান্য স্থান হইতে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করে। রোহিলখন্ড হইতে ইংরাজ শাসনের অস্তিত্ব লোপ পায়। লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধারের পর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ রোহিলখন্ডে বহু সৈন্য প্রেরণ করে এবং কয়েকমাস যুদ্ধের পর রোহিলখন্ডে বৃটিশ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এলাহাবাদে মৌলবী লিয়াকত আলী নামক জনৈক শিক্ষকের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং বিদ্রোহীগণ শহর অধিকার করে। কিন্তু তাহারা দুর্গ দখল করিতে অসমর্থ হয়। ইহার পর বৃটিশ সৈন্যগণ শহর পুনরুদ্ধার করে।

বাংলায় বিদ্রোহ : ১৮৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতার ছোট লাটের বাসভবন, টাকশাল ও ধনাগার সিপাহীগণ বৃটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করিবার জন্য পরিকল্পনা করে। একজন ইংরাজ সামরিক পুলিশ তাহাদের ষড়যন্ত্রের আভাস পায়। ইহার ফলে সিপাহীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে তদন্তের জন্য কলিকাতায় একটি বিশেষ সামরিক আদালত স্থাপিত হয়। এক সিপাহীর সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে, রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি সিপাহীদিগকে দুর্গ অধিকার করিতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং পাটনার জমিদার মানসিংহও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন।[২৮] অন্য এক সিপাহীর লিখিত পত্র হইতেও ঐরূপ আভাস পাওয়া যায়। পত্রে সিপাহী লিখিয়াছেন, "আমরা অযোধ্যার রাজার সঙ্গে যোগ দিয়াছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহার কোন ফল হয় নাই।"[২৯] বেনামী ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন যে, নবাব ওয়াজিদ আলী সিপাহীদিগকে অধিক বেতনে তাহার চাকুরী গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং যে সকল সিপাহীকে সৈন্যদল হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল তিনি তাহাদিগকে নিজের অধীনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় নবাবের গার্ডেন রীচ প্রাসাদে দুই হইতে তিন হাজার সৈন্য তাহার আদেশের অপেক্ষায় ছিল।[৩০]

৫ই ফেব্রুয়ারী বারাকপুর সেনানিবাসের সিপাহীগণ ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে ও কলিকাতার দুর্গ দখল করিতে ষড়যন্ত্র করে। জেনারেল হিয়ারসে সিপাহীদের আচরণে বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি ঐ দিন সামরিক সেক্রেটারীকে জানান, আমরা বারাকপুরে বিস্ফোরক বস্তুর উপর বাস করিতেছি এবং যে কোন সময় বিস্ফোরণ হইতে পারে।" ২৫শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর সৈন্যাবাসের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১০ই মার্চ ফোর্ট উইলিয়ামের রক্ষী সিপাহীগণ

www.bjilibrary.com

দুর্গ অধিকারের ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু ইহা ব্যর্থ হয়। ২৯শে মার্চ বারাকপুরের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সৈন্যরা ইহা দমন করে। সামরিক আদালতের বিচারে মঙ্গলপান্ডে ও ঈশ্বরপান্ডে নামক সিপাহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[৩১]

উত্তর ভারতে বিদ্রোহের সময় রাজধানী কলিকাতা শহরেও উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ জনরব ছড়াইয়া পড়ে যে, ১৪ই জুন কলিকাতায় বিদ্রোহ দেখা দিবে। ইহার ফলে য়ুরোপীয় মহলে আতংকের সঞ্চার হয়। এই ব্যাপারে একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "অফিসের বড়কর্তাগণ প্রথমে বিপদ সংকেত দেন। সেক্রেটারীগণ পিস্তল হাতে সদস্যদের নিকট দৌড়াদৌড়ি করেন। দরজা সুরক্ষিত করিয়া সোফায় নিদ্রা যান। সদস্যবৃন্দ পরিবার পরিজন লইয়া জাহাজে আশ্রয় লন।"[৩১] সরকারের সন্দেহ হয় যে, নবাব ওয়াজিদ আলী ও তাঁহার সভাসদগণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের বৈদেশিক সেক্রেটারী মিঃ ইডমনস্টোন ১৪ই জুন ভোরে গার্ডেন রীচ প্রাসাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আলী নকী খাঁকে ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে আসেন ও অন্তরীণাবদ্ধ করিয়া রাখেন। আগস্ট মাসে নবাবের তিনজন অনুচরকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। সৈয়দ হোসেন নামক একজন গুপ্ত এজেন্ট চারজন সহকারী সহ ধরা পড়ে। তাঁহার নিকট যে কয়টি চিঠি পাওয়া যায় তাহা হইতে আলী নকী খাঁর সহিত তাঁহার যোগাযোগের ব্যাপার প্রকাশ পায়। এই চিঠি হইতে আগা মির্যা শাহ্ নামক অন্য একজন গুপ্ত এজেন্টের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারা আলী নকীর এজেন্টরূপে বৃটিশ বিরোধী প্রচারকার্য করিতেছিল।[৩৩]

১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪নং রেজিমেন্টের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়। তাহারা সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন করে এবং বন্দীদিগকে মুক্ত করে। ইহার পর তাহারা ঢাকার পথে রওয়ানা হয়। নোয়াখালীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত নৌকা আটক করায় সিপাহীগণ ফেনী নদী পার হইতে অসমর্থ হয় এবং পার্বত্য ত্রিপুরার জঙ্গল পথে শ্রীহট্টের দিকে চলিতে থাকে। ত্রিপুরার রাজা তাহাদিগকে বাধা দেন। অনেক কষ্ট করিয়া তাহারা শ্রীহট্ট অঞ্চলে পৌছিতে সমর্থ হয়। মেজর আর, বি, বায়ঙ্গ (R. B. Byng) একদল সৈন্য লইয়া লাটু নামক স্থানে সিপাহীদিগকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বায়ঙ্গ নিহত হন। ২৬ জন সিপাহী নিহত হয় (১৮ই ডিসেম্বর) ইহার পর সিপাহীগণ মনিপুরের জঙ্গলের দিকে হটিয়ে যায়। ১৮৫৮ সালের ২২শে জানুয়ারী শ্রীহট্টের বৃটিশ সৈন্যদল সিপাহীদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। অনেক সিপাহী যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেয়।[৩৪]

ঢাকা শহরেও বিদ্রেহের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল এবং স্থানীয় ইংরাজগণ আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, ১৮৫৭ সাল বৃটিশ ভারতের সিপাহীদের বিদ্রোহের জন্য স্মরণীয়। এই স্মরণীয় বৎসরের জুন মাসে একজন জজ আদালত-কক্ষ হইতে উঠিয়া যান এবং ঘন্টা বাজাইয়া বিপদ-সংকেত দেন। দৈনিক হরকরার একটি সংবাদ পড়িয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। 'তাহারা আসিতেছে' এরূপ জনরব শোনা যায়।" লেখক বলেন যে, ইহার ফলে আতংকের সৃষ্টি হয়। জনরব

www.bjilibrary.com

ও আতংক সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।[৩৫] ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ব্রেনান্ড লিখিয়াছেন যে, ৩০শে জুলাই ঢাকা কলেজে য়ুরোপীয় ও স্থানীয় লোকদের এক সভা হয়। এই সভায় একটি পদাতিক ও একটি অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মেজর স্মিথ পদাতিক বাহিনীর ও লেফটেন্যান্ট হিচিনস্ অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আগস্ট মাসে অনেক আর্মেনিয়ান ঢাকা ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যায়। য়ুরোপবাসীগণ তাহাদের কারখানাগুলি সুরক্ষিত করিবার কথা চিন্তা করে।। ২৫শে নভেম্বর ব্রেনান্ড লিখিয়াছেন, "ভারতের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া চলিয়াছে তাহা সন্তোষজনকভবে ঢাকা অতিক্রম করিয়াছে।.....কিন্তু ডাকে চট্টগ্রাম হইতে খারাপ সংবাদ আসিয়াছে।....বিকাল ৬টায় সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ঢাকার ৭৩ নং রেজিমেন্টের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা উচিত। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে পরদিন ভোর ৫টায় প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ২২শে নভেম্বর রবিবারের ঘটনা। নিদিষ্ট সময়ে কমিশনার, জজ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ উপস্থিত হন। বিশ হইতে ত্রিশ জন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিল। তখনও রাতের অন্ধকার শেষ হইয়া যায় নাই। আমরা সংকেতের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে সরকারী ধনাগারের পাহারাদার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ইহাদিগকে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে সমর্পণ করা হইবে। ইহার পর নাবিকগণ তাহাদের সর্বশক্তি লইয়া লালবাগ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইবে।.....পরিকল্পনা সন্তোষজনকভাবে কার্যকরী করা হয়। ধনাগারের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা হয়।"

নাবিকগণ লালবাগ পেঁছিয়া দেখিতে পায় যে, সিপাহীরা নিরস্ত্রীকরণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। নাবিকগণ দুর্গের দক্ষিণ তোরণের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় পাহারাদার একজন সিপাহীর গুলিতে একজন নাবিক নিহত হয়। সিপাহীগণ বিবির কবরের সন্মুখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেখান হইতে নবিকদের উপর গুলি ছুঁড়িতে থাকে। লেফটেন্যান্ট লুই নাবিকদিগকে লইয়া বামদিকে সরিয়া যান এবং সেদিক হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করেন। ইহতে সিপাহীগণ হটিতে বাধ্য হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর সিপাহীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ৪০ জন সিপাহী নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। ইংরাজদের পক্ষে একজন নিহত হয় ও ৪ জন গুরুতররূপে আহত হইয়া পরে মারা যায়। আরও অনেকে আহত হয়। সিপাহীদের কয়েকজন পরে ধরা পড়ে। তাহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হয়।[৩৬] অন্তঘর ময়দানে প্রকাশ্যে সিপাহীদের ফাঁসি হয়। ঢাকার একজন নাগরিক লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের সকলকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং এইভাবে বিদ্রোহ শেষ করা হয়। অন্তঘর ময়দান এই বিয়োগান্ত ঘটনার দৃশ্যস্থল ছিল। এই জন্য এই মাঠের দৃশ্য লোকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিত। এই মাঠকে কেন্দ্র করিয়া অনেক অবিশ্বাস্য গল্প প্রচলিত হইয়াছিল। বাংলাবাজার, শাখারিবাজার, কলতাবাজার প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী মহল্লার লোকগণ এই সকল গল্প করিত। তাহারা বলিত যে, যে সকল সিপাহীকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের

www.bjilibrary.com

প্রেতাত্মা রাত্রে ময়দানে ঘোরাফেরা করে এবং তাহাদের আর্তনাদ শোনা যায়। বৃদ্ধেরা এই গল্প বলিতেন। আমরা বিকালের পর ময়দানে যাইতে সাহস করি নাই।"[৩৭]

যশোহর সেনানিবাসের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ইহা নারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জলপাইগুড়ির সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয় ও পুর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা পুর্ণিয়া দখল করিতে ব্যর্থ হইয়া নেপালের দিকে চলিয়া যায়।[৩৮] বিদ্রোহের সময় দিনাজপুরে কয়েকজন মৌলবীকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহাদের নিকট কয়েকটি ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি পাওয়া যায়। এইগুলি তাঁহার বাঁশের লাঠির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন।[৩৯] বিদ্রোহের সময় ময়মনসিংহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেখানকার জেলের ছয়শত জন কয়েদী পাহারাদারদিগকে পরাস্ত করিয়া জেল হইতে বাহির হইয়া যায়। তাহারা বন্দুক ও তরবারি লুঠ করিয়া জামালপুরের দিকে অগ্রসর হয়। জামালপুরের ইংরাজগণ পাহারাদার সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করে। সংঘর্ষে বিদ্রোহীদের অনেকে নিহত হয় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ইতস্তত পালাইয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, সিপাহীদের বিদ্রোহের সহিত কয়েদীদের বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক ছিল না। খাবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েদীদের অভিযোগ ছিল এবং ইহার প্রতিকার না হওয়ায় তাহারা বিদ্রোহী হয়।[৪০]

বিদ্রোহের প্রতি বাংলার মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন ছিল। আলেকজান্ডার ডাফ লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা গর্ডেন রীচের মুসলমানগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাহারা বিদ্রোহের সাফল্যের জন্য মসজিদে প্রার্থনা করিত।[৪১] মৌলবীগণ গোপনে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের জন্য প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। দিনাজপুরে কয়েকজন মৌলবীকে গ্রেফতার করা হয়। কেরামত আলী এবং আরও কয়েকজন মৌলবীকে রাজদ্রোহের অপরাধে আটক করা হয়।[৪২]

বিদ্রোহের সময় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব ছিল। যে জমিদার শ্রেণী উত্তর ভারতে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়াছে সেইরূপ জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব তখন বাংলাদেশে ছিল না বলিলেই চলে। ঢাকার নবাব আবদুল গণি তখন মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র বিত্তশালী জমিদার ছিলেন। তিনি রাজভক্ত ছিলেন এবং ইংরাজদিগকে নানাভাবে সাহায্য করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহার জীবনধারণের ভাতার জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এইজন্য তিনি রাজভক্ত প্রজারূপে বিদ্রোহ দমনে ইংরাজদিগকে সাহায্য করেন। ফরায়েজী নেতা দুধু মিয়ার বিদ্রোহের নেতৃত্ব করার দক্ষতা ও সম্ভাবনা ছিল। বিদ্রোহের সময় সরকার তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া দুই বৎসর আলীপুর জেলে আটক রাখে। তখন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম ছিল এবং তাহাদের সকলেই চাকুরীজীবী ছিল। মুসলমান ব্যবসায়ীর সংখ্যাও নগন্য ছিল। তাহারা রাজভক্ত ছিল। মুসলমান ব্যবসায়ীর সংখ্যাও নগণ্য ছিল। তাহরা রাজভক্ত ছিল। ১৮৫৭ সালের ২৭শে মে কলিকাতায় এক সভায় তাহারা বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে এবং সরকারকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়।[৪৩]

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের সমর্থন ছিল। সে সময় কলিকাতার য়ুরোপীয়দের মধ্যে যে আতংকের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া সমসাময়িক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন যে, তখন তাহাদের সকলের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, রাত্রে হিন্দু বা মুসলমান অথবা উভয় সম্প্রদায়ের লোকগণ বিদ্রোহী হইতে পারে।[৪৪] ১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতার ইংলিশম্যান পত্রিকা মন্তব্য করে যে, সমসাময়িক ইংরাজগণ বিশ্বাস করিত যে, প্রত্যেক ভারতবাসী মনে প্রাণে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে ছিল।[৪৫] কিন্তু হিন্দু ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ কোম্পানীর শাসনে খুব উপকৃত হইয়াছিল। এইজন্য তাহারা বিদ্রোহের সময় ইংরাজ শাসকদের অনুগত ছিল। ২২শে মে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে। ২৫শে মে বর্ধমানের জমিদার মহারাজা মাহাতাব চাঁদ ২৫০০ জন প্রতিপত্তিশালী লোকের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপিতে সরকারকে ভারতবাসীর সহযোগিতার আশ্বাস দেন।[৪৬]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। প্রধানত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সংগঠনের অভাবে ইহা ব্যর্থ হইয়া যায়। পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিদ্রোহীগণ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। সংগঠনের অভাবে বিদ্রোহ শক্তিশালী হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের অভাব ছিল এবং তাহাদের অনেকের সামরিক শিক্ষা ছিল না। বৃটিশ সৈন্যদল সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং তাহাদের অজস্র অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ছিল। তৃতীয়ত, ডাক ও তারের উপর বৃটিশের দখল অব্যাহত ছিল। ইহার ফলে বৃটিশ সৈন্যধ্যক্ষদের পক্ষে বিভিন্ন স্থানের খবরাখবর লইতে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সাহায্য পাঠাইতে সুবিধা হয়। বিদ্রোহীদের সে সুবিধা ছিল না। চতুর্থত দেশীয় রাজ্যের রাজাগণ বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করিয়াছেন এবং শিখ ও গুর্খা সৈন্যগণ বৃটিশ সৈন্যদের পক্ষে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে।

বৃটিশ সরকার কঠোরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়। অনেক মুসলমানদের ফাঁসী হয়। দিল্লীর অধিবাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান হয়। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারাণী এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি দেশীয় রাজাদিগকে আশ্বাস দেন যে বৃটিশ সরকার রাজ্যবিস্তারের নীতি পরিহার করিয়া চলিবে। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, যোগ্যতানুসারে তাহাদিগকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে এবং আইন প্রণয়নের কাজে তাহাদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে।

www.bjilibrary.com

দশম অধ্যায়
বৃটিশ শাসনকালে মুসলমানদের শিক্ষা

মুসলমান আমলে ভারতীয় মুসলমানগণ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল। তাহারা শিক্ষাকে ধর্মের অঙ্গ-স্বরূপ মনে করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, বিদ্যাশিক্ষা করিলে আল্লাহ্‌র আরাধনা করা হয়। প্রত্যেক মসজিদ, ইমাম বারা, খানকাহ্ এবং আলেম ও অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শাসক, ওমরাহ্ ও রাজকর্মচারীগণ শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষিত লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন ও মাদ্রাসা স্থাপন করিতেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্কর জমি দান করা হইত। মোগল সাম্রাজ্যে শিক্ষার উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল বলিয়াছেন, "যুবকদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু হিন্দুস্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।"[১] সম্রাট আকবরের শিক্ষা বিষয়ক আইন হইতে সে যুগের শিক্ষার উন্নত মান সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। এই আইনে বলা হয়, "প্রত্যেক বালকের পক্ষে নীতিজ্ঞান, অংক কৃষি, পরিমাপ-বিদ্যা শরীরবৃত্ত জ্যোতিষ, গার্হস্থ্যবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইতিহাসে জ্ঞান অর্জন করা উচিত। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান ক্রমশ আয়ত্ত করা যাইতে পারে।" আবুল ফজল লিখিয়াছেন, "এই আইনের ফলে বিদ্যালয়গুলি নূতনভাবে আলোকিত হয় এবং মাদ্রাসাগুলি উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।"[২]

জেনারেল শ্লীমান মোগল যুগের শিক্ষার উচ্চ মানের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যেরূপ ব্যাপক প্রসার হইয়াছে পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরূপ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুড়িটাকা মাহিনায় চাকুরী করে সে তাহার পুত্রের জন্য সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পত্রের সমান শিক্ষার ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের যুবকগণ ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি যে সকল বিষয় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করে সেইগুলি তাহারা আরবী ও ফার্সী ভাষায় আয়ত্ত করে। অক্সফোর্ড হইতে যুবকগণ সদ্য যে জ্ঞান লইয়া বাহির হইয়া আসে মুসলমান যুবক সাত বৎসরে সে জ্ঞান আহরণ করিয়া মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। সে অনর্গল সক্রেটিস, এরিস্টোটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস গেলেন ও ইব্‌নে সিনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে।" শ্লীমান মন্তব্য করিয়াছেন, "যখন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ব্যতীত বাহিরের কোন বিষয় নিয়া আমাদিগকে কোন পদস্থ ও শিক্ষিত মুসলমানের সহিত আলোচনা করিতে হয় তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় ব্যক্তিগণও নিজেদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা উপলব্ধি করি। টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা ও এরিস্টোটলের ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমান ভদ্রলোকের মোটামুটি জ্ঞান আছে। ইব্‌নে সিনার মাধ্যমে হিপোক্রেটিস ও গেলেনের ভাবধারার সহিত তাহাদের পরিচয় আছে। তাহারা দর্শন, সহিত্য,

www.bjilibrary.com

বিজ্ঞান ও কলা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতে পারে এবং বর্তমান যুগে এইসব বিষয়ে যে উন্নতি হইয়াছে তাহাও জানিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ আছে।"[৩]

মুসলমান আমলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে উইলিয়ম হান্টার লিখিয়াছেন, "ভারতীয় রাজকর্মচারী ই, পি, বেইলী মুসলমানদের বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি যদিও আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে নিকৃষ্টতর ছিল, তবু ইহা অবহেলার যোগ্য ছিল না; উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তি ও সুরুচির বিকাশ করিবার সামর্থ ইহার ছিল; যদিও তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরাতন ধারায় চলিত তবু ইহা মোটামুটি সুষ্ঠু নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইহা সেই যুগে ভারতে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতি হইতে বহুলাংশে উৎকৃষ্টতর ছিল। এই শিক্ষা-পদ্ধতির ফল তাহারা জ্ঞান ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল এবং ইহার মাধ্যমে হিন্দুগণ তাহাদের দেশের শাসনকার্যে ক্ষুদ্রতম অংশ পাইবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করার আশা করিত।"[৪]

আরবী–ফার্সী শিক্ষা : রাজ্যহারা হইবার পর বাংলাদেশের মুসলমানদিগকে চাকুরী, জমিদারী, জায়গীর প্রভৃতিও হারাইতে হয় এবং ইহাতে তাহাদের আর্থিক ঐশ্বর্য নষ্ট হইয়া যায়। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন তাহাদের শিক্ষার গুরুতর ক্ষতি হয়। মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিত। ইহাদের জন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। নিষ্কর জমি বাযয়াফত করায় বিত্তহীন মুসলমানদের পক্ষে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিকাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। ১৮০৭-১৪ সালের বুকানন হেমিলটন ও ১৮৩৫-৩৮ সালে উইলিয়ম এডাম বাংলাদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা ইহা আলোচনা করিয়াছেন।[৫] আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাহাদের শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা কিছুটা বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্বাহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কোম্পানীর শাসনকালে এডাম প্রত্যেক মসজিদ ও ইমামবারায় আরবী ও ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পান। তিনি বলিয়াছেন। যে, তখন বাংলা ও বিহারের ৪০,০০০,০০০ অধিবাসীর জন্য ১০০,০০০ প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যে, প্রতি গ্রামে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৫ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক তিনশত বালক শিক্ষা পাইতে পারিত। এডাম মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুসলমানদের শাসনকালে প্রাইমারী শিক্ষা আরও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[৬]

কোম্পানীর আমলে ফার্সী বহু বৎসর সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। বিচারকার্যের জন্য মুসলমানদের আইন পদ্ধতি বজায় রাখা হয়। এইজন্য মুসলমানগণ তাহাদের আরবী ও ফার্সী শিক্ষার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ১৮৩৫ সালে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এডামকে বাংলা-বিহারের গ্রামগুলির শিক্ষাব্যবস্থা তদন্তের জন্য নিয়োগ করেন। এডাম কয়েকটি জিলার শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করিয়া

www.bjilibrary.com

তিনটি রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রথম রিপোর্টে তিনি দেশীয়, মিশনারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে বিবরণ দেন। দ্বিতীয় রিপোর্টে তিনি রাজশাহী জিলার নাটোর মহকুমায় শিক্ষার অবস্থা নিয়া আলোচনা করেন। নাটোরের শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক ছিল। ১৮৩৮ সালে এডাম তৃতীয় রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টে তিনি কয়েকটি জিলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা দেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করেন।

এডাম মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অব্যবস্থা ও অবনতি লক্ষ্য করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের মুসলমানগণ বহু বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল এবং শিক্ষাকে তাহারা কেবল জীবনের পেশা ও জীবিকা নির্বাহের উপায় বলিয়া গ্রহণ করে নাই, তাহারা ইহাকে ন্যায় ও পুণ্যের কাজ বলিয়া বিশ্বাস করিত। ছাত্রগণ শিক্ষকের বাড়ীতে থাকিত। তাহারা পাঞ্জনামা, গুলিস্তান এবং আরও কয়েকখানি ফার্সী ও আরবীর বই পড়িত। শিক্ষা শেষ করিয়া তাহারা মুনশী আখ্যা লাভ করিত।[৭] এডাম লিখিয়াছেন, "হুগলী জিলার পাণ্ডুয়ার যথেষ্ট সুনাম ছিল। এখানকার মুসলমান ভূস্বামীগণ দরিদ্র প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষক রাখিবার ব্যবস্থা করিত এবং সেখানে এমন কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল না যাহার বাড়ীতে শিক্ষক রাখা হইত না। এই শ্রেণীর মুসলমান ও এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা এখন নাই বলিলেই চলে।"[৮] পাণ্ডুয়ার তিনটি মাদ্রাসা মুসলমান আমল হইতে নিষ্কর ভূমির উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কোম্পানীর শাসনকালে ইহাদের অস্তিত্ব মাত্র বজায় ছিল। হুগলী জিলায় আরবী-ফার্সীর আরও কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল। ইহাদের একটির জন্য হাজী মুহম্মদ মহসিনের দানের ব্যবস্থা ছিল সীতাপুরে একটি মাদ্রাসা ছিল। ইহার জন্য ১৭৭২ সালে গবর্ণর কার্টিয়ার সাড়েপাঁচ টাকা দান করেন।[৯]

বর্ধমান জিলার বোহার ও চাঙ্গারিয়ার মাদ্রাসাগুলির জন্য নিষ্কর জমি ছিল।[১০] এডামের সময় এই জিলায় ৯৩টি ফার্সী ও ৮টি আরবী বিদ্যালয় ছিল। অনেক শিক্ষকের নিষ্কর জমি ছিল এবং ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত।[১১] বীরভূম জিলায় ৭১টি ফার্সী ও ২টি আরবী বিদ্যালয় ছিল। অনেক শিক্ষকের নিষ্কর জমি ছিল।[১২] মেদেনীপুরে একটি মাদ্রাসা ও ৪৮টি ফার্সী বিদ্যালয় ছিল।[১৩] মুর্শিদাবাদে একটি মাদাসা এবং ১৭টি ফার্সী ও ২টি আরবী বিদ্যালয় ছিল।[১৪] রাজশাহী জিলার বাঘায় একটি প্রাচীন মাদ্রাসা ছিল। বাঘা মাদ্রাসার জন্য ৪২টি গ্রামের নিষ্কর জমি মুসলমান শাসনকালে দান করা হইয়াছিল।[১৫] এডাম লিখিয়াছেম যে, এই নিষ্কর জমির অধিকাংশ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতার বংশধরগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিল। আরবী ও ফার্সী শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসায় মাত্র দুইজন শিক্ষক ছিল। মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। ধর্মশাস্ত্র, আইন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।[১৬] এডাম তাঁহার রিপোর্টে চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেন। এই মাদ্রাসার জন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ইহা ভগ্নদশায়

www.bjilibrary.com

পতিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টে শাহ জালালের দরগাহের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি মাদ্রাসা ছিল এবং ইহার জন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।[১৭]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তাহারা হিন্দুদের পিছনে পড়িয়া যায়। ১৮০১ সালে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ২০টি সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল এবং মুসলমানদের মাত্র একটি আরবী-ফার্সী বিদ্যালয় অস্তিত্ব বহন করিতেছিল। ১৮২৩ সালে রংপুর জিলায় ২টি ফার্সী বিদ্যালয় ছিল। দিনাজপুর জিলায় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য ফার্সী বিদ্যালয় ছিল না; হিন্দুদের অনেকগুলি বিদ্যালয় ছিল। হেমিলটন ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বাকরগঞ্জ, নদীয়া প্রভৃতি জিলায় উল্লেখযোগ্য আরবী-ফার্সী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিতে পান নাই। তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকা জিলায় হিন্দুদের অনেকগুলি বিদ্যালয় দেখিতে পান।[১৮]

এডাম মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতির ও মুসলমান শিক্ষকের প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হিন্দু বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা অপেক্ষা আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা বেশি ফলপ্রদ ও সাধারণ জ্ঞানের উপযোগী ছিল এবং শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে হিন্দু শিক্ষকগণ অপেক্ষা মুসলমান শিক্ষকগণ যোগ্যতর ছিল। এডাম মন্তব্য করিয়াছেন, "যদি বাঘা, বোহার, চাঙ্গারিয়া ও মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসাগুলি ভালভাবে পরিচালিত হইত তাহা হইলে ইহারা উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নীত হইত।"[১৯] আর্থিক সাহায্যের অভাবে মাদ্রাসা ও আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মক্তব বা প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষার অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। ইহাদের শিক্ষার ভার অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষকদের হাতে পড়িয়াছিল। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির উল্লেখ করিয়া এডাম লিখিয়াছেন, "এই আরবী বিদ্যালয়গুলি এরূপ হীনদশায় পৌছিয়াছে যে, ইহারা লক্ষ্যেরও অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।[২০]

বাংলা পাঠশালা ও মিশনারী বিদ্যালয় : বিভিন্ন জিলায় হিন্দুদের অনেকগুলি টোল ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এইগুলি ছাড়াও প্রত্যেক জিলায় তাহাদের অনেক পাঠশালা বা বাংলা বিদ্যালয় ছিল। এডাম কয়েকটি জিলায় পাঠশালার সংখ্যা দিয়াছেন; মেদেনীপুরে ৫৪৮টি, মুর্শিদাবাদে ৬২টি, বীরভূমে ৪০৭টি, বর্ধমানে ৬২৯টি, এবং দিনাজপুরে ১১৯টি পাঠশালা ছিল।[২১] বাংলা শিক্ষায় মুসলমানগণ হিন্দুদের বহু পিছনে পড়িয়াছিল। কয়েকটি জিলার বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমেঃ মুর্শিদাবাদ-৯৯৮ ও ৬২, বর্ধমান-১২,৪০৮ ও ৭৬৯, এবং বীরভূম-৬১২৫ ও ২৩২।[২২] বাংলা বিদ্যালয়ে সংস্কৃত উদ্ভূত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইত এবং প্রায় সকল শিক্ষকই হিন্দু ছিল। এডাম ইহাদের পাঠ্যতালিকার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছাত্রদিগকে প্রতিদিন সকালে হাটু গাড়িয়া নত মস্তকে সরস্বতী-বন্দনা আবৃত্তি করিতে হইবে। তাহারা শুভঙ্করের গণিতের নিয়মগুলিও সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করিত। তাহাদিগকে কড়াকিয়া, গন্ডাকিয়া, কাঠা কিয়া, শতকিয়া, যোগ,

www.bjilibrary.com

বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক হিসেবের নিয়মগুলি মুখস্থ করিতে হইত। পত্রলিখা, মনসামঙ্গল প্রভৃতি তাহাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল।[২৩]

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার সহিত মিল রাখিয়া বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এইগুলি বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ সংস্কৃত উদ্ভুত বাংলার সহিত পরিচিত ছিল না। ইহা ব্যতীত এই পাঠ্যপুস্তকগুলি হিন্দুধর্ম ও উপকথা সম্বন্ধীয় ছিল।[২৪] এইজন্য মুসলমানগণ সাধারণত পাঠশালাগুলিতে শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করিতে উৎসাহ পাইত না।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য মিশনারীগণ বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ১৭৯৩ সালে উইলিয়ম কেরী নামক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। ১৭৯৪ সালে তিনি মালদহ জিলার সদনহাটি নীলকুঠিতে একটি বাংলা বিদ্যালয় শুরু করেন। ১৮০০ সালে কেরী শ্রীরামপুর মিশনারী সোসাইটির কাজে যোগ দেন এবং সেখানে ছাপাখানা স্থাপন করেন ও সমাচার দর্পন নামে বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা বাহির করেন।[২৫] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইলার্টন নামক একজন নীলকর মালদহ জিলায় কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় কয়েকখানি পাঠ্য বই লিখেন। ১৮১৪ সালে মে নামক একজন মিশানারী ওলন্দাজদের উপনিবেশ চিনসুরায় একটি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি ১৬টি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার উদ্যোগে কয়েক বৎসরের মধ্যে চিনসুরায় ২৬টি ও ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানে ১০টি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৫ সালে লর্ড হেস্টিংস এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক ৬০০ টাকা সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৮ সালে এই বিদ্যালয়গুলিতে মোট ৩০০০ জন ছাত্র লেখাপড়া শিখিত। মের মৃত্যুর পর পিয়ারসন বিদ্যালয়গুলি তত্ত্বাবধানের কাজ গ্রহণ করেন। পিয়ারসন ও হার্লি চন্দরনগর ও কালনা অঞ্চলে কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কোম্পানীর সরকার এই বিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থ সাহায্য করে। মিশনারীগণ ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। স্টুয়ার্টের অধীনে চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানে বাংলা বিদ্যালয় শুরু করে। ১৮১৮ সালের মধ্যে বর্ধমানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহাদের ছাত্রসংখ্যা ১০০০ ছিল।[২৬]

কোম্পানীর শাসনের আরম্ভ হইতে কলিকাতা একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নীত হয়। বেপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি এবং চার্চ মিশনারী এসোসিয়েশন কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠে অনেকগুলি বাংলা বিদ্যালয় স্থপন করে।[২৭] ইহাদের উদ্যোগে ১৮১৭ সালে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। সস্তা দামের বই প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কয়েকজন ইংরাজ হিন্দু ও মুসলমান সদস্য লইয়া ইহার কার্য নির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। ১৮২১ সালে সরকার ইহার জন্য এককালীন ৭০০০ টাকা দান করে এবং মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই বৎসর পর্যন্ত সোসাইটি প্রধানতঃ প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ১২৬,৪৪৬ কপি বই প্রকাশ করে। ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুল

www.bjilibrary.com

বুক সোসাইটির উদ্যোগে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়গুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা ও নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করা কলিকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২১ সালে ইহার অধীনে ১১৫টি বাংলা বিদ্যালয় ছিল এবং এইগুলিতে মোট ৩৮২৮ জন ছাত্র ছিল। ১৮২৩ সালে সরকার এই সোসাইটির জন্য মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করে।[২৮] ১৮২১ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটির সহযোগিতায় মিসকুক কলিকাতায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুই বৎসরে কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠে ২২টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ সালে কলিকাতায় সেন্ট্রাল স্কুল স্থাপিত হয়।[২৯] এই সময় শ্রীরামপুর মিশনারীদের চেষ্টায় বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০]

শ্রীরামপুর মিশনারীগণ ঢাকায় কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২৩ সালে ঢাকা ও ইহার উপকণ্ঠের বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বেসরকারী সোসাইটি গঠিত হয়। ১৮২৬ সালে এই সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ২৫টি বিদ্যালয় ছিল এবং ইহাদের ছাত্র সংখ্যা ১৪১৪ ছিল। এডামের তদন্তের সময় ঢাকায় ৮টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল এবং এইগুলিতে ২৪৯ জন ছাত্রী ছিল।[৩১] এডাম মিশনারীতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জিলার বাংলা বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা দিয়াছেন ঃ চব্বিশ পরগণা ৩৬, যশোহর ৪, নদীয়া ১, বাকরগঞ্জ ১, চট্টগ্রাম ২, ত্রিপুরা ১, রাজশাহী ১, দিনাজপুর ১, মুর্শিদাবাদ ২ ও বীরভূম ২।[৩২] মিশনারী বাংলা বিদ্যালয় খ্রীষ্টধর্মীয় বই পাঠ্য তালিকায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এই কারণে মুসলমান ছাত্রগণ ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই।

ইংরাজী শিক্ষা : সরকারের নীতি

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম হইতেই বৃটিশ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে। কলিকাতার বিত্তশালী হিন্দুদের উদ্যোগে ইংরাজী শিক্ষা শুরু হয়। তাহারা ১৮০০ সালে কলিকাতার ভবানীপুরে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে। চিনসুরার ম্যাজিস্ট্রেট ফর্বিসের পৃষ্টপোষকতায় ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৩] রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং আরও কয়েকজন হিন্দু নেতার প্রচেষ্টায় ১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ডেভিড হেয়ার ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট হিন্দু কলেজের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। এই কলেজে শুধু হিন্দু ছাত্র ভর্তি করা হইত।[৩৪] হিন্দু কজলেজ প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জিলাগুলিতে কয়েকটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কয়েকটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮৩৫-৩৬ সালে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী এলাকায় ২০টি ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল এবং এইগুলিতে ৬০০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করিত।[৩৫]

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীগণ বাংলাদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হইয়াছিল। ১৭৩১ সালে সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব দি

www.bjilibrary.com

খ্রীস্টান নলেজ (Society for the promotion of the Christian Knowledge) নামক ধর্মপ্রচাকদের একটি দল কলিকাতায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই বিদ্যালয়ে বিনা খরচে শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৭৫৮ সালে সুইডেনের ধর্মপ্রচারক জাকারিয়া কিয়ারনাণ্ডার কলিতাকায় অন্য একটি ইংরাজী বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিশনারীগণ কয়েকটি প্রাথমিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাহাদের প্রধান ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়।[৩৬] মিশনারীগণ মনে করিত যে, ইংরাজী জ্ঞান লাভ করিলে হিন্দুগণ মূর্তি পূজার অসারতা বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা যাইবে।[৩৭]

যখন হিন্দুদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসার লাভ করে তখন তাহারা ফার্সীর স্থলে ইংরাজী ভাষাকে সরকারী ভাষা করিবার জন্য দাবী করে। ১৮২৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী একটি বাংলা সাপ্তাহিক লিখিয়াছে, "ফার্সী বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা বিচারক, উকীল, বাদী, বিবাদী অথবা সাক্ষী কাহারই ভাষা নয়। অমরা মনে করি, যদি কোন বিদেশী ভাষাকে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ইংরাজী ভাষাই গ্রহণ করা উচিত। এতদিন ইংরাজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, বাঙ্গালী জাতি ইংরাজী জানেনা। কিন্তু এখন সে আপত্তি টিকিতে পারে না। এখন হিন্দু কলেজে ৪০০ ছাত্র ইংরাজী শিখিতেছে। কলিকাতার অন্যান্য স্কুলগুলিতে কমপক্ষে এক হাজার ছাত্র ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছে। ইংরাজী ভাষায় তাহাদের যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে এই ভাষায় আদালতের কাজ চালান কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। সরকার যাহাতে ফার্সীর জায়গায় ইংরাজীকে আদালতের ভাষারূপে প্রচলন করে সে জন্য কলিকাতাবাসীদের আবেদন করা উচিত। যদি এই আবেদন গ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হইবে।" ১৮৩৪ সালের ১৯শে মার্চ এই সাপ্তাহিকী সরকারের নিকট দাবী করে যে, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী জ্ঞান যোগ্যতার প্রধান গুণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।[৩৮]

অর্ধ শতাব্দীর বেশি কাল কোম্পানীর সরকার বাংলা-বিহারের অধিবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণকে নিজেদের উপর নির্ভর করিতে হইত। ইংরাজ শাসকগণ দেশীয় লোকদের জন্য প্রাচ্য শিক্ষা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দিয়াছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে ১৭৮০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। বেনারসের রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকানের উৎসাহে ১৭৯১ সালে সেখানে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরাজ বিচারকদের সাহায্যের জন্য পণ্ডিতদেরকে শিক্ষা দেওয়া এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলী কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। ইংরাজ কর্মচারীদেরকে বাংলা সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কলেজ স্থাপিত হয়।[৩৯]

www.bjilibrary.com

মাদ্রাসা কলিকাতা : ফার্সী আদালতের ভাষা ছিল। দারোগা, কাজী, মৌলবী, মুনশী, উকিল ও আদালতের সংশ্লিষ্ট লোকের জন্য ফার্সী ভাষা ও মুসলিম আইনে জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। ইহাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস একটি উচ্চমানের ফার্সী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ১৭৮০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট মুসলমানগণ কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করেন। তাঁহাদের আবেদন ক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংস অক্টোবর মাসে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আরবী ও ফার্সী বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন মজিদউদ্দিনকে ইহার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি ব্যক্তিগত তহবিল হইতে মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। ১৭৮১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন যে, মাদ্রাসার ব্যয়ভার সারকারের বহন করা উচিত। কাউন্সিল এই প্রস্তাবের সুপারিশ করিয়া ডাইরেক্টর বোর্ডের নিকট পাঠান। এই সময় কলিকাতা মাদ্রাসায় ৪০ জন আবাসিক ছাত্র ছিল। অনাবাসিক ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে পড়ানো হইত। ১৭৮২ সালের ৩রা জুন কোম্পানীর সরকার মাদ্রাসর ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশ পরগনা জিলার কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব দান করে। মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য এই আয় অপ্রতুল হওয়ায় ১৭৮৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশ ক্রমে সরকার অতিরিক্ত দানের ব্যবস্থা করে। ইহার ফলে মাদ্রাসার জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৎসরে ২৯,০০০০ টাকা হয়।[৪০]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কোম্পানীর শাসকগণ বুঝিতে পারেন যে, সরকার সাম্রাজ্যের প্রজাদের শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাকিতে পারে না, শিক্ষার কিছুটা দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ব্যবস্থা হয় যে, ভারতের প্রজাদের শিক্ষার জন্য কোম্পানীর বাজেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকিবে। ডাইরেক্টর বোর্ড এই টাকা সংস্কৃত শিক্ষায় ব্যয় করিবার জন্য সুপারিশ করেন। আরবী ফার্সী শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের কোন উল্লেখ করা হয় নাই।[৪১] শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার ১৮২৩ সালে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি (General Committee of public Instruction) গঠন করে। এইচ, উইলসন কর্ম সচিব নিযুক্ত হন। উইলসন সংস্কৃত শিক্ষার ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের জন্য প্রচুর সাহায্যের ব্যবস্থা করেন; মাদ্রাসার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন নাই।[৪২] ১৮২৫ সালে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করে এবং হিন্দু কলেজের উন্নতির জন্য সুপারিশ করে। ইহার ফলে হিন্দু কলেজে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সংস্কৃত কলেজেও ইংরাজী ক্লাশ খোলা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব করা হয়। ১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাশ শুরু হয়।[৪৩]

এই সময় সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থা কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহাতে হিন্দুগণ এই ব্যবস্থা হইতে উপকৃত হয়। পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলার শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টি ছিল না। মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের ছেলেমেয়েদের

www.bjilibrary.com

শিক্ষার জন্য সেখানে ১৮২৪ সালে সরকার একটি প্রাথমিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করে। সরকার তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করে। ইহার ফলে সমগ্র বাংলাদেশে কেবল কলিকাতা মাদ্রাসায় অল্প কয়েকজন মুসলমান ছাত্র সামান্য ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পায়। ১৮৩০ সালে এই মাদ্রাসায় মাত্র ৮৭ জন ছাত্র প্রাথমিক ইংরাজী শিখিতেছিল। অন্য দিকে বিভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও হিন্দু কলেজে প্রতি বৎসর কয়েক হাজার হিন্দু যুবক ইংরাজী জ্ঞান অর্জন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

শিক্ষা বিতর্ক : শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হইবে, বিশেষত শিক্ষার মাধ্যমে কি হইবে সে বিষয়ে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কোনো নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে নাই। সমিতি কয়েকজন সদস্য প্রাচ্য ভাষাকে উৎসাহ দানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রাচ্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আবার কয়েকজন সদস্য ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮৩৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবীর সহিত ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া ১৮৩৫ সালে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে জনশিক্ষা সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সদস্যগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়, একদল প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থক ও অন্যদল পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকগণ মনে করেন যে, ভারতীয়দের জন্য তাহাদের প্রাচীন শিক্ষা বজায় রাখা উচিত এবং এই শিক্ষার সহিত তাহাদের নিজেদের ভাষায় কিছুটা ইয়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহারা উপকৃত হইবে। পাশ্চাত্যপন্থীগণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সময় লর্ড মেকলে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার একজন বড় সমর্থক ছিলেন। প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি তাঁহার সংকীর্ণ ধারণা ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "একটি ভাল ইয়ুরোপীয় লাইব্রেরীর এক সেলফের বইয়ের মূল্য ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল্যের সমান।"[৪৫] ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে বৃটিশ শাসনের পক্ষে যে সকল রাজনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি হইবে সেগুলির প্রতিও তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতে এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা রক্ত ও রঙ্গে ভারতীয় থাকিবে, কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরাজ হইয়া পড়িবে।[৪৬]

কোন কোন ইংরাজ মনে করিতেন যে, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইলে ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রসারের সুবিধা হইবে। চার্লস গ্রান্টকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার জনক বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ তিনি ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে খুব উৎসাহী ছিলেন। ১৭৯২ সালে তিনি পার্লামেন্টে বলেন, "প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান বিচ্ছুরিত হইলে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিধ্বসিয়া পড়িবে; যান্ত্রিক আবিষ্কারের জ্ঞানের আলোকে ভারতীয়গণ উদ্ভাসিত হইবে এবং ক্রমশ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের স্থলে খ্রীস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।[৪৭] লর্ড মেকলেও এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহার

www.bjilibrary.com

মাতাকে লিখিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করি তাহা হইলে ত্রিশ বৎসর পরের বাংলাদেশে কোন পৌত্তলিক থাকিবে না।"[৪৮]

বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক মেকলে ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষাপন্থীদের সহিত একমত হন। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারত সরকার ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবে এবং শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ শুধু ইংরাজী শিক্ষায় ব্যয় করিবে।[৪৯] ইহার দুই বৎসর পর ১৮৩৭ সালে সরকার ফার্সীর স্থলে ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে প্রচলন করে। সরকারী ভাষা পরিবর্তনের ব্যাপারে পূর্বে কোন আভাস দেওয়া হয় নাই। মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। ইহার ফলে চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয়। জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দেবার প্রস্তাব করে। মুসলমান ও হিন্দুদের আবেদনের ফলে ইহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু ইহাদের ছাত্রদিগকে যে বৃত্তি দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মাদ্রাসার অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই গরীব ছিল। বৃত্তি বন্ধ হওয়ার দরুন তাহারা অসুবিধায় পড়ে। লর্ড অকল্যাণ্ড মেধাবী ছাত্রদের জন্য সাধারণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রদের ইংরাজী জ্ঞান খুব সামান্য ছিল; ইংরাজী বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের পক্ষে বৃত্তি লাভ করা সম্ভব ছিল না।[৫০]

১৮৩৬ সালে সরকার কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে। এই কলেজে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৮ সালে মেডিকেল কলেজ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে আইন ক্লাস আরম্ভ হয়। সরকার ১৮৩৬ সালে মহসিন ফাণ্ডের টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপন করে। ১৮৪২ সালে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির স্থলে পরিষদ (Education Council) গঠিত হয়। ১৮৪৪ সালে ভারতীয়দিগকে নিম্নতর সরকারী পদে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮) ইংরাজী শিক্ষা প্রসার লাভ করে। এই সময় কৃষ্ণনগর কলেজ এবং বর্ধমান, বাকুড়া, বারাসত ও বগুড়ায় জিলা স্কুল স্থাপিত হয়।

স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে কলিকাতায় কয়েকটি কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মতিলাল শীল একটি অবৈতনিক কলেজ ও স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৫৩ সালে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হয়। পরে ইহা ফ্রি কলেজ ও ডেভিড হেয়ার একাডেমীর সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি কলেজে পরিণত হয়। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ১৮৪৯ সালে কলিকাতায় একটি মহিলা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৫১] ১৮৩৫ সালে ঢাকায় প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্থানীয় সমিতি ইহা কলেজে উন্নীত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৮৪১ সালে কলিকাতার বিশপ এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৪৬ সালে এই কলেজে ক্লাশ শুরু হয়।

www.bjilibrary.com

১৮৪৪ সালে সরকার প্রতি জিলায় বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ৩৬টি জিলায় মোট ১০১টি বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা হয়। প্রতি জিলায় দুই তিনটি শহরে একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহাদিগকে রেভেনিউ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। বিদ্যালয়গুলিকে বোর্ড-স্কুল বলা হইত।[৫২] বোর্ড স্কুলগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এই সময় শহরের লোকদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ছাত্র সংখ্যা কম হওয়ায় বোর্ড স্কুলগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইহার পর কয়েকটি জিলায় আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় (Model Vernecular School) স্থাপন করা হয়।[৫৩]

১৮৫৪ সালের শিক্ষা পরিকল্পনা : ভারতে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ১৮৫৪ সালের পরিকল্পনা (Education Despatch, 1854) কয়েকটি সুপারিশ করা হয়। প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ গঠন, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য নর্মাল স্কুলের ব্যবস্থা, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংরাজী এবং নিম্ন পর্যায়ে শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষা মাধ্যম রূপে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বলা হয়।[৫৪]

১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ হইতে ইহার স্কুল বিভাগ পৃথক করা হয় এবং ইহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম দেওয়া হয়। স্কুল বিভাগ হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এই কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচ্য সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[৫৫] শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার প্রত্যেক প্রদেশে জনশিক্ষা ডাইরেক্টর (Director of Public Instruction) নিয়োগ করে। সরকারী কলেজগুলিতে আইন ক্লাস খোলা হয়। ১৮৫৮ সালে কলিকাতায় প্রকৌশল কলেজ (Engineering College) প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা ও হুগলীতে নর্মাল স্কুল ও ইহাদের সংশ্লিষ্ট আদর্শ বিদ্যালয় খোলা হয়। নর্মাল স্কুলে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে জ্ঞান অত্যাবশ্যক ছিল। এই জন্য সেখানে মুসলমান শিক্ষর্থীদের প্রবেশ দুঃসাধ্য ছিল।৪৬ শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৭]

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি

কোম্পনীর আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানগণ খুব পিছনে পড়িয়া যায়। এডামের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত ও দক্ষিণ বিহারের আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ২০৯৬ এবং মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ১৫৫৮ ছিল। বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা আরও কম ছিল : মুর্শিদাবাদ জিলায় ৯৯৮ জন হিন্দু ও ৬২ মুসলমান, বর্ধমান জিলায় ১২৪০৮ জন হিন্দু ও ৭৬৯ জন মুসলমান এবং বীরভূম জিলায় ৬১২৫ জন হিন্দু ও ২৩২ জন মুসলমান ছাত্র

www.bjilibrary.com

ছিল।[৫৮] বাংলাদেশের অন্যান্য জিলাগুলিতে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। মুসলমানদের অধিকাংশ গ্রামে বাস করিত এবং তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। এডাম উপলব্ধি করেন যে, গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো কিন্তু সরকার গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। সরকার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার প্রতি উদসীন ছিল। তা'ছাড়া কোম্পানীর শাসকগণ নিষ্কর জমি বযয়াফত করেন এবং মুসলমান প্রতিষ্ঠান গুলির দান-সম্পত্তি অন্য কাজে ব্যবহার করেন। এডাম সরকারের এই নীতির সমালোচনা করেন।[৫৯] যদি সরকার এইগুলি ইহাদের আসল উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে মুসলমানদের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইত এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ সহজ হইত।[৬০]

সরকার হাজী মুহম্মদ মহসিনের ওয়াকফ সম্পত্তি আসল উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া অন্যভাবে ব্যবহার করিতেছিল। ১৮০৬ সালে ধর্মপ্রাণ মহসিন তাঁহার বিরাট সম্পত্তি উইল করিয়া মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য দান করিয়া যান।[৬১] মহসিন ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য দুইজন মুতাওয়াল্লী ছিল। এই মুতাওয়াল্লীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায়, ১৮১৭ সালে সরকার এই ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে। সরকার একজন মুতাওয়াল্লীর স্থান গ্রহণ করে এবং অন্য একজন মুতাওয়াল্লী মানোনীত করে। ১৮৩১ সালে মহসিন ওয়াকফ সম্পত্তির তহবিলে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ছিল। সরকার ইমামবারা ও একজন মুতাওয়াল্লীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করে এবং ইহার সুদ হইতে যাহা আয় হইত তাহা শিক্ষা কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে। জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি এই ফান্ডের টাকায় হুগলীতে একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করে। প্রস্তাব করা হয় যে, কলেজের দুইটি বিভাগ থাকিবে, ইংরাজী বিভাগ ও আরবী-ফার্সী বিভাগ;কলেজে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র ভর্তি হইতে পারিবে এবং ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে।[৬২] কলেজ স্থাপনের কাজে ১,৪০,০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হয়। ইহার বাৎসরিক ব্যয়ের জন্য ৫৪,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়। ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজে ক্লাস আরম্ভ হয়। দুই বৎসর পর কলেজের সহিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। হুগলী কলেজ, ইংরাজী স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলে প্রথম হইতেই হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা বেশী হয়। কলেজে ও স্কুলের ইংরাজী শিক্ষা মুসলমানদের উপযোগী ছিল না। তাহা ছাড়া গরীব মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে বেতন দেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। ইহাতে মুসলমানগণ মহসিনের দান-সম্পত্তি হইতে উপকার পায় নাই। সরকার কর্তৃক মহসিন ফাণ্ডের অপব্যবহারের সমালোচনা করিয়া হান্টার লিখিয়াছেন "এই আত্মসাতের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা বড়ই কষ্টদায়ক, কারণ এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।"[৬৩]

১৮৩৪ সালে সরকার এই সম্পত্তি বাযয়াফত করে এবং ইহার জন্য বার্ষিক ১৪১৭ টাকা ধার্য করে। ইহার কয়েক বৎসরের রাজস্বের আয় সরকারের তহবিলে জমা হয়।

www.bjilibrary.com

১৮৪০ সালে সরকার এই ফান্ডের টাকা এবং দান সম্পত্তির বাৎসরিক আয় একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করে। এই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষক হিন্দু ছিল। যদিও ভূসম্পত্তি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য করা হইয়াছিল, তবু এই বিদ্যালয়ে দরিদ্র মুসলমান ছাত্রগণ শিক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ আর্থিক সুবিধা পায় নাই।[৬৪]

সরকার মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইংরাজী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে নাই। ১৮২৯ সালে যখন কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবী-ফার্সী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয় তখন মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ইহার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। প্রতি বৎসর ইংরাজী ক্লাসে ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাদ্রাসায় যোগ্য ইংরাজী শিক্ষকের অভাব ছিল। ইহার ফলে ইংরাজীর মান খুবই প্রাথমিক স্তরের হয়। ১৮৫০-৫১ সালের একটি তদন্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, কলিকাতা মাদ্রাসার ৯০ জন ইংরাজীর ছাত্রের জন্য মাত্র একজন ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া গোলডস্মিথ, ওয়াট্‌স, ইউক্লিড প্রভৃতি বিষয় পড়াইতেন। ইউড্রো লিখিয়াছেন, "মাদ্রাসার ইংরাজী শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছাত্রগণ যেটুকু উন্নতি করিয়াছে তাহা তাহাদের আগ্রহ ও অধ্যবসায় এবং শিক্ষকের ধৈর্য ও পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হইয়াছে।"[৬৫] ইহার পরেও মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার সুব্যবস্থা হয় নাই। সরকারী জিলাস্কুলগুলিতে আরবী-ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষাপরিষদ উপলব্ধি করে যে, ইংরাজী শিক্ষার সহিত আরবী-ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইব। কিন্তু এই বিষয়ে বহুদিন পর্যন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই।[৬৬]

১৮৫৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়। ইংরাজী আরবী ক্লাসের স্থলে একটি ইংরাজী-ফার্সী বিভাগ খোলা হয়। ইংরাজী ও ফার্সী ছাড়াও মাদ্রাসায় উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। নিম্নমান পর্যন্ত ইংরাজী বাধ্যতামূলক করা হয়। ইহার পর যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি করার এবং যাহারা আরবী শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল তাহাদের মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। শিক্ষা পরিষদ কলিকাতার মুসলমান অধ্যুষিত কলিঙ্গা অঞ্চলে একটি শাখা বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই ব্যবস্থার ফলে কলিকাতার মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা হয়।[৬৭] কিন্তু কলেজ ও স্কুলগুলিতে আরবী ও ফার্সীর শিক্ষার বাবস্থা ছিল না। এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ক্রমাগত দাবীর ফলে ১৮৫৫ সালে ঢাকায় ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মিশনারী স্কুল ও কলেজের পাঠ্যতালিকা মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় নাই। হিন্দুদের পরিচালিত স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের ভর্তির সুযোগ খুব কম ছিল। বাংলা বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যতালিকা মুসলমানদের শিক্ষার উপযোগী না হওয়ায় তাহারা সেখানে ভর্তি হইতে উৎসাহ পাইত না। বিদ্যালয়গুলিতে যে সংস্কৃত উদ্ভূত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে খুব কঠিন হইয়া পড়িত, কারণ তাহারা কথ্য ভাষা ব্যবহার করিত। তাহা ছাড়া বাংলা পাঠ্যপুস্তক দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনীতে পূর্ণ ছিল।[৬৮]

www.bjilibrary.com

শিক্ষা–পদ্ধতির গলদ : বৃটিশ সরকার বাংলাদেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করে তাহা মুসলমানদের প্রয়োজনীয় উপযোগী হয় নাই। এই সম্বন্ধে ই সি. বেইলী বলিয়াছেন, "শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ ছিল। ইহা প্রবর্তন করিবার সময় তাহাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করা হয় নাই এবং তাহাদের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য করা হয় নাই। এই জন্য শিক্ষাপদ্ধতি তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতিকূল হইয়া পড়ে।"[৬৯] বেইলী মন্তব্য করিয়াছেন, "সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের জনশিক্ষা পদ্ধতি তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের প্রবল মানসিক বৃত্তি উপেক্ষা করিয়াছে।" তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা মুসলমানদের মনঃপূত হয় নাই এবং হিন্দু শিক্ষক ও তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। তাহা ছাড়া গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা মুসলমান ছাত্রদিগকে সামাজিক জীবনে শ্রদ্ধার আসন পাইতে ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করিতে সাহায্য করিত না। জিলা স্কুলগুলিতেও আরবী-ফার্সী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। জনশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান ছিল না। মুসলমানগণ সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিত।[৭০]

ছাত্রদের নিকট হইতে কড়াকড়িভাবে বেতন আদায় করা হইত। পাঠ্য পুস্তক ব্যয়সাধ্য ছিল। আর্থিক অসঙ্গতির দরুন মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ার খরচ বহন করা কঠিন ছিল। সরকারের পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন লোকগণই লেখাপড়া করিতে পারিত। ইন্সপেক্টর লজের মন্তব্য হইতে এই নীতি প্রকাশ পায়। তিনি বলিয়াছেন, "যদি কোন দেশীয় লোক এইরূপ দরিদ্র যে, সে মাসে চার আনা বেতন দিতে পারে না, তাহা হইলে তাহার পক্ষে মজুরী করিয়া জীবন ধারণ করা ও তাহার পিতার পেশা বজায় রাখা উচিত। তাহার পক্ষে জীবন ব্যাপী অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা এবং অন্যের সাহায্যে অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করা উচিত হইবে না।" কোন বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির ছাত্র বেতন কমাইয়া দিয়াছিল। ইহার সমালোচনা করিয়া সরকারী মন্তব্যে লিখা হয়, "নিঃস্ব লোকের ও মজুরদের উপকারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। যে সকল লোক তাহাদের অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে উপকার পাইতে পারে তাহাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেবলমাত্র সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের শিক্ষা নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য"।[৭১]

শিক্ষার ব্যাপারে সরকার যে আর্থিক সাহায্য করিত তাহাতে মুসলমানদের উপকার হইত না। স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। ইহার জন্য একটি শর্ত ছিল। স্থানীয় লোকগণ নিজেদের সামর্থে স্কুল স্থাপন করিতে পারিলে ইহার জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হইত।[৭২] সঙ্গতিহীন মুসলমানদের পক্ষে এই শর্ত পূরণ করা সম্ভব ছিল না। অবস্থাপন্ন হিন্দুগণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকারী সাহায্যের সুবিধা লাভ করে। বৃত্তির ব্যাপারেও মুসলমানগণ ভাল ইংরাজী জ্ঞানের অভাবে হিন্দু ছাত্রদের সহিত

www.bjilibrary.com

প্রতিযোগিতায় সফল হইতে পারিত না এবং বৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত না। তাহা ছাড়া, বৃটিশ সরকারের শিক্ষা নীতি Filtration মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়। রাজধানী ও জিলা শহরগুলির অবস্থাপন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সরকার মনে করিত যে, উচ্চ শ্রেণীর লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তাহারা পরে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার করিবে। এই নীতির ফলে অধিকাংশ স্কুল ও কলেজ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল। তাহারা সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে উপকার পায় নাই। কোন কোন শহরে জিলা স্কুল খোলা হয়। এই সকল শহরে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা কম ছিল। শহরের স্কুলে শিক্ষালাভ করা গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার শিক্ষার প্রতি সরকার উদাসীন ছিল। এইজন্য অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ শিক্ষার সুযোগ পায় নাই।

বাংলাদেশে যে কয়জন মুসলমান জমিদার ছিলেন তাহাদের দুই একজন ব্যতীত সকলের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। আর্থিক অসঙ্গতির দরুন তাহারা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে পারেন নাই। হিন্দু জমিদারগণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ববাংলার কোন কোন হিন্দু জমিদার তাঁহাদের জমিদারীতে স্কুল স্থাপন না করিয়া পশ্চিম বাংলার হিন্দু এলাকায় স্কুল স্থাপন করেন। ঠাকুর পরিবার এবং আরও অনেক হিন্দু জমিদারের পূর্ববাংলায় জমিদারী ছিল। তাঁহারা কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলায় বাস করিতেন এবং সেখানকার লোকের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহারা পূর্ববাংলায় নিজেদের জমিদারীর প্রজাদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করেন নাই কোন কোন জমিদার প্রজাদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে, প্রজাগণ শিক্ষিত হইলে জমিদারীতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হইয়া পড়িবে।[৭৩]

নানা কারণে মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছনে পড়িয়া যায়। ১৮৪১ সালে বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজে মোট ৪০৩৪ জন ছাত্র ছিল; ইহাদের মধ্যে ৩১৮৮ জন হিন্দু ও ৭৫১ জন মুসলমান ছিল। মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ কলিকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। এই সময় পূর্ববাংলায় কোন কলেজ ছিল না। ১৮৪৬ সালে মোট ৪৫৩৭ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৮৪৬ জন হিন্দু ও ৬০৬ জন মুসলমান ছিল; মুসলমান ছাত্রদের ২২৪ জন কলিকাতা মাদ্রাসার ও ২২২ জন হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। এই বৎসর ঢাকা কলেজ ও স্কুলে ২৬৩ জন হিন্দু ও ১৮ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ১৮৫০-৫১ সালে ৪৬৭৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৮১৪ জন হিন্দু ও ৭৯৬ জন মুসলমান ছিল। মুসলমান ছাত্রদের ৪৩৩ জন কলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৪৫ জন হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। হুগলী কলেজে ৩৮৯ জন হিন্দু ও ৬জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ঢাকা কলেজ ও স্কুলের মোট ৩৮৩ জন ছাত্রের মধ্যে ২৯ জন মুসলমান ছিল। ১৮৫৫-৫৬ সালে মোট ৭২১৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৩১ জন মুসলমান ছিল। ইহাদের ১৮৫ জন কলিকাতার মাদ্রাসায়, ১৭৫ জন হুগলী মাদ্রাসায় ও ৭জন হুগলী কলেজে ছিল। ঢাকা কলেজ ও স্কুলের মোট

www.bjilibrary.com

৭৫৫জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২৪ জন মুসলমান ছিল। ১৮৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিন্দুদের ৯জন এম, এ, ৪১জন বি, এ, ও ১৭ জন আইন ডিগ্রী লাভ করে। এই বৎসর মাত্র ১জন মুসলমান বি, এ, ডিগ্রী পায়। যে সকল ছাত্র মেডিকেল ডিগ্রী পায় তাহাদের সকলেই হিন্দু ছিল। ১৮৬৭ সালে মোট ৮৮জন হিন্দু ছাত্র বি,এ, ও এম, এ, ডিগ্রী লাভ করে। কোন মুসলমান এই বৎসর বি, এ, বা এম, এ, ডিগ্রী পায় নাই।[৭৪]

১৮৫৮ হইতে ১৮৭৭ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রকৌশল শিক্ষায় ৩১৫৫ জন হিন্দু ও ৫৭ জন মুসলমান ডিগ্রী পায়। ডিগ্রীধারী মুসলমানদের ৩০ জন বি,এ, ও ৫ জন এম, এ, ডিগ্রীধারী ছিল।[৭৫] বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৯৩ পর্যন্ত যে সকল মুসলমান ডিগ্রী পায় তাহাদের সংখ্যা ছিল : কলিকাতা ২৯০, মদ্রাজ ২৯, বোম্বাই ৩০, পাঞ্জাব ১০২ ও এলাহাবাদ ১০২।[৭৬] ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আলীগড় কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৭ পর্যন্ত আলীগড় কলেজ হইতে ১০জন ছাত্র ডিগ্রী লাভ করে। ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৩ সালের মধ্যে আলীগড় কলেজ হইতে খুব কম সংখ্যক ছাত্র ডিগ্রী পায়।[৭৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলার লোকের শিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। পূর্ববাংলায় অল্প কয়েকটি স্কুল ও কলেজ ছিল। সব স্কুল ও কলেজ, রাজধানী কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠে কেন্দ্রীভূত ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে যখন ঢাকা শহরকে রাজধানী করিয়া পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয় তখন এই অঞ্চলের শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা হয়। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহ এই নতুন প্রদেশে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন।[৭৮] পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার বেমফিল্ড ফুলার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।[৭৯] কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ইহার ফলে পূর্ববাংলা আসামের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। এই অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। নবগঠিত প্রদেশে তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় তাহারা উন্নতির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। মুসলমানগণ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। তাহাদেরকে সান্ত্বনা দিবার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারী ঢাকায় আসেন। এই সময় ঢাকার নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট বুঝিতে পারেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় মুসলমানদের খুব ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। ২রা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ করা হয়।[৮০]

www.bjilibrary.com

হিন্দু সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন সংকুচিত হইয়া যাইবে। তাঁহারা শহরে শহরে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং প্রস্তাব পাশ করিয়া ভারত সচিব, ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করন।[৮১] ডঃ সারবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশ কৃষক; বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলে তাহাদের কোন উপকার হইবে না।[৮২] প্রতিনিধিদলের বক্তব্যের উত্তরে বড়লাট জানান যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার আঞ্চলিক গণ্ডি বাংলার নূতন গভর্ণর কারমাইকেল কার্যভার গ্রহণ করার পর নির্ধরিত হইবে।[৮৩] ইহার পর ২৮শে মার্চ কলিকাতায় এক বিরাট জনসভায় হিন্দু নেতাগণ দাবী করেন যে, যদি একান্তই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ইহা শুধু আবাসিক হইবে।[৮৪] মুসলমান নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভারত সরকার ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৭শে মে বাংলাদেশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গ্রহণ করে। রবার্ট নাথন, বার এট, ল, এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটি নাথন কমিটি নামে পরিচিত। নাথন কমিটি ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, ইসলামিক বিষয়, আইন, প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ২২, ৯৮, ৭১৬ টাকা ব্যয় হইবে। নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা মুহম্মদ আলী ও শামস-উল-ওলামা আবু নসর ওয়াহিদ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁহারা ঢাকায় আঞ্চলিক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৮৫] গভর্ণমেন্ট অর্থ বরাদ্দ না করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজে বিলম্ব হয়। ইহার পর মহাযুদ্ধের দরুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়।

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। মাইকেল সেডলার ইহার সভাপতি ছিলেন। এইজন্য ইহা সেডলার কমিশন নামে পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ক্ষমতাও সেডলার কমিশনকে দেওয়া হয়।[৮৬] এই কমিশন সুপারিশ করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহা লাঘবের জন্য ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।[৮৭] সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হয় এবং ১৯২০ সালের ইহা আইনে পরিণত হয়। এই আইনের বলে ঢাকা আবাসিক

www.bjilibrary.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা কলেজ ও পূর্বেকার প্রাদেশিক সরকারের দালানগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন করা হয়। ফিলিপ জে, হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ছাত্রদের আবাসের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ সালের ২২ শে আগস্ট সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

শুরু হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা বেশি হয়। ক্রমশ মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ সাল হইতে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। তখন হইতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলে এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার ফলে ঢাকা পূর্ববাংলার শিক্ষা ও সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। ঢাকায় কয়েকটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং শিখা নামক একটা বার্ষিক পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। মুসলিম ভাবধারা প্রচলন করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ বলিয়াছিলেন, "হিন্দু সাহিত্য বেদান্ত, গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও জীবনের কথায় ভরপুর। কুরআন হাদীস, মুসলমানদের ইতিহাস ও জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে জানিতে পারিবে। পরিচয় ও জানাজানি হইলে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।"[৮৮]

বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান : বৃটিশ শাসনের ফলে বাংলাদেশের কয়েকটি উপকার হয়। এদেশে ইংরেজী ও পাশ্চত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলিত হয়। এদেশবাসী পাশ্চাত্যের নূতন জ্ঞান ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা জাগরিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সঞ্চার হয়। ইহার ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম হয় এবং সাময়িকী ও সংবাদপত্র প্রকাশ পায়। গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের এক নব যুগের সৃষ্টি হয় এবং ইহার বিরাট সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত হয়।

খ্রীস্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের বাহন রূপে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়। বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টের বাণী প্রচারের সুবিধার জন্য তাঁহারা কথ্য ভাষায় পুস্তিকা রচনা করেন। কথ্য ভাষায় রচিত এই পুস্তিকাগুলি হইতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সম্ভাবনার পথ সূচিত হয় উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দু পন্ডিতদের চেষ্টায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। ইংরাজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য তাঁহারা বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করেন। ১৮০১ সালে রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও কেরী সাহেব 'কথোপকথন' প্রণয়ন করেন। ইহার পরে আরও যে কয়খানি গদ্য গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলির মধ্যে রামরামবসুর 'লিপিমালা' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

www.bjilibrary.com

'বত্রিশ সিংহাসন' কেরী সাহেবের 'হিতোপদেশ' রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের ম'হারাজা কৃষ্ণচন্দ্ররাজস্য' এবং হরপ্রসাদ রায় কর্তৃক বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষার গদ্য অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে বাইবেল বাংলা গদ্যে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রচলিত বাংলা গদ্যের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বাংলা গদ্য সাহিত্যের সেবা করেন এবং ইহাকে সংস্কৃতের ছাচে ও হিন্দু কৃষ্টির ধারায় পরিচালিত করেন।[৮৯]

মুসলমানদের শাসনকালে মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য মূল্যবান গ্রন্থ দান করিয়াছিল। তাহারা বাংলা ভাষায় বহু পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। বৃটিশ শাসনকালেও বাংলা পদ্য সাহিত্যে তাহাদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহারা হিন্দুদের অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানেরা যাহারা আশরাফ বলিয়া পরিচিত ছিলেন ও শহরে বাস করিতেন তাঁহারা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষার চোখে দেখিতেন। তাঁহারা উর্দু ভাষায় কথা বলিতেন এবং ইহা নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের উর্দু প্রীতির উল্লেখ করিয়া এডাম মন্তব্য করিয়াছেন, বাংলা ও বিহারের শিক্ষিত মুসলমানগণ এখন উর্দুভাষায় কথা বলে এবং ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রদেশগুলিতে এবং আমার মনে হয়, সমগ্র ভারতে এই শ্রেণীর লোকদের কথ্য ভাষা স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয় না।[৯০] নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। তাঁহারাও উর্দু ভাষাকে অভিজাত শ্রেণী মুসলমানদের মাতৃভাষা বলিয়া মনে করিতেন এবং বাংলা ভাষাকে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য উর্দু ও সাধারণ লোকের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা দাবী করেন।[৯১] আশরাফগণ প্রচার করিতেন যে, উর্দু মুসলমানদের ভাষা, বাংলা মুসলমানদের ভাষা নয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে উর্দু ভাষাভাষীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭৮০০০০, অন্যদিকে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২,২২,৪৫০০০।[৯২]

মুসলমান জনসাধারণ বাংলা ভাষায় কথা বলিত। মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং আরও কোন কোন অঞ্চলের মুসলমানেরা খোট্টা ভাষায় কথা বলিত। উর্দু ও হিন্দী ভাষার সহিত বাংলা কথ্য ভাষা মিশ্রিত হইয়া খোট্টা ভাষার সৃষ্টি হয়। উত্তর পশ্চিম বাংলায় খোট্টা ভাষায় লিখিত এক প্রকার বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। খোট্টা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি বটতলার পুথি নামে পরিচিত।

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কথ্য ভাষায় দোভাষী বাংলা প্রচলিত ছিল। ইহা পাতোয়া (Patois) নামে অভিহিত। বাংলা কথ্য ভাষার সহিত অপভ্রংশ আরবী ফার্সী শব্দ মিশ্রিত হইয়া পাতোয়া ভাষায় সৃষ্টি হয়। সাধারণ মুসলমানদের বিকৃত উচ্চারণের দরুন আরবী ও ফার্সী শব্দের অপভ্রংশে প্রচলিত হয়। এই কথ্য ভাষা সম্বন্ধে হান্টার বলিয়াছেন, "আজ পর্যন্ত বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক সমাজ মুসলমান। নিম্নবঙ্গে ইসলাম এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে ইহা এক স্বকীয় ধর্মীয় সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার

www.bjilibrary.com

উদ্ভব ঘটাইয়াছে। হিরাতের ফার্সী ভাষা হইতে উত্তর ভারতীয় উর্দু যতখানি পৃথক মুসলমান বাংলা নামে পরিচিত এই উপভাষা উর্দু হইতে ততখানি পৃথক।৯৩ পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার যে অঞ্চলে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রভাব পড়িয়াছিল। দোভাষী বাংলা সে অঞ্চলের মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিল। কয়েকজন মুসলমান কবি এই দোভাষী বাংলায় ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলি দোভাষী পুথি নামে অভিহিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা গদ্য সাহিত্যে একটি শক্তিশালী হিন্দু কৃষ্টির ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৯৬) প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এই সময় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মুসলমানগণ বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রতি মনোযোগ দেন এবং তাঁহারা বাংলা গদ্য সাহিত্যে একটি মুসলিম কৃষ্টির ধারা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪০-১৯১১) বাংলা গদ্য সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের অগ্রণী ছিলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার বেশি সুযোগ পান নাই, কিন্তু অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রথম গদ্য গ্রন্থ 'রত্নাবতী' ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' প্রকাশ পায়। বিষাদসিন্ধু মোশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রায় ৩০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জানা যায়।[৮৪] তিনি 'আজিজুন নেহার' নামে একখানি পাক্ষিক সাময়িক পত্র বাহির করেন। মোশাররফ হোসেন বাংলা গদ্য সাহিত্যে মুসলিম কৃষ্টির ধারা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার রচনায় মুসলমান জাতির প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কাহিনী প্রচার করেন। অন্যান্য মুসলমান লেখকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। মোশাররফ হোসেনের সময় হইতে মুসলমান লেখকদের মধ্যে নব বাংলা সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি হয়।

মোশাররফ হোসেনের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে মৌলবী নইম উদ্দিন (১৮৩২-১৯১০),মৌলবী রিয়াজউদ্দীন আহমদ ও শেখ আব্দুর রহীমের (১৮৫৯-১৯৩১) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা বাংলা গদ্য সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেন। মুন্সী রিয়াজউদ্দীনের রচিত ইসলামতত্ত্ব (১৮৮৮) এবং শেখ আবদুর রহীম প্রণীত 'হযরত মুহাম্মদের জীবন রচিত ও ধর্মনীতি' ইসলাম ধর্ম ও কৃষ্টির খুব মূল্যবান গ্রন্থ। এই সময় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন মুহম্মদ কাজিম আল কুরেশী (১৮৫৮-১৯৫১)। তিনি কায়কোবাদ নামে সুপরিচিত। কায়কোবাদ বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 'মহাশ্মশান কাব্য' বাংলা সাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৯) কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবি হিসাবে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।[৯৫]

মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের (১৮৬৯-১৯৫৩) নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ১৫০ জন মুসলমান কবি ও গ্রন্থকারের রচিত প্রায় দুই হাজার বাংলা পুস্তকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার

www.bjilibrary.com

করেন। এই সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে তিনি বিভোর হইয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার গবেষণা ও সম্পাদনার কাজ হইতে প্রকাশ পায় যে, মুসলমান আমলে মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান দান করিয়াছিল। তিনি 'প্রাচীন পুথির বিবরণ' ও কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তিনি ডঃ এনামুল হকের সহযোগিতায় 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানি রচনা করেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) এবং মুন্সী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) মুসলিম ঐতিহ্যের শক্তিশালী লেখক ছিলেন।

মুসলিম ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭০-১৯৩১) তিনি সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। সিরাজী ভারতীয় আজাদী সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন এবং সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়া মুসলমানদেরকে নিজেদের অতীত কৃষ্টি সম্বন্ধে সজাগ করেন। এবং তাহাদেরকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁহার 'অনল প্রবাহ' কাব্যে (১৯৩০) মুসলমানদেরকে তাহাদের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অনল বর্ষণ করেন। সরকার অনল প্রবাহ বাযয়াফত করে। চোখ গেল, অতীত কাহিনী প্রভৃতি কবিতায় তিনি মুসলিম ঐতিহ্যের কাহিনী প্রচার করেন এবং মুসলমানদের অবনতির জন্য বেদনা প্রকাশ করেন ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের সময় সিরাজী তুরস্কের বিপদে দুঃখ অনুভব করেন এবং সেখানের মুসলমানদের সেবার জন্য তিনি ডঃ আহমদ আনসারীর সহিত তুরস্কে যান। তিনি দুই বৎসর তুরস্কে সেবাকার্য করেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী সামাজিক' ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিষয়ে বহু পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন।[৯৬]

মৌলবী ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), ডঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৭-১৯৩৬) ও ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬) বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্ব অর্জন করেন। নজিবুর রহমান (১৮৭৮-১৯৩৫) সামাজিক ইতিহাস রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'আনোয়ারা' ও 'প্রেমের সমাধি' সামাজিক উপন্যাসদ্বয় মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়। এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ রচনার মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্য প্রকাশ পাইয়াছে। কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৭) সাহিত্যিক রূপে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার লিখিত সামাজিক উপন্যাস 'আবদুল্লাহ' বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), ফজলুর রহীম (১৮৯০-১৯৩৩), ইকরামউদ্দীন (১৮৮২-১৯৩৫), শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস (১৮৯৫-১৯৪৫), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মুস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মাওলানা আকরম খান (১৮৬৯-১৯৬৮), জসীমউদ্দীন (১৯০২-১৯৭৬), ডঃ এনামুল হক প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবির প্রতিভায় মুসলিম বাংলা সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

www.bjilibrary.com

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৬-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও শক্তিশালী লেখকরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার জীবন বিবিধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি আর্থিক বিপর্যয়ের দরুন স্কুল ত্যাগ করিয়া সৈন্য দলে যোগ দিতে বাধ্য হন। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই নজরুল বাংলা সাহিত্যে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করেন। তাঁহার কবিতায় ও রচনায় বিপ্লবের ও বিদ্রোহের বলিষ্ঠ সুর ধ্বনিত হয় এবং মুক্ত ও সাম্যের মন্ত্র বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়। তাঁহার ভাবের প্রেরণায় যুবক ও শিক্ষিতদের মধ্যে অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার হয়। তাঁহার গানের সুরের মূর্ছনায় বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া ওঠে। নজরুলের সাহিত্য জীবন দুইটি মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালের (১৯১৭-১৯৪১) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধের বিভীষিকা, মানুষের দুঃখ দুর্দশা, সমাজ জীবনে বৈষম্য ও অবিচার তাঁহার মনে আঘাত দেয়। সে যুগের বৈপ্লবিক ও স্বাধীনতা আন্দোলন তাহার মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাঁহার কবিতায় ও লেখায় মানুষের মুক্তির বাণী মূর্ত হইয়া উঠে তাঁহার বিদ্রোহী ও অন্যান্য কাব্যে সামাজিক অসাম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং অবহেলিত ও অত্যাচারিত মানুষের মনে ব্যক্তিসত্তা ও আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করে। নজরুল চির বিদ্রোহী ছিলেন। তাঁহার লেখা দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে।

নজরুল ইসলামের প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তিনি বাংলা ভাষায় নূতন মুসলিম সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁহার রচিত ফাতেহা ই-দোয়াজ দহম, খালিদ কোরবানী, চীরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ প্রভৃতি কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য নূতন রূপ লাভ করে এবং তাঁহার গজল কবিতায় ইসলামী ভাবধারা প্রকাশ পায়। আরবী ও ফার্সী সাহিত্য হইতে ভাবধারা গ্রহণ করিয়া নজরুল বাংলা সাহিত্যে ইসলামী পরিবেশের সৃষ্টি করেন। তাঁহার রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাহাদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেন। নজরুল বহুমুখী প্রতিভা লইয়া বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। তাঁহার দানে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের গৌরবময় আসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহাদের অনুসরণের জন্য একটি উজ্জ্বল ধারা সৃষ্টি হয়।[৯৭]

নজরুলের সাহিত্যিক প্রতিভা পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে সমভাবে বিকাশ লাভ। করে। নজরুল একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি, সুরশিল্পী, সংগীত রচয়িতা, ভাবপ্রবণ, ঔপন্যাসিক, গাল্পিক ও নাট্যকার। তাঁহার প্রথম কাব্য অগ্নিবীণা ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য মরুভাস্কর। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলনচাপা ফণিমনসা, ভাঙ্গার গান, ছায়ানট, সর্বহারা, সাম্যবাদী, চিত্তহারা, সিন্ধুহিল্লোল, চোখের চাতক, চক্রবাক, জিঞ্জীর, ঝিঙেফুল সন্ধ্যা, চন্দ্র বিন্দু, নতুন চাঁদ প্রভৃতি খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। নজরুল কুরআন শরীফের আমপারার বাংলা পদ্যানুবাদ করেন এবং কবি হাফিজের রুবাইয়াৎ ই-হাফিজের বাংলা কাব্যানুবাদ করেন। তাঁহার উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা, বাধনহারা ও

www.bjilibrary.com

কুহেলিকা এবং নাটক আলেয়া, ঝিলিমিলি, প্রভৃতি তাহার অসামান্য গদ্য কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিতেছে এবং বাংলা সাহিত্যের জন্য নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে।[৯৮] নজরুল ইসলাম মাত্র দুই দশকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ১৯৪১ সালের পর হইতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে এই তেজস্বী কবির প্রতিভা স্তব্ধ হইয়াছিলো।

সংবাদপত্র ও সাময়িকী : উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সূত্রপাত হয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতিতে ইহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উইলিয়ম কেরীর সমাচার দর্পণ (১৮০০), রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মণ সেবাধি (১৮২১) ও সমবাদ কৌমুদী (১৮২৯), ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্বাদ প্রভাকর (১৮২২) অগ্রণী ছিল। ইহার পর বাংলা ভাষায় বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকীর জন্ম হয়।

মুসলমানগণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাংবাদিকতা শুরু করে। মীর মোশাররফ হোসেন প্রথম হুগলীতে 'আজিজুন নেহার' নামে একখানি সাময়িক পত্র বাহির করেন। ১৮৯০ সালে তিনি কুষ্টিয়ায় 'হিতকরী' নামে আর একখানি সাময়িকী প্রকাশ করেন। উভয় সাময়িকী অল্প দিনের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। মৌলবী নইমউদ্দীনের সম্পাদনায় ১৮৮৩ সালে করটিয়ায় আখবার-ই-ইসলামিয়া নামক একখানি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় আবদুল হামিদ খাঁর সম্পাদনায় টাঙ্গাইলে আহমদী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়।[৯৯] মুনশী রিয়াজউদ্দীন ও শেখ আবদুর রহীমের সম্পাদনায় ১৮৮৯ সালে সুধাকর নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইসলাম প্রচার এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। সুধাকর পরে মিহির নামক মাসিক পত্রিকার সহিত এক হইয়া যায়। মিহিরের প্রকাশনা ১৮৮৯ সালে আরম্ভ হয়। এই বৎসর ইসলাম প্রচারক ও হাফিজ নামে আরও দুইটি মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। মুনশী রিয়াজউদ্দীন ও শেখ আবদুর রহীম ইহাদের সম্পাদক ছিলেন। শেখ আবদুর রহীম মুসলিম হিতৈষী নামে অন্য একখানি পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।[১০০]

মুসলিম ঐতিহ্য প্রচার করা ও মুসলমান সমাজ পুনর্জীবিত করা এই সাময়িক পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য ছিল। মিহির পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে যে, মুসলিম ঐতিহ্য ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবগত করা ইহার উদ্দেশ্য। বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধের মাধ্যমে মিহির এই দায়িত্ব বহন করিয়াছে। প্রজার উপর জমিদারের দৌরাত্ম্য, জমিদারদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় মিহির পত্রিকা হইতে জানা যায়। মুসলমানদেরকে পুনর্জাগরিত করা হাফিজ পত্রিকার ব্রত ছিল। মুসলমান সমাজ সংস্কার করিয়া ইহাকে মুসলিম ঐতিহ্যের আদর্শে সুনিয়ন্ত্রিত করা ইসলাম প্রচারক পত্রিকার লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকায় ইসলামের ইতিহাস ও শিক্ষা সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধে ইসলামের আদর্শ ও মুসলমানদের শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। পত্রিকাটি গভর্ণমেন্টের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে এবং ইরেজী শিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা দাবী করে। ইহা সমাজে অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের

www.bjilibrary.com

ভূমিকার প্রতি কটাক্ষপাত করে। ইসলাম প্রচারক ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করে এবং কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া মত প্রকাশ করে। সুধাকর, মিহির ও ইসলাম প্রচারক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে কোহিনুর নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলকাতায় পাকাশ পায়। ১৮৯০ সালে রাজশাহীতে আঞ্জুমানে হিমায়াতুল ইসলাম নামে একটি সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির মুখপত্র নূর-উল ইসলাম পত্রিকা মির্যা ইয়ুসুফ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার উদ্যোগে ১৯০৩ সালে কলিকাতায় সুলতান নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালে কলিকাতায় প্রকাশিত আল ইসলাম মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন।[১০১] বর্তমান শতব্দীর প্রারম্ভে নবনূর, মোহম্মদী, হানাফী, মোসলেম, মুসলিম হিতৈষী, ধূমকেতু, নবযুগ, লাঙ্গল, খাদেম এবং সওগাত নামে আরও কয়েকটি পাত্রিকার আবির্ভাব হয়। সৈয়দ ইমদাদুল হক, মনিরুজ্জামান, মৌলবী মুজিবর রহমান, মুজাফফর আহমদ নজরুল ইসলাম, ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ প্রভৃতি সাংবাদিকগণ এই সাময়িক পত্রিকাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১০২]

১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সম্পাদক মাওলানা আকরম খাঁর উদ্যোগে ও সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে দৈনিক আজাদ পত্রিকা বাহির হয়। আজাদের পূর্বে মুসলমানদের প্রকাশিত 'দৈনিক সোলতান, দৈনিক আমীর, বঙ্গনূর ও তকবির নামে দৈনিক পত্রিকা বাহির হয় কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। বাংলাদেশে মুসলিম ঐতিহ্য ও জাতীয়তা প্রচারের কাজে দৈনিক আজাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথম থেকেই ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়া তুলিতে এবং মুসলিম লীগ আন্দোলন শক্তিশালী করিতে আজাদ বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কলিকাতায় ইংরাজী পত্রিকার সূত্রপাত হয়। মুসলমানদের প্রথম ইংরাজী পত্রিকা সাপ্তাহিক মোহামেডান অবজার্ভার (Muhammedan Observer) ১৮৯০ সালে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ইহার পর মুসলিম ক্রনিকল (Muslim Chronicle) ও মুসলিম স্ট্যাণ্ডার্ড (Muslim Standard) নামে আরও দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়। ১৯০৬ সালে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল 'দি মুসলমান (The Mussalman) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মৌলবী মুজিবর রহমান ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। বাংলার মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণের কাজে এই পত্রিকাগুলির দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.bjilibrary.com

একাদশ অধ্যায়
নবাব আবদুল লতিফ ও মুসলমানদের শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের মুসলমানগণ খুব সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তখন মুসলমান সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে বিচ্যুৎ মুসলমানগণ চাকুরী, জমিদারী ইত্যাদি হারাইয়া বিত্তহীন কৃষকশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। জমিদার ও নীলকরদের পীড়নে প্রজাদের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। বৃটিশ শাসকেরা মুসলমানদেরকে অবিশ্বাসের চোখে দেখিতেছে। মুসলমানগণ ইরাজ শাসন গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা ইংরাজী শিক্ষাও গ্রহণ করে নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে তাহারা বহু পিছনে পড়িয়া আছে। মুসলমানদের এই সংকটের দিনে তাহাদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ নেতার আবির্ভাব হয়। এই নেতার নাম নবাব আবদুল লতিফ। নবাব আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমানদেরকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদেরকে উন্নতির পথে চালিত করিবার জন্য কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান উত্তর ভারতের মুসলমানদের উন্নতির জন্য যেরূপ কাজ করিয়াছেন আবদুল লতিফ বাংলাদেশের মুসলমানদের উন্নতির উদ্দেশ্য সেইরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন।

আবদুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি মাদ্রাসার আরবী শিক্ষার সহিত নিম্নবৃত্তিমান পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ইহার পর আবদুল লতিফ ঢাকা স্কুলে ও কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষাকতা করেন। ১৮৪১ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট নিযুক্ত হয়।[১] তিনি ১৮৬২ সালে বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮০ সালে তিনি নবাব উপাধি লাভ করেন। নবাব আবদুল লতিফ ১৮৮৪ সালে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তাঁহাকে নবাব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে।[২] ১৮৯৩ সালের ১০ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবদুল লতিফ যখন সাতক্ষীরায় ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি সেখানকার কৃষকদের উপর নীলকরদের অত্যাচার দেখিয়া খুবই ব্যথিত হন। তিনি কৃষকদেরকে একতাবদ্ধ হইতে এবং তাহাদের অভিযোগের বিষয় গবর্ণমেন্টকে জানাইতে উপদেশ দেন। তিনি নিজেও নীলকরদের দৌরাত্ম্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাতে নীলকরেরা তাঁহার শত্রুতা শুরু করে এবং তাহাদের প্রভাবে পড়িয়া সরকার তাঁহাকে অন্য জায়গায় বদলী করে।[৩] কিন্তু পরে সরকার বুঝিতে পারে যে, নীলকরেরা কৃষকদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করিতেছে। ১৮৬০ সালে নীলকর কমিশন গঠিত হয় এবং ইহার সুপারিশ ক্রমে নীল চাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা হয়। ইহার ফলে তাহারা নীলকরদের কবল হইতে রক্ষা পায়।

ইংরাজ শাসন গ্রহণ : আবদুল লতিফ বুঝিতে পারেন যে, মুসলমানেরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া আছে এবং তাহাদিগকে উন্নতির পথে চালিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাহাদের শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য তিনি দ্বিবিধ কর্মপন্থা অবলম্বন

www.bjilibrary.com

করেন : (১) তাহাদেরকে বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত করা এবং (২) তাহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করা। জিহাদ আন্দোলন ও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের দরুন ইংরাজ শাসকগণ মুসলমানদিগকে রাজদ্রোহী মনে করিয়াছে এবং তাহাদেরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখিয়াছে। আবদুল লতিফ বুঝিতে পারেন যে, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে মুসলমানরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। বিদ্রোহভাব ত্যাগ করিয়া ইংরাজ শাসন গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে। আবদুল লতিফ নিজে খুব রাজভক্ত ছিলেন। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকিয়া তিনি রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মুসলমানদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তাহারা বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে।

জিহাদ আন্দোলনের প্রচারকেরা প্রচার করেন যে, যতদিন দেশ বৃটিশ শাসনের অধীনে থাকিবে ততদিন ইহা মুসলমানদের জন্য দার-উল-হরব বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহারা ফতুয়া দেন যে, মুসলমানদের মুক্তির জন্য বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। জিহাদ আন্দোলন বন্ধের জন্য আবদুল লতিফ নানাভাবে চেষ্টা করেন। জিহাদ প্রচারকের ফতুয়া যে ভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি বিশিষ্ট আলেমদের ফতুয়া সংগ্রহ করেন। তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে, বৃটিশ শাসনাধীনে ভারত মুসলমানদের জন্য দার-উল-হরব নয় এবং ইহার সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজন নাই। ১৮৭০ সালের ৩০শে নভেম্বর কলিকাতা মুসলিম সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় জৌনপুরের মৌলবী কেরামত আলী এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তিনি তথ্য ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন যে, বৃটিশ ভারতে মুসলমানগণ নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করিতে পারে এবং মুসলিম শাস্ত্রবিদ ও আইনজ্ঞদের রায় অনুযায়ী বৃটিশ ভারত মুসলমানদের জন্য দার-উল-ইসলামের আন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যায়। সমিতির সভাপতি কাজী আবদুল বারী এবং আরও কয়েকজন বক্তা মৌলবী কেরামত আলীর অভিমত সমর্থন করেন।[৪] কাজী আবদুল বারী মক্কার কয়েকজন আলেমের ফতুয়ার উল্লেখ করেন। যে দেশে মুসলমানগণ ধর্মকর্ম করিতে পারে সে দেশকে দার-উল-ইসলাম গণ্য করা যাইতে পারে বলিয়া ফতুয়া দিয়াছিলেন।[৫]

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন : আবদুল লতিফ বুঝিতে পারেন যে, ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হইবে না। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "যদি ভারতে কোন ভাষা শিক্ষার্থীর জীবনকে উন্নত করিতে পারে, তবে তাহা হইল ইংরাজী ভাষা। ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিলে মুসলমানেরা অনেক রাজনৈতিক উপকার পাইবে এবং ইহাতে সরকারও উপকৃত হইবে। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান সরকারের সদিচ্ছা বুঝিতে পারিবে এবং ইংরাজ জাতির শক্তি, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্মকুশলতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। সরকারের প্রতি তাহাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের ভ্রান্ত পথে চলিতে হইবে না এবং কেহ তাহাদেরকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইবে না। তাহারা উপলব্ধি করিবে যে,

www.bjilibrary.com

তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বৃটিশ শাসনের স্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করে এবং তাহারা ষড়যন্ত্রকারীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবে। তাহারা বৃটিশ শাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে।"[৬]

আবদুল লতিফ লক্ষ্য করেন যে, বৃটিশ সরকার ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য করিতে চেষ্টা করে নাই। তিনি মনে করেন যে, ইংরাজী শিক্ষার সহিত পাশাপাশি আরবী-ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মুসলমানগণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবে না। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে একদিকে তাহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন করিবে এবং অন্য দিকে তাহারা নিজেদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে। আবদুল লতিফ লিখিয়াছন, মুসলমানদের অনেক পরিবার ছিল যাহাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমান সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করে নাই।" শিক্ষা- পদ্ধতি যাহাতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয়বিধ প্রয়োজন মিটাতে পারে সেইজন্য আবদুল লতিফ নানাভাবে চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারে সরকারও তাঁহার কাজের প্রশংসা করিয়াছে।[৭]

আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং সবোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহার বিষয় ছিল: ভারতীয় মুসলমান যুবকদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা এবং ইহার জন্য গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের সকল স্থানের শিক্ষিত মুসলমানদের মতামত জানিবার জন্য তিনি ফার্সী ভাষায় প্রবন্ধ আহবান করেন। বহু মুসলমান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বোম্বাইর স্যার জামশেদজী জিজিবাই স্কুলের শিক্ষক মৌলবী আবদুল প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ লেখক ইংরাজী শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। কয়েকজন ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতা করেন এবং পুরস্কার দাতাকে ইসলামের শত্রু বলিয়া অভিযুক্ত করেন।[৮]

আবদুল লতিফ কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার মান খুবই নিম্নস্তরের ছিল; ইংরাজী বিভাগের জন্য মাত্র একজন শিক্ষক ছিল। ১৮৫২ সালে সরকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, আরবী ও ইংরাজী শিক্ষা একত্রে চলিতে পারে না।[৯] কলিকাতা মাদ্রাসার বিষয় তদন্তের জন্য ১৮৫৩ সালে বেথুন এফ. হেলিডের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। আবদুল লতিফ মাদ্রাসার উন্নতির ব্যাপারে তদন্ত কমিটি ও সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান। তদন্ত কমিটি মাদ্রাসায় ইংরাজী-ফার্সী বিভাগ স্থাপনের সুপারিশ করে। ১৮৫৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী-ফার্সী বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার মুসলিম অধ্যুষিত কলিঙ্গা অঞ্চলে একটি শাখা স্কুল স্থাপিত হয়।[১০] আবদুল লতিফ গভর্ণমেন্টের নিকট মুসলমানের জন্য উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী করেন। ইহার ফলে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে

www.bjilibrary.com

রূপান্তরিত হয় এবং এই কলেজে সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ছাত্রদেরকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।[১১]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রগণ সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া বাংলার ছোটলাট স্যার এফ, হেলিডে সন্দেহ করেন এবং তিনি এই মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বড়লাট বিদ্রোহের সময় আবদুল লতিফ ও মাদ্রাসার অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রদের রাজভক্তির যে পরিচয় পান তাহাতে তাঁহার ধারণা হয় যে, বিদ্রোহীদের সহিত মাদ্রাসার ছাত্রদের কোন যোগাযোগ নাই। তিনি অনর্থক মুসলমানদের মনে আঘাত দেওয়া সমীচীন মনে করেন নাই। তিনি ছোটলাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।[১২] বৃটিশ সরকার ১৮৬৭ সালে আবার কলিকাতা মাদ্রাসা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করে। এই সময়েও আবদুল লতিফের চেষ্টায় মাদ্রাদার অস্তিত্ব রক্ষা পায়। তিনি বাংলা সমাজ বিজ্ঞান সমিতির এক সভায় মাদ্রাসার শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৩] ইহার ফলে ১৮৬৯ সালে সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে। আবদুল লতিফ এই কমিটির সভ্য ছিলেন। তদন্ত কমিটি মাদ্রাসার ইংরাজী-আরবী বিভাগ এন্ট্রাস পরীক্ষার উপযোগী করিবার সুপারিশ করে। সরকার এই সুপারিশ কার্যকরী করে নাই। ১৮৭১ সালে বিচারপতি জে. পি. নরম্যানকে সভাপতি এবং আবদুল লতিফকে কর্মসচিব করিয়া মাদ্রাসার কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। কার্যনির্বাহক কমিটি মাদ্রাসার ইংরাজী শিক্ষা এন্টান্স মান পর্যন্ত করিবার প্রস্তাব করে। ইহা কার্যকরি করার ব্যবস্থা হয় নাই। এই বৎসর বিচারপতি নরম্যান ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জে. সুটক্লিফকে কলিকাতা মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। তাঁহার বিরোধিতার দরুন আবদুল লতিফ ২৪ বৎসর পর্যন্ত কার্যনির্বাহক কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারেন নাই।[১৪]

মহসিন ফান্ডের[১৫] টাকায় হুগলী কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয় এবং ইহাদের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ছাত্রদেরকে বেতন দিতে হইত। এই জন্য গরীব মুসলমান ছাত্রগণ সেখানে ভর্তি হইতে পারিত না। কলেজ ও স্কুলের মুসলমানদের উপকার হইত না, ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপকার হইত। হুগলী মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও অব্যবস্থা ছিল। আবদুল লতিফ বুঝিতে পারেন যে, যদি মহসিন ফান্ডের টাকা শুধু মাসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে। তিনি এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছোট লাট জে.পি. গ্রান্টের নির্দেশে আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার শিক্ষার ব্যাপারে তদন্ত করেন এবং ১৮৬১ সালের ডিসেম্বরে রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি মাদ্রাসায় ইংরাজী ফার্সী বিভাগ খোলার এবং ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেন। মহসিন ফান্ড সম্বন্ধে তিনি দাবী করেন যে, ইহা দাতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত। [১৬]

রিপোর্টে মুসলমানদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আবদুল লতিফ বলেন যে, তাহাদের মধ্যে দুই প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন। মুসলমান সমাজে এক শ্রেণীর লোক শুধু ধর্ম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক। এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ

www.bjilibrary.com

সাধারণত দরিদ্র কিন্তু সমাজে তাহাদের খুব সম্মান আছে। অন্য শ্রেণীর মুসলমানেরা বৈষয়িক শিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করে। আরবী ফার্সী শিক্ষার সহিত ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতি। উভয় শ্রেণীর মুসলমানদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার আরবী-ফার্সী বিভাগ ও ইংরাজী ফার্সী বিভাগের শিক্ষার মান উন্নত করিবার সুপারিশ করেন।[১৭] ছোট লাট জে. পি. গ্রান্ট ১৮৬২ সালে বিলাত চলিয়া যান। ইহার পর কর্তৃপক্ষ হুগলী মাদ্রাসা ও মহসিন ফান্ডের বিষয়ে আবদুল লতিফের সুপারিশ কার্যকরী করিতে অবহেলা করে। ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ কলিকাতা মুসলিম সাহিত্য সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির মাধ্যমে তিনি মহসিন ফাণ্ড ও মুসলিম শিক্ষা সম্বন্ধে ক্রমাগত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকেন।[১৮] কলিকাতা মাদ্রাসার জন্য ১৮৬৯ সালে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয় তাহা হুগলী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও তদন্ত করে। এই কমিটি মহসিন ফান্ড হইতে ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের সুপারিশ করে। গবর্ণমেন্ট ইহা কার্যকরী করার ভার কলিকাতা মাদ্রাসার কার্যনির্বাহিক কমিটির উপর ন্যস্ত করে। কিন্তু ২৪ বৎসর পর্যন্ত এই কার্যনির্বাহক কমিটির কোন সভা আহুত হইতে পারে নাই।[১৯]

মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আবদুল লতিফ বড়লাট লর্ড মেয়োর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭১ সালের ৭ই আগস্ট ভারত সরকার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। (১) সব সরকারী স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের প্রাচীন ও প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। (২) মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ইংরাজী স্কুলে ইংরাজীর জন্য উপযুক্ত মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। (৩) মুসলমানদের স্কুল স্থাপনের প্রচেষ্টার সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে। (৪) মুসলমানদের প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে উৎসাহ দেওয়া হইবে এই সব ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।[২০]

আবদুল লতিফ ছোটলাট স্যার জর্জ কেম্পবেলকে বুঝাইতে সফল হন যে, মহসিন ফান্ডের টাকা ইহার দাতার ইচ্ছানুযায়ী মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যবহৃত হইতেছে না। কেম্পবেলের ১৮৭৩ সালে ভারত সরকার হুগলী কলেজের জন্য ৫০,০০০ টাকা বাংলাদেশ সরকারকে বরাদ্দ করে এবং মহসিন ফান্ডের যে ৫৫,০০০ টাকা এত দিন কলেজের জন্য ব্যয় হইতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ হয়। ইহার পর ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুলাই বাংলাদেশ সরকার এক প্রস্তাব পাশ করিয়া মহসিন ফান্ডের টাকা মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময় হইতে হুগলী কলেজ সরকারী কলেজে পরিণত হয় এবং মহসিন ফান্ডের টাকা মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়। এই টাকায় হুগলী ও কলিকাতা মাদ্রাসার উন্নতি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। গবর্ণমেন্ট ৯টি জিলা স্কুলে আরবী ও ফার্সীর শিক্ষক নিয়োগের আদেশ দেয়। মহসিন ফান্ড সম্পর্কে মুসলমানদের বহুদিনের অভিযোগের প্রতিকার হয়।[২১]

www.bjilibrary.com

মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি আবদুল লতিফের জীবনের ব্রত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "দেশের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষত মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলি নিয়োগ করিয়াছি।"[২২] গবর্ণমেন্ট ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করিয়া শিক্ষা বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করে। আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনের নিকট মুসলমানদের শিক্ষার বিষয় উত্থাপন করেন। তিনি জানান যে, মুসলমানেরা এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের দারিদ্র তাহাদের শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়। তাহা ছাড়া গবর্ণমেন্টের শিক্ষাপদ্ধতি ও বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকা মুসলমানদের উপযোগী হয় নাই। তিনি মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবী করেন। প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে, মুসলমান জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হওয়া উচিত; কিন্তু এই বাংলায় সংস্কৃতের বাহুল্য থাকিবে না, ইহা মুসলমানদের কথ্য ভাষার অনুরূপ হইবে এবং ইহার মধ্যে চলতি আরবী ও ফার্সী শব্দ থাকিবে। তিনি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য উর্দুকে প্রাদেশিক ভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা উর্দুতে কথা বলে এবং যদি কোন মুসলমান উর্দু না জানে তাহা হইলে অভিজাত মুসলমান সমাজে তাহাকে গ্রহণ করা হয় না।"[২৩]

১৮৮২ সালে সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগে কলিকাতায় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন লর্ড রিপনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ইহাতে বলা হয় যে, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলির অবনতি হইতেছে এবং এইগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ইহাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সাহায্যে কলিকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করিলে মুসলমানদের উপকার হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং পরীক্ষা ও চাকুরীর ব্যাপারে মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবী করা হয়। ১৮৮৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী লর্ড রিপনের নিকট এক স্মরকলিপিতে আবদুল লতিফ মাদ্রাসা ও চাকুরীর ব্যাপারে আমীর আলীর প্রস্তাবের নিন্দা করেন। হান্টার কমিশন উভয় স্মারকলিপি বিবেচনা করে।[২৪]

আমীর আলী ও আবদুল লতিফের মধ্যে মুসলমানদের নেতৃত্ব নিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। আবদুল লতিফ রক্ষণশীল শ্রেণীর সংস্কারক ছিলেন। তিনি খুব রাজভক্ত ছিলেন। আমীর আলী প্রগতিপন্থী সংস্কারক ছিলেন। আবদুল লতিফ মনে করিতেন যে, প্রগতিপন্থীদের হাতে মুসলমান সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে। এইজন্য তিনি ইহাদের প্রভাব হইতে মুসলমান সমাজকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন।

গরীব ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য আবদুল লতিফ নানাভাবে চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টায় অবস্থাপন্ন মুসলমানদের নিকট হইতে ইহাদের বৃত্তির অর্থ সংগৃহীত হয়। এইভাবে ২৮, ০০০ টাকা জমা হয় এবং ১৮৮৩ সালে এই টাকা হইতে পুরস্কার ও বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। যে সকল মুসলমান ছাত্র এন্ট্রান্স পাশ করে তাহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়।[২৫]

www.bjilibrary.com

মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি :

আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল কলিকাতায় মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি (Muhammedan Literary Society) স্থাপন করেন। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা এবং তাহাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে সমিতি দ্বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে : (১) ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষ দূর করা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি তাহাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজনের প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; (২) বৃটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদেরকে অনুগত করা এবং মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা। সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আবদুল লতিফ লিখিয়াছেন, "ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করিতে এবং শিক্ষা ও সামাজিকতায় তাহাদেরকে শিক্ষিত ইংরাজ ও হিন্দুর সমকক্ষ করিয়া তুলিতে আমি ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতি বক্তৃতা ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করিয়া মুসলমানদের শিক্ষা ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছে এবং ইহা মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের উপদেষ্টা সংস্থার কাজ করিয়াছে।"[২৬]

কলিকাতার মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ভারতে, মুসলমানদের সর্বপ্রথম সমিতি ছিল। এই প্রসঙ্গে আবদুল লতিফ লিখিয়াছেন, "এই সমিতি ভারতের অন্যান্য স্থানের এই প্রকারের অনেক প্রতিষ্ঠানের জনক ও অগ্রদূত এবং জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত ইহা বহু রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটকে অভ্যর্থনা করিয়াছে।[২৭] এই সমিতি সমাজ-প্রাণ মুসলমানদেরকে সমাজ সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সৈয়দ আহমদ খান আবদুল লতিফের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ১৮৬৩ সালের ৩রা অক্টোবর মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির ষষ্ঠ মাসিক সভায় সৈয়দ আহমদ স্বদেশ প্রেম ও ভারতে জ্ঞানের উন্নতির আবশ্যকতা বিষয়ে ফার্সী ভাষায় বক্তৃতা দেন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর তিনি গাজীপুর বিজ্ঞান সমিতি (Ghazipur Scientific Society) স্থাপন করেন এবং আবদুল লতিফকে ইহার পরিষদের সভ্য মনোনীত করেন।

মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির কার্যাবলী সম্বন্ধে আবদুল লতিফ বলিয়াছেন, বাইশ বৎসর হইল এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ইহা ভারতের সর্বত্র মুসলমানদের উন্নতির ব্যাপারে এক অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা মুসলমানদের চিন্তাধারা ও অনুভূতিতে নূতন ভাবধারার সংযোগ করিয়াছে। শিক্ষা, আইন প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানদের অভাব অভিযোগ ও দাবী দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহা মুসলমান সমাজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে।[২৯] সমিতির কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, বহু মুসলমান ইহার সভায় যোগ দিত। ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাঁচ শতেরও বেশি মুসলমান এই সমিতির সভ্যভুক্ত ছিল।[৩০]

www.bjilibrary.com

সমিতির প্রথম সভা ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল আবদুল লতিফের ১৬নং তালতলা লেনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মাদ্রাসার আরবীর অধ্যাপক মৌলবী মুহাম্মদ ওয়াজীর এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মসচিব আদুল লতিফ সভায় সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আরও কয়েকজন বক্তা এই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় ওহাবীদের মতবাদের সমালোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।[৩১] সমিতির দ্বিতীয় সভা ১৩ই মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ইতিহাসের উপকারিতা, সংবাদপত্রের সূত্রপাত, বাণিজ্য, ভূগোল, কৃষি ও কলা বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয় ইহার পর প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ৭ই আগষ্ট সমিতির সভায় এইচ, জি, টেলি বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক তারবার্তা (Electricity and Electric Telegraph) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৬ই অক্টোবর ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে সৈয়দ আহমদ খান অতিথ ও প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৬৪ সালের ৬ই মে সমিতির দশম সভায় ড: কাণীলাল দেব প্রকৌশল বিষয়ে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন।[৩২] এই বৎসর ৩০শে মে সমিতির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাংলার ছোটলাট স্যার সেসিল বীডনকে সমিতির পৃষ্ঠপোষক করা হয়।[৩৩]

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও ভাব বিনিময় করা সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ সালের ১৩ই মার্চ কলিকাতা টাউন হলে প্রথম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই হাজার মুসলমান, হিন্দু, ফার্সী, ইয়ুরোপিয়ান ও ইহুদী এই সভায় যোগ দেয়। বাংলার ছোটলাট সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের এতবড় আলোচনা সভা ভারতে ইহার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। সংবাদপত্রে ইহার প্রশংসা করা হয়। দ্বিতীয় আলোচনা সভায় (৬ই মার্চ ১৮৬৬) বড়লাট স্যার জন লরেন্স প্রধান অতিথি ছিলেন।[৩৪] শিক্ষাক্ষেত্রে আবদুল লতিফের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৬৭ সালে সরকার তাঁহাকে ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ও স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়। বড়লাট, ছোটলাট ও বাংলাদেশ সরকারের সচিব এস, সি, বেইলী তাঁহার সমাজ সেবা কার্যের প্রশংসা করেন। এই পুরস্কার উপলক্ষে ২রা মার্চ তৃতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৩৫]

সমিতির আলোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইত। ষষ্ঠ বাৎসরিক আলোচনা সভায় ডিউক অব এডেনবারা অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্যামের রাজা এবং বড়লাট লর্ড মেয়ো। অষ্টম বাৎসরিক আলোচনা সভায় (জানুয়ারী, ১৮৭২) অতিথি ছিলেন। বিভিন্ন বাৎসরিক আলোচনা সভায় ইন্দোরের মহারাজা, ভূপালের বেগম, এবং জয়পুর, পাতিয়ালা, আলওয়ার পুন্নাহ ও কোচবিহারের রাজা মহারাজাকে প্রধান অতিথি রূপে আমন্ত্রণ করা হয়। এই সকল সভায় ফাদার-ই-লাফাত, ড: কাণীলাল দে, ড: মহেন্দ্র লাল সরকার, ড: তারাপ্রসন্ন রায়, ড: মহেন্দ্রলাল গুপ্ত, জে, সি, বোস, জে জে, মেডী, প্রিয়লাল দে, প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন।[৩৬] সমিতি এই সকল বক্তৃতা ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করিয়া সমাজের খুব উপকার

www.bjilibrary.com

করে। ইহাতে জনসধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের পথ সুগম হয়।

মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি সব সময় মুসলমানদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা বড়লাট ও ছোটলাটদের জন্য অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করিয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট মুসলমানদের দাবী দাওয়ার কথা জানাইয়াছে। ইহা প্রিন্স-অব ওয়েলসের জন্য সম্বর্ধনা সভার অনুষ্ঠান করে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে সমিতি তাঁহাকে মুসলমানদের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করে এবং আনুগত্য জ্ঞাপন করে।[৩৭] এইভাবে সমিতি রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছে এবং মুসলমানদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছে। সমিতি বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। ইহা মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে, পুরাতন পদ্ধতির মদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা করে এবং স্কুল-কলেজে মুসলমানদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইহার চেষ্টায় মহসিন ফান্ডের টাকা মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়।[৩৮] ইহার কার্যের প্রশংসা করিয়া ১৮৭৭ সালের ২রা মে বাংলার নবনিযুক্ত ছোটলাট স্যার অ্যাসলী ইডেন তাঁহার সম্বর্ধনা অভিভাষণে বলেন, মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির সহিত আমার বহুদিনের পরিচয়। ১৮৬৩ সালে ইহার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আমি ইহার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি এবং আমি ভালভাবে জানি যে, ইহা প্রায়ই মুসলমানদের শিক্ষা প্রচলনে সরকারকে সাহায্য করিয়াছে। এই বিষয়ে অনেক কিছু করার দাবী আছে এবং আপনাদের সমিতির সচিব (আঃ লতিফ) জানেন যে, বিষয়টির প্রতি আমার গভীর মনোযোগ আছে।[৩৯]

নবাব আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমান সমাজের মহা উপকার করিয়াছেন। তিনি তাহাদের দুর্দিনে পথের সন্ধান দিয়াছেন এবং তাহাদেরকে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছেন। তিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। ইসলামের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ১৮৮৩ সালে ডব্লিউ. এস. ব্লান্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্লান্ট তাঁহাকে একজন প্রাচীন পন্থী নেতা ও সংস্করক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, আবদুল লতিফ ধর্মীয় শিক্ষার উন্নতি করিতে ও মুসলমানদের জন্য স্কুল স্থাপন করিতে বিগত বিশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন। আবদুল লতিফ মনে করেন যে, সমাজ সংস্কার কাজে ধর্মানুরাগী লোকের নেতৃত্বের প্রয়োজন, তাহা না হইলে সংস্কার কার্যকরী হইতে পারে না।[৪০]

www.bjilibrary.com

দ্বাদশ অধ্যায়
সৈয়দ আমীর আলী : মুসলিম রাজনীতি ও রেনেসাঁ

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে সৈয়দ আমীর আলী এক বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ ও সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের জন্য তাঁহার দান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম আইন ও ইতিহাসে তাঁহার অসামান্য নব্যুৎপত্তি ও পান্ডিত্য ছিল। তিনি বহু বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য হইবার সম্মান লাভ করেন। তিনি তাঁহার কর্মক্ষেত্র শুধু আইন ও বিচারালয়ের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তিনি সমাজ সেবার কাজেও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া তিনি তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পুনর্জাগরণের পথ প্রশস্ত করেন। মুসলমানদের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রেনেসাঁ আন্দোলন সৃষ্টি তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি জীবনব্যাপী যে সাধনা করেন তাহার ফল সুদূপ্রসারী হইয়াছিল।

১৮৪৯ সালের ৮ই এপ্রিল কটকে আমীর আলীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সৈয়দ সাদৎ আলী কলিকাতায় আসেন এবং হুগলীতে বসতি স্থাপন করেন। আমীর আলী হুগলী মাদ্রাসা ও কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ ও বি, এল ডিগ্রী প্রাপ্ত হন এবং বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি কলিকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৮৭৪ সালে বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৩ সালে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৯০ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বিলাত চলিয়া যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ১৯০৯ সালে তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। তাঁহার আইন জ্ঞান ও পান্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কেম্ব্রিজ, কলিকাতা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে যথাক্রমে এল, এল ডি, ডি, এল ও ডি, লিট, ডিগ্রী দ্বারা সম্মানিত করে। ১৮৮৭ সালে তিনি সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৮ সালের ৯ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।[১]

আইন ব্যবসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমীর আলী সমাজ সেবার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। বিচারক রূপে কর্মজীবনের মধ্যেও ভারতীয় মুসলমান সমাজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে নাই। তাহারা দরিদ্র ও অনুন্নত অবস্থায় পতিত হয়। সরকার তাহাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখিত। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও জিহাদ-আন্দোলনের জন্য তাহারা শাসকদের প্রতিহিংসা চক্রে নিষ্পিষ্ট হয়। ইহাতে মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং কোন কোন মুসলমান চরম পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮৭১ সালে একজন অভিযুক্ত মুসলমান প্রধান বিচারপতি জন, পি, নরম্যানকে বিচারালয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

www.bjilibrary.com

পর বৎসর শের আলী নামক দীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত একজন রাজবন্দী বড়লাট লর্ড মেয়োকে আন্দোমানে হত্যা করে।[২]

মুসলিম নেতাদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা : উনবিংশ শতকে মুসলমানদের মহা সংকটের সময় তাহাদের পথ নির্দেশের জন্য কয়েকজন নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে নাবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদের নাম সুপরিচিত। এই দুইজন খ্যাতনামা নেতা দুর্দিনে মুসলমানদেরকে পথের সন্ধান দেন। মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহারা দ্বিবিধ কর্মপন্থা অবলম্বন করেন : (১) মুসলমানদেরকে বৃটিশ শাসনের অনুগত করা ও (২) তাহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আবদুল লতিফ বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য রাজভক্তি ও ইংরাজী শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং সৈয়দ আহমদ খান উত্তর ভারতে ইহা প্রচলন করেন। ননারূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁহারা বৃটিশ শাসক ও মুসলমানদের মধ্যে আপোষমূলক মনোভাব সৃষ্টি করিতে ও মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিতে সমর্থ হন।

সৈয়দ আহমদের খ্যাতি সৈয়দ আমীর আলী এবং এমনকি আবদুল লতিফের খ্যাতি নিষ্প্রভ করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের রাজনীতি ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে আমীর আলীর দান তাঁহার সমসাময়িক দুই বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার কৃতিত্বপূর্ণ কার্য অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলমান নেতাদের মধ্যে আমীর আলী সর্বপ্রথম মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং ১৮৭৭ সালে তিনি মুসলমানদের প্রথম রাজ নৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সময় বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলমান নেতাগণ রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তায় বিশ্বাস করিতেন এবং মনে করিতেন যে, ইংরাজী শিক্ষায় কর্মসূচী কার্যকরী করিলেই মুসলমানদের ভাগ্যের নিশ্চিত উন্নতি হইবে। আমীর আলীও মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্রুত উন্নতি তাঁহারও জীবনের ব্রত ছিল। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন যে, কয়েকজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অপেক্ষা মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শিক্ষা বিস্তারের কাজে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিবে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানে : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। আমীর আলী লক্ষ্য করেন যে, হিন্দুদের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচলন করেন। অনেক হিন্দু কবি রাজপুত মারাঠা ও শিখদের কৃতিত্বের বিষয় নিয়া দেশপ্রেমের কবিতা ও জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। বাংলাদেশেই প্রথম রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় এবং ইহার কয়েকটি কারণ ছিল। বাংলাদেশে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয় ও প্রসার লাভ করে। এইজন্য এই প্রদেশে সর্ব প্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত : তখন হিন্দু ধর্ম পুনর্জাগরণের যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহা হিন্দুদের রাজনৈতিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তৃতীয়ত : বাংলা সাহিত্য, সাময়িকী ও সংবাদপত্র বিশেষত : হিন্দু পেট্রিয়ট অমৃতবাজার পত্রিকা জাতীয়তাবাদের

www.bjilibrary.com

বাণী প্রচার করে। পরিশেষে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতারা শিক্ষিত যুবকদেরকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময় হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়। ১৮৩৭ সালে জমিদারদের সমিতি (Landholders' Society) ও ১৮৪৩ সালে বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়। বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ১৮৫১ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। ১৮৭৫ সালে ইণ্ডিয়ান লীগ গঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইণ্ডিয়ান লীগ ইহার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক রাজনৈতিক পতাকা তলে সন্নিবেশিত করিয়া দেশের স্বার্থের জন্য শক্তিশালী জনমত গঠন করা সুরেন্দ্র নাথের সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।[৩] বাংলার নেতাদের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদ চিন্তাধারা অন্যান্য প্রদেশের লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এই জন্য গোখলে বলিয়াছেন, " বাংলাদেশ আজ যাহা ভাবে সারা ভারত পরের দিন তাহা ভাবে।"

আমীর আলী বুঝিতে পারেন যে, হিন্দু নেতাদের অনুসৃত জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে এবং ইহার ফলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা ছিল জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থল। আমীর আলী জাতীয়তাবাদী নেতাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, অতি শিক্ষিত হিন্দুগণও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষিত হিন্দুগণ মুসলমানদেরকে কোন পেশায় ঢুকিতে দিতে অনিচ্ছুক।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন : হিন্দুদের মধ্যে যখন জাতায়তাবাদ গড়িয়া উঠিতেছিল এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়াছিল তখন মুসলমানগণ নিষ্ক্রিয়তার দরুন তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে নাই। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেন। ইহা তাঁহার উক্তি হইতে ব্যক্ত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, " আমি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। এইজন্য আমি ১৮৭৭ সালে ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করি।"[৪]

তখনকার মুসলমান নেতাদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করিয়া আমীর আলী বলেন, "বিলাতে ও ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের সহিত বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যা ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার সময় সময় আলোচনা করিবার সুযোগ হয়। স্যার সৈয়দ আহমদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজী শিক্ষা পাইলে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হইবে। আমিও ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবস্থা হইতেছে মুসলমানদের মধ্যে সেরূপ না হইলে তাহারা হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবল

www.bjilibrary.com

স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। তিনি আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু আমি মনে করি যে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার চোখ খুলিয়াছে। ১৮৭৭ সালে যখন আমি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন স্থাপন করি তখন আমি তাঁহার সমর্থনের জন্য আবেদন করি; কিন্তু তিনি সমর্থন দিতে অস্বীকার করেন।"[৫] আমীর আলী বলেন, "মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্যকলাপ শুধু পুথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ রাখিয়া এবং তাহাদেরকে রাজনৈতিক শিক্ষা হইতে দূরে রাখিয়া ভবিষ্যতে যে তাহাদের বিপদ হইতে পারে স্যার সৈয়দ আহমদ পরে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তিনি মুসলিম প্রতিরক্ষা সংসদ (Muslim Defence Association) স্থাপন করেন। কিন্তু তখন যাহা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।[৬] নবাব আবদুল লতিফও আমীর আলীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন করেন নাই; তিনি এমনকি আমীর আলী ও তাঁহার সহকর্মীদের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন।[৭]

সে যুগের মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে ১৮৮৩ সালে ডব্লিউ. এস. ব্লান্ট মন্তব্য করেন, "বিলাতে আমরা সব সময় এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সন্ত্রস্ত থাকি যে, ভারতে যে কোন সময় মুসলমানদের বিদ্রোহ হইতে পারে এবং আমরা বিশজন হিন্দুর উক্তি অপেক্ষা একজন মুসলমানের উক্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়া দিয়া থাকি। কিন্তু যদি তাহারা তাহাদের ক্ষতির জন্য ভাগ্যের দোহাই দিয়া নিষ্ক্রিয় থাকে তাহা হইলে ইংরাজ জনগণও তাহাদরকে বর্তমান অবস্থায় রাখিয়া দিবে।"

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন :

মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং তাহাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমীর আলী মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেন। এইজন্য তিনি ১৮৭৭ সালে কলিকাতায় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৮] সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমীর আলী বলেন, "আইনগতভাবে ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহা মুসলমানদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য হইতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল মতবাদ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিবে। ইহা ভারতীয় মুসলমানদের নৈতিক জীবন সুসংহত করিয়া তাহাদের পুনর্জাগরণের পথ সুগম করিবে। ইহা ভারতের বিশেষ করিয়া মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।"[৯]

কলিকাতা সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন ২০০ জন সভ্য লইয়া আরম্ভ হয়। ইহার পঞ্চম বৎসরে সভ্যসংখ্যা ৬০০ হয় এবং ইহার বিভিন্ন শাখায় ৮০০ জন সভ্য তালিকাভুক্ত হয়। আমীর আলী সমিতির কর্মসচিব নির্বাচিত হন। তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সমিতির

www.bjilibrary.com

৫৩টি শাখা স্থাপিত হয়। ইহার সভ্যগণ সাধারণত : শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। বহু সরকারী কর্মচারী ইহার সভ্যভুক্ত হন। অন্য সম্পদায়ের লোকও ইহার সভ্য হইতে পারিত। সমিতির শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, ভারতের জনগণের কল্যাণের জন্য বিশেষত : মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ইহা যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবে।[১০]

আমীর আলী ও তাঁহার সহকারীগণ ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠানের কাজে সাহায্য করেন। তাহারা আশা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের কর্মসূচী সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্য কল্যাণপ্রসূ হইবে। কিন্তু কংগ্রেসের কর্মসূচীতে যে প্রতিনিধিত্বমূলক নীতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ইহা বিনা শর্তে গ্রহণ করা হইলে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইজন্য তাঁহারা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন নাই।[১১]

নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের উন্নতির ব্যবস্থা করা এই সমিতির লক্ষ্য ছিল। মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সরকারের নিকট উথাপনের জন্য ইহা স্মারকলিপি ও প্রতিনিধি দল প্রেরণ, বড়লাট ও ছোটলাটদের অভ্যর্থনা প্রভৃতি পাশ্চত্য পদ্ধতির নিয়মতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে। মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও ঐক্যের জন্য ইহা বক্তৃতা, সামাজিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করে। সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে ইহা মুসলমানদের অধিকার ও সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমীর আলী বিশ্বাস করিতেন যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের জন্য তাহাদের নৈতিক জীবনের এবং তাহাদের ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার একান্ত আবশ্যক। তিনি মনে করেন যে, মুসলমানগণ তাহাদের অতীতে ঐতিহ্য হইতে অনুপ্রেরণা পাইবে এবং আধুনিক যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

শিক্ষা বিষয়ক কার্যকলাপ : আমীর আলীর প্রতিষ্ঠিত এসোসিয়েশন সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। ১৮৮১ সালে এক পুস্তিকার মাধ্যমে ইহা মুসলমানদের শিক্ষাসমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট উথাপন করে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীর মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র সংখ্যা খুব কম ছিল। ইহাতে এসোসিয়েশন মনে করে যে, ইহাদের জন্য মহসিন ফন্ডের টাকা অনর্থক খরচ করা হইতেছে এবং প্রস্তাব করে যে, ইহাদের টাকায় কলিকাতায় একটি কলেজ ও ছাত্রাবাস স্থাপন করিলে মুসলমান ছাত্রদের উপকার হইবে।[১২] আমীর আলী ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের নিকট ব্যক্ত করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি পূর্বের বিদ্বেষ নাই। দারিদ্র তাহাদের শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়; তাহারা শিক্ষার অত্যধিক খরচ বহন করিতে অপারগ। তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের উপযোগী হয় নাই এবং বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান শিক্ষক নাই। তিনি স্কুলের বেতন হ্রাস, মুসলমান এলাকার স্কুলগুলিতে মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং আরবী ও ফার্সী

www.bjilibrary.com

শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করেন। ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের জন্য তিনি সরকারকে পরামর্শ দেন। মহসিন ফান্ড হইতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং কলিকাতা মাদ্রাসাকে কলেজে উন্নীত করার জন্য তিনি দাবী করেন।[১৩]

আমীর আলীর প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়। ১৮৮৪ সালে গবর্ণমেন্ট কলিকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এসোসিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য ৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা করে।[১৪] আমীর আলী কার্যোপলক্ষে ১৮৮৪ সালে করাচী যান। তিনি করাচীর মুসলমানদেরকে একটি কলেজ স্থাপন করিতে উৎসাহিত করেন। তাঁহার সহকারী হাসান আলী কিছুদিন পর করাচীতে একটি মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫]

১৮৮২ সালের স্মারকলিপি : ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে লর্ড রিপনের নিকট স্মারকলিপি (memorial) পেশ করা হয়। আমীর আলী এই স্মরকলিপির বিষয়বস্তু ভারতীয় মুসলমানদের অভিযোগ (A cry from the Indian Muhammedans) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নাইনটিনথ সেঞ্চুরী নামক বিলাতের এক সাময়িকীতে প্রকাশ করেন। হিন্দু সংবাদপত্রে ইহার তীব্র সমালোচনা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, মুসলমানগণ বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের অনুন্নত অবস্থার জন্য অসুখী। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আঘাতের ফলে সমৃদ্ধ ও উন্নত মুসলমান সম্প্রদায় দারিদ্র ও অনুন্নত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তাহারা চাকুরীহারা হইয়াছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের একচেটিয়া স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। মুফতী ও কাজী উল কুজ্জাতের পদ রহিত করার দরুন বিচার বিভাগের চাকুরীতে মুসলমানদের খুব ক্ষতি হইয়াছে।[১৬]

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয় যে, যদিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার মুসলমানদেরকে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিয়াছে, তবু নিয়োগের বেলায় বহু ক্ষেত্রে যোগ্য মুসলমান প্রার্থীদের দাবী অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মুসলমানদেরকে নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থার দাবী কারা হয়। বিচারালয়গুলিতে মুসলমান বিচারক নিয়োগের জন্য আবেদন করা হয়। স্মারকলিপিতে আরও দাবী করা হয় যে, মহসিন ফান্ডের টাকা শুধু মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে এবং উর্দুকে বিহারে আদালতের ভাষা রূপে মার্যাদা দিতে হইবে। ইহা প্রকাশ করে যে, মুসলমানদের দুরবস্থা কেবল ইহাদের সম্প্রদায়ের জন্যই ক্ষতিকর নয়, ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থেরও পরিপন্থী হইবে।[১৭]

নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সুবিধার দাবী যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই।[১৮]

১৮৮৫ সালের প্রস্তাব : কেন্দ্রীয় সরকার স্মারকলিপির নকল প্রাদেশিক সরকার, উচ্চ বিচারালয়, শিক্ষা-বিভাগ ও বিভিন্ন সমিতিগুলিকে প্রেরণ করে এবং ইহাদের

www.bjilibrary.com

মতামত আহবান করে। ইহার নকল হান্টার কমিশনকে দেওয়া হয়। স্মারকলিপি এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুলাই বড়লাট লর্ড ডাফারিণের সময় ভারত সরকার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা থাকিবে এবং ইহা হইতে ভারত সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে জানিতে পারিবে এবং সময়োচিত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে জ্ঞান করাইবার জন্য মুসলমান পরিদর্শক নিয়োগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হয়।

চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রতিযোগিতার মান রক্ষা করা দরকার। তবে ইহা প্রাদেশিক সরকার, হাইকোর্ট ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেয় যে, চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার প্রতিকারের জন্য সুযোগ মত যেন তাহাদেরকে নিয়োগ করা হয়। প্রাদেশিক সরকারের বার্ষিক রিপোর্টে চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থার পর্যালোচনা থাকিবে। প্রস্তাবে স্মারকলিপির প্রশংসা করা হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, এখন হইতে মুসলমানদের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে।[১৯]

বিচারপতি মাহমুদ মন্তব্য করেন যে, ১৮৮৫ সালের প্রস্তাব ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষার ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমীর আলী ইহাকে মুসলমানদের বড় সনদ (Magna Carta) বলিয়া অভিহিত করেন। এই প্রস্তাবের পর বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব সরকার মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করে।[২০]

রাজনৈতিক কর্মসূচী : সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন সর্ব ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখে। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিলাত ও দিল্লীতে একই সময় আই. সি এস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আন্দোলন করেন। আমীর আলী বুঝিতে পারেন যে, এই ব্যবস্থা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। এইজন্য তিনি ইহার বিরোধিতা করেন। তিনি মনোনয়ন প্রথা বজায় রাখার দাবী করেন। সৈয়দ আহমদ প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের মতাবলম্বী ছিলেন, পরে তিনি আমীর আলীর মত গ্রহণ করেন।

১৮৮৭ সালে এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল লর্ড ডাফারিণের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৮৮ সালে ২৪শে মার্চ এসোসিয়েশন লর্ড ডাফারিণের বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করে। সম্বর্ধনার উত্তরে ডাফারিণ স্বীকার করেন যে, ঐতিহাসিক কারণবশত মুসলমানগণ অসন্তোষজনক অবস্থায় পড়িয়াছে এবং তিনি আশ্বাস দেন যে, তাহাদের প্রতি সরকারের সহানুভূতি আছে। ২২শে ডিসেম্বর এসোসিয়েশন নব-নিযুক্ত বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের অভ্যর্থনা সভার অনুষ্ঠান করে। বড়লাট তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, মুসলমানেরা যে অসুবিধা

www.bjilibrary.com

ভোগ করিতেছে এবং দেশের সম্পদের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে তাহা তিনি জ্ঞাত আছেন। এইরূপ অভ্যর্থনা ও অভিভাষণের আয়োজন করিয়া আমীর আলী মুসলমানদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।[২১]

আমীর আলী শাসন সংস্কারের দাবী উত্থাপন করেন। ভারতীয়দেরকে অধিক সংখ্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ, ব্যাপক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। ১৮৮০ সালে নাইনটিনথ সেঞ্চুরীতে লিখিত 'ভারতের জন্য ভারতীয়দের প্রস্তাব' (Some India Suggestion for India) শীর্ষক প্রবন্ধে আমীর আলী তাঁহার অভিমত জোরের সহিত প্রকাশ করেন। ইহা ভারত সচিব ডিউক অব ডেভেনশায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত সচিব তাঁহার সহিত ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।[২২] ১৮৮৩ সালে আমীর আলীর এসোসিয়েশন ইহার পর ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য দাবী করে এবং সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবগুলি ১৮৮৩ সালের মিউনিসিপ্যাল বিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান হয়।[২৩]

রাজনীতি ক্ষেত্রে আমীর আলী ও তাঁহার এসোসিয়েশনের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়। ১৮৮৮ সালের ৬ই নভেম্বর লর্ড ডাফারিণ ভারতের ব্যবস্থাপক পরিষদের সম্প্রসারণ ব্যাপারে ভারত সচিবের নিকট যে সুপারিশ করেন তাহাতে তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতীয়রা বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে বহু জাতিতে বিভক্ত এবং বৈষয়িক স্বার্থের বিরুদ্ধতায় একে অন্যের হইতে বিচ্ছিন্ন। বিলাতের পার্লামেন্টে ১৮৯২ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ বিলের বিতর্কে লর্ড কেম্বারলী অনুরূপ মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত হইবে না। তিনি বলেন, "যদি আপনারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জনমতের দ্বারা পরিচালিত হন তাহা হইলে আপনাদেরকে বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।"[২৪] অবশেষে বিলটি আপোষমূলক পরিকল্পনা রূপে গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে বিভিন্ন স্বার্থ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। এইজন্য ১৮৮২ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের আইনে মুসলমানগণ পরিমিত প্রতিনিধিত্ব পাইতে পারে নাই।

বিলাতে বসতি স্থপনের পরও আমীর আলী মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। তিনি ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে নাইনটিনথ সেঞ্চুরী সাময়িকীতে 'ভারত ও নূতন পার্লামেন্ট নামক একটি প্রবন্ধে দাবী করেন। যে, ভারতীয় মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। তিনি ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করিয়া একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উপদেশ দেন এবং ইহার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজেদের অধিকারের জন্য আন্দোলন

www.bjilibrary.com

করিতে পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মাদ্রাজের মুসলমানদের সম্বর্ধনার উত্তরে অস্থায়ী বড়লাট লর্ড অ্যামপটহিল যে উক্তি করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন। অ্যামপটহিল মন্তব্য করিয়াছেন যে, নম্রতা একদিকে মুসলমানদের যেমন গুণ, অন্যদিকে ইহা তাহাদের মস্ত বড় দোষ। তিনি বলিয়াছেন, "আপনারা জোর করিয়া দাবী করিতে পারেন না।, আপনারা বেশি কিছু দাবী করেন না এবং এমনকি সম্মুখে আসিতেও সঙ্কোচবোধ করেন।" আমীর আলী বলেন যে, এই উক্তি হইতে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।[২৫]

এই সময় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেখা যায়। এই বৎসর অক্টোবর মাসে সিমলা ডেপুটেশন অনুষ্ঠিত হয়; মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার দাবী জানান। এই সময় নবাব সলিমুল্লাহ্‌র সর্ব-ভারতীয় মুসলিম কনফেডারেশী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।[২৬] ইহার পর ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁহার এসোসিয়েশন মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসর তাহাদের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সংস্থার কাজ করে[২৭] আমীর আলী এই এসোসিয়েশনের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁহার বিলাত চলিয়া যাওয়ার পর ইহা নেতৃত্বহীন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য তিনি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন।

লণ্ডন মুসলিম লীগ : আমীর আলী বিলাতে ভারতীয় মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তাঁহার উদ্যোগে লন্ডনে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লণ্ডন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালের ৬ই মে কেক্সটন হলে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই শাখা স্থাপিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা ইহার উদ্দেশ্য চিল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আমীর আলী বলেন যে, কয়েকটি বিষয়ে, যেমন ভারতীয়দেরকে অধিক সংখ্যায় শাসনকার্যে নিয়োগ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এক সূত্রে গ্রথিত আছে এবং এমন কয়েকটি বিষয় আছে যাহা শুধু মুসলমানদের স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি প্রকাশ করেন যে, মুসলমানগণ অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে পারে না, তবে তাহারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অন্য জাতীয় লোকদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবে।[২৮]

স্বতন্ত্র নির্বাচন : লণ্ডন মুসলিম লীগ ভারতে স্বতন্ত্র-নির্বাচন প্রথা প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমীর আলী বলেন, "লর্ড মর্লি যখন ভারতীয় শাসন সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তখন যে তুমুল তর্কবিতর্কের সূচনা হয় তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সেই সময় মুসলমানদের এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক

www.bjilibrary.com

ছিল।"২৯ মর্লি তাঁহার শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র-নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ব্যবস্থা হয় যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি লইয়া একটি "মিশ্র নির্বাচক মন্ডলী' (Mixed Electoral College) গঠিত হইবে এবং এই নির্বাচক মন্ডলী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট আসনগুলির জন্য সদস্য মনোনয়ন করিবে।৩০ ১৯০৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মুসলিমলীগ অমৃতসর অধিবেশনে 'মিশ্র নির্বাচক মন্ডলী' ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে, কারণ এই ব্যবস্থার ফলে কেবল হিন্দু ঘেষা মুসলমানদের পক্ষেই নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মুসলিম লীগ ব্যবস্থাপক পরিষদগুলির জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা দাবী করে। ইহা সত্ত্বেও মর্লির পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয় নাই এবং পার্লামেন্টে ইহার আলোচনা চলিতে থাকে। এই সময় আমীর আলী ও লণ্ডন মুসলিম লীগের আন্দোলনের প্রভাবে মর্লি তাঁহার পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন।

'মিশ্র নির্বাচক মন্ডলী' ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া আমীর আলী লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় একটি চিঠির মাধ্যমে (জানুয়ারী ১৯০৯) জোরের সহিত প্রকাশ করেন যে, মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা অপরিহার্য। ইহার ফলে ভারত সচিবের কার্যালয়ে আলোড়নের সঞ্চার হয়। লর্ড মর্লি ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা আলোচনার জন্য আমীর আলীকে আমন্ত্রণ করেন। আমীর আলী পৃথক নির্বাচনের ব্যাপারে নিজের সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। ইহার পরও তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তিনি লণ্ডন মুসলিম লীগের একটি প্রতিনিধি দল লইয়া ২৭শে জানুয়ারী ভারত সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী করিয়া তাঁহার নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। আমীর আলী ভারত সরকারের ১৯০৭ সালের ২৪ আগষ্টের সার্কুলার পত্রের এবং ১৯০৮ সালের ১লা অক্টোবর ভারত সচিবকে প্রেরিত এক চিঠির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রচলিত নির্বাচন প্রথায় খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান নির্বাচিত হইতে পারিয়াছে এবং ব্যবস্থাপক পরিষদ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিটিতে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯০৮ সালের ২৭শে নভেম্বর ভারত সচিব তাঁহার চিঠিতে ভারত সরকারের সহিত একমত হইয়াছেন যে, সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে মুসলমানদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকিতে হইবে। তিনি প্রকাশ করেন যে, মিশ্র নির্বাচক মন্ডলী ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ বিপন্ন হইবে, কারণ এই প্রথায় কেবল হিন্দুদের মনোনীত মুসলমানগণ নির্বাচিত হইবে। আমীর আলী দাবী করেন যে, ভারতের ৫কোটি ৫৩লক্ষ মুসলমান তাহাদের ধর্ম ঐতিহ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র জাতি (Nationality) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া তিনি মন্তব্য করেন, "এক সম্প্রদায়ের লোকের জন্য যাহা ধর্মের অঙ্গ অন্য সম্প্রদায়ের লোকের জন্য তাহা পরিত্যাজ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যের স্পর্শ এবং এমনকি অন্যের ছায়া ধর্ম

www.bjilibrary.com

কলুষিত করে।" উপসংহারে আমীর আলী আবেদন করেন, "আমার লোকেরা যে নির্বাচন প্রথায় পর্যাপ্ত কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব পাইবে না সেইরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইবে না।"[৩১]

আমীর আলীর বিশ্লেষণের ফলে লর্ড স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকিবে।[৩২]

আমীর আলী যাহাতে মিশ্র নির্বাচক মন্ডলী ব্যবস্থার বিরোধিতা হইতে বিরত থাকেন সেজন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি তাঁহার দিন পঞ্জিকায় লিখিয়াছেন যে, বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদের মুসলিম সদস্যদেরকে এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে সম্মত হন নাই, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মিশ্র নির্বাচক মন্ডলী ব্যবস্থায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে এবং তাহাদের অস্তিত্বের পৃথক নির্বাচন প্রথার একান্ত প্রয়োজন।[৩৩]

আমীর আলী মিশ্র নির্বাচক মন্ডলী ব্যবস্থার বিরোধিতায় অটল থাকায় ১৯০৯ সালের শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্থান করা হয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা স্বীকৃতি লাভ করে। ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয়। ন্যায়ত স্বীকার করিতে হয় যে : স্বতন্ত্র নির্বাচন ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবীর স্বীকৃতি আমীর আলীর প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে আমীর আলী তাঁহার সাধ্যমত জনসাধারণের স্বার্থের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৮৩ সালের ইলবার্ট বিল ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিল (Bengal Tenancy Bill) প্রণয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তিনি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী সাময়িকীতে বাংলার ভূমি সমস্যা (Land problem of Bengal) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রজাদের দুর্দশার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৩৪] ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিতে নিয়োগের জন্য আমীর আলী সরকারী কর্তৃপক্ষকে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সফল হন নাই। তাঁহার আরদ্ধ কাজ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পন্ন করেন। জিন্নার চেষ্টায় ১৯১৩ সালে ওয়াকফ বিল পাশ হয় এবং ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের শিক্ষা কার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।[৩৫]

মুসলমানদের রেনেসাঁ :

ভারতীয় মুসলমানদের রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের জন্য সৈয়দ আমীর আলী জীবন-ব্যাপী সাধনা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি তাহাদের যে মহা উপকার করিয়াছেন সেইজন্য তাহারা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। আমীর আলী বুঝিয়াছিলেন যে, নিজেদের ইতিহাস ও কৃষ্টি

www.bjilibrary.com

সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুন মুসলমানগণ অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নিজেদের অতীত ঐতিহ্য ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক জীবনে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ও কৃষ্টির পুনরুদ্ধার করিয়া আমীর আলী তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মুসলমানগণ তাহাদের অতীত ইতিহাস ও কীর্তি হইতে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা পাইবে এবং তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া জ্ঞান ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই মহান ব্রত পালনের জন্য তিনি কয়েকখানি পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৩৬]

(১) লাইফ এন্ড টিচিং অব দি প্রফেট: এই গ্রন্থে হযরত মুহম্মদের (দঃ) জীবন ও শিক্ষা আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ১৮৭৩ সালে ইডেনবার্গে প্রকাশিত হয়।

(২) স্পিরিট অব ইসলাম (লন্ডন, ১৮৯১): ইহা ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্যের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

(৩) এ সর্ট হিষ্টরী অব দি সারাসিনস (লন্ডন, ১৮৯৮): ইহা আরব মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস।

(৪) খ্রীশ্চীয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্ট্যান্ডপয়েন্ট (লণ্ডন, ১৯০৬): এই গ্রন্থে খীষ্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) ইসলাম (লণ্ডন, ১৯০৬): ইহাতে ইসলামের সাম্য ও ন্যায় নীতির পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

(৬) লিগ্যাল স্টেটাস অব ওইমেন ইন ইসলাম (লণ্ডন, ১৮৯১): এই গ্রন্থে মুসলমান নারীদের সম্মানজনক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হইয়াছে।

(৭) মোহামেডান ল (টেগোর লেকচারস; কলিকাতা, ১৮৮৪): ইহা মুসলিম আইনের গবেষণামূলক গ্রন্থ।

(৮) পারসোন্যাল ল অব দি মোহামেডানস (লণ্ডন, ১৮৮০): ইহা মুসলমানদের সামাজিক আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ।

(৯) কমেন্টারী অব দি ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট (কলিকাতা ১৮৯৮) : ইহা বৃটিশ ভারতের সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইনের গ্রন্থ। আমীর আলী ও জন জর্জ উডরোফ যুক্তভাবে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

(১০) কমেন্টারী অব দি সিভিল প্রোসেডুর কোড : ইহা আইন সংক্রান্ত একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। জন জর্জ উডরোফের সহায়তায় আমীর আলী ইহা রচনা করেন।

(১১) আইন-উল হিদায়া : ইহা হানাফী আইনের হিদায়া গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ।

(১২) জিহাদ : কোন কোন অবস্থায় ধর্মযুদ্ধ সঙ্গত এই গ্রন্থে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে।

(১৩) কমেন্টারী অব দি বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্ট : এই পুস্তিকায় বাংলাদেশের প্রজাস্বত্ব আইনের পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

www.bjilibrary.com

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমীর আলী দেখাইয়াছেন যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) একজন আদর্শ মানব ও আদর্শ নেতা ছিলেন এবং তিনি সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন। হযরত মুহম্মদের (দাঃ) চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "তাঁহার স্বভাব এত পবিত্র, এত নরম এবং তথাপি এমন বীরত্বব্যঞ্জক ছিল যে, তাহা কেবল শ্রদ্ধাই উদ্রেক করে না, ভালবাসারও অনুপ্রেরণা দেয়।" তিনি বলেন যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) একটি বিশ্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই ধর্মের মধ্যে সর্বজনীন আবেদন আছে এবং তিনি সর্বজনীন মানবতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।[৩৭] আমীর আলী লিখিয়াছেন, "ইসলাম জাতি ও বর্ণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য স্বীকার করে না; কাল অথবা সাদা, নাগরিক অথবা সৈনিক, রাজা অথবা প্রজা, সকলেই আইনত ও কার্যত সর্বতোভাবে সমান।" তিনি বলেন যে, যে যুগে নারীগণ দাসত্বে ছিল সে যুগে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নারীদেরকে সম্মানজনক মর্যাদায় উন্নত করিয়াছিলেন এবং বর্তমান শতাব্দীতে সভ্য জাতিগণ চাপে পড়িয়া অনিচ্ছায় যে সব অধিকার নারীদেরকে দিতে বাধ্য হইতেছে তিনি বহু শতাব্দী পূর্বে তাহাদেরকে সে সব অধিকার দিয়াছিলেন।

ইসলামের উদার মতবাদের উল্লেখ করিয়া আমীর আলী লিখিয়াছেন, "যে বাণী সমগ্র মানবজাতির মধ্যে মুক্তি, সাম্য ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিল তাহা এখন নূতন তেজের সহিত শুনিবার সময় আসিয়াছে, এই তেজ চৌদ্দ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক জীবন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"[৩৯] ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া আমীর আলী লিখিয়াছেন, "সে যুগে যখন সামাজিক জীবনে জনসাধারণ অধীনতার শোচনীয় নাগপাশে আবদ্ধ ছিল তখন ইসলাম এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন যাহা সাধারণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রজাদের প্রতি শাসকদের কর্তব্য এবং জনগণের স্বাধীনতা ও সাম্য ঘোষণা করিয়া ছিল।"[৪০] ইসলামের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের প্রতি কোন ধর্মই ইসলাম অপেক্ষা বেশি নিরপেক্ষ নয়।"[৪১] আমীর আলী ইসলাম ধর্মকে একটি প্রগতিশীল ও প্রাণবন্ত ধর্মের রূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মুহম্মদের ব্যবস্থা যে প্রগতির প্রত্যেক স্তরের সহিত খাপ খায় তাহা হইতে ইহার প্রতিষ্ঠাতার বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৪২] আরব মুসলমানদের কীর্তিসমূহের আলোচনা করিয়া আমীর আলী বলিয়াছেন যে, তাহারা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহারা তাহাদের গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহারা (সারাসিনরা) তাহাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য যে জ্ঞান-সম্পদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আধুনিক য়ুরোপ এখনও তাহা লইয়া কাজ করিতেছে।"[৪৩]

ইহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের জন্য ভারতের অন্যান্য মুসলমান নেতাদের অপেক্ষা আমীর আলীর অবদান অনেক বেশি

www.bjilibrary.com

মূল্যবান ও ফলপ্রসূ ছিল। ইসলাম যে মনীষা বিকাশের মুক্তিরূপে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে আমীর আলীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাহাতে তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার ইসলাম সম্বন্ধে প্রকাশভঙ্গী ছিল চমৎকার, অনুপ্রেরণা-মূলক ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী দুনিয়ার সর্বত্র এবং সকল মতের মুসলমানদের প্রশংসা অর্জন করে। সৈয়দ আহমদ খানও ইসলাম সম্বন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইসলাম প্রকাশভঙ্গী আমীর আলী হইতে পৃথক ছিল। সৈয়দ আহমদ বলিয়াছেন যে ইসলাম প্রগতি বিরোধী নয়। আমীর আলী প্রকাশ করিয়াছেন, ইসলাম প্রগতিশীল। সৈয়দ আহমদ কৈফিয়তের সুরে লিখিয়াছেন যে, ইসলাম সম্মানিত ধর্ম এবং ইহাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।[৪৪] তিনি তাঁহার লেখায় অনাবশ্যকভাবে ধর্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে পড়িয়া ইসলামের ধর্ম শাস্ত্র যুক্তিতর্কের দ্বারা সমালোচনা করিয়াছেন এবং শাস্ত্রকারদের যে সকল আইন আবিষ্কারের যুক্তি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন সেগুলি তিনি বর্জন করিয়াছেন। এইভাবে যুক্তি ও প্রকৃতি প্রয়োগ করিয়া সৈয়দ আহমদ ধর্ম বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কুরআন ব্যতীত অন্যসব কিছু অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আলীগড় নেতার এই সকল ভাবধারায় গোড়া মুসলমান সমাজ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠে এবং তাঁহার সমালোচকেরা তাঁহাকে অবজ্ঞাভরে নেচারী (Naturalist) আখ্যায় অভিহিত করে, কারণ তিনি আল্লাহর কালামকে আল্লহর সৃষ্ট দ্বারা ব্যাখা করিয়াছেন।[৪৫] আমীর আলী এইরূপ অনাবশ্যক শাস্ত্র আলোচনা পরিহার করিয়াছেন।

সৈয়দ আহমদ ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই, ইহাতে তিনি মুসলমানদের অতীত গৌরবের প্রতি অবহেলা করিয়াছেন।[৪৬] আমীর আলী মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন এবং তাহাদের কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কীর্তিসমূহ উদঘাটিত করিয়াছেন। মুসলমানদের গৌরবময় অতীতকে তিনি তাঁহাদের পুনর্জাগরণের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুসলমান সমাজের জন্য আমীর আলীর ইহা মস্ত বড় দান। তাঁহার ইসলাম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে অপূর্ব সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আমীর আলীর লিখিত ইতিহাস বহুবার পুনমুদ্রিত হইয়া রাজনৈতিক ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের দান সম্পদের কথা প্রচার করিয়াছিল এবং মুসলমানদের মনে ভবিষ্যতের জন্য আত্মবিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করিয়া তাহাদের পুনর্জাগরণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। আমীর আলী সর্বপ্রথম এই দাবী উত্থাপন করেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ একটি জাতি এবং তিনিই সর্বপ্রথম তাহাদেরকে জাতি (Nationality, Nation) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। ১৮৭৭

www.bjilibrary.com

সালে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন শুরু হয়। আমীর আলী তাঁহার বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন যে, গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতের সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান অধিবাসীগণ একটি জাতি[৪৭] এবং ভারতে তাহারাই একমাত্র জাতি যাহাদের মধ্যে সমতা আছে।[৪৮] সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলমানদেরকে 'কওম' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন; তিনি কওম শব্দ সম্প্রদায় অর্থে ব্যবাহার করিয়াছেন, আমীর আলীর মত রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করেন নাই।[৪৯] আমীর আলী লর্ড মর্লির নিকট দাবী করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ একটি রাজনৈতিক জাতি এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার প্রবর্তনে এই দাবী স্বীকৃতি পাইয়াছিল।

আমীর আলীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইসলাম একটি মহান ধর্ম এবং তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। যদিও তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, তবু তিনি খিলাফতকে মুসলমানদের একটি প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনি ১৯১১-১৩ সালে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে খিলাফতের সংহতি বজায় রাখিতে প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন। যখন কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে রাজপথ ও খিলাফত উঠাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হন তখন আমীর আলী ইসমত পাশার নিকট এক পত্রে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক খিলাফতের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়।[৫০]

মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রণীরূপে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও তাহাদের পুনর্জাগরণের জন্য আমীর আলী যে, কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে মুসলমান সামাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমীর আলী মুসলমানদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

www.bjilibrary.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বাংলায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ : মুসলিম লীগ

মুসলমানদের শাসনের শুরু হইতে বাংলাদেশ কার্যত স্বাধীন ছিল। বাংলার সুলতানগণ প্রায় তিনশত বৎসর স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের স্বাধীন শাসনের আওতায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ভাষাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি পুষ্টিলাভ করে। স্বাধীন বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালী জাতীয়তা গড়িয়া উঠে। বাংলাদেশের জাতীয়তা মোগল সম্রাট আকবরের সময় মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ঐ সময় বাংলাদেশ সহজে সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নাই বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দু জমিদারগণ ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শক্তিশালী মোগল বাহিনীর সহিত বহু বৎসর সংগ্রাম করিয়াছেন। মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে তখন বাংলাদেশ আবার ইহার স্বাধীন সত্তা ফিরিয়া পায়। বাংলার স্বাধীন নবাবদের শাসনামলে বাঙ্গালী-গণ তাহাদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করিবার সুযোগ পায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার স্বাধীন রাজত্বের অবসান হয় এবং বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়। এই বিপর্যয়ের দরুন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

বৃটিশ শাসনকালে বাংলাদেশের ইতিহাসের গতি ভিন্নপথে চালিত হয়। বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য এত দিন বাঙ্গালীদের জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা বিস্মৃতির আওতায় পড়িয়া যায় এবং ইহার স্থলে তাহাদের বৈষম্যগুলি প্রকট হইয়া দেখা দেয়। বাংলার হিন্দু ও মুসলমানেরা একে অন্যের নিকট হইতে সরিয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা জন্মলাভ করে। বাংলাদেশের মুসলিম জাতীয়তা তাহাদের ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। হিন্দু জাতীয়তাও তাহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয়। মুসলমান শাসনের শুরু হইতে কয়েক শতাব্দী বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুগণ এক ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় পাশাপাশি বাস করিয়াছে। ইহার ফলে এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য ও মিলনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। কিন্তু, ইহারা নিজেদের ধর্মীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার ব্যবহার একে অন্যের থেকে পৃথক। মুসলমানগণ এক নিরাকার আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করে, হিন্দুগণ ঈশ্বরকে মূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া পূজা করে। মুসলমানদের মসজিদ ও হিন্দুদের মন্দিরের মধ্যে এই দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের বৈষম্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পার্সি ব্রাউন লিখিয়াছেন, "মসজিদের সহিত তুলনা করিলে মন্দির একটি ধাঁধাঁর বাসস্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"[১] ধর্মীয়

www.bjilibrary.com

পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে যে সংঘবদ্ধ আরাধনার পদ্ধতি আছে হিন্দুদের মধ্যে তাহা নাই; অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ গান-বাজনা সহকারে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা-অর্চনা করার রীতি প্রচলিত আছে তাহা কেবল মুসলমানদের অজানাই নয়, তাহাদের নিকট অরুচিকর ও বিরক্তিব্যঞ্জকও বটে।" তিনি আরও বলেন, "বর্ণ বৈষম্যযুক্ত হিন্দু সমাজের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি মুসলমানদের নিকট অর্থশূন্য; অন্যদিকে মুসলমানদের খাদ্য বিশেষত গোমাংশ ও পেয়াজ হিন্দুগণ বিতৃষ্ণার চোখে দেখে।"[২]

মুসলমানদের শাসনকালে মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নিজেদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পার্থক্যের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু নানা কারণে বৃটিশ শাসনকালে তাহাদের ধর্মীয় বৈষম্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিস্তৃত হয় এবং ইহার ফলে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠে। প্রথমত বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সহিত নিজেদেরকে খাপ খাওয়াইয়া নেয়। তাহারা বৃটিশ শাসন গ্রহণ করে এবং ইংরাজী শিক্ষাও আয়ত্ত করিতে থাকে। স্বভাবতই তাহারা ইংরাজ শাসকদের বিশ্বাস ও অনুগ্রহ লাভ করে এবং চাকুরী-বাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে মুসলমানেরা তাহাদের হৃতরাজ্য ও শাসনক্ষমতার কথা ভুলিতে পারে নাই তাহারা বহু বৎসর ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার ফলে তাহাদেরকে ইংরাজ শাসকদের অবিশ্বাসের মধ্যে থাকিতে হয় এবং তাহারা চাকুরী বাকুরী ও শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুন্নত হইয়া পড়ে। ইহাতে উন্নতশীল হিন্দু ও অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। দ্বিতীয়ত হিন্দুগণ আর্থিক জীবনেও বিত্তশালী হইয়া উঠে। মুসলমানগণ সব কিছু হারাইয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে। বিত্তশালী হিন্দু ও বিত্তহীন মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য প্রকটভাবে দেখা দেয়।

শিক্ষা ও সম্পদের পার্থক্যের দরুন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় একে অন্যের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুদের বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদেরকে ম্লেচ্ছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মুখ দিয়া ধর্মীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রচার করাইয়াছেন। তাঁহার আনন্দমঠ উপন্যাসে তিনি সন্ন্যাসীদের নায়ক ভবানন্দের উক্তি উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "সকল দেশের রাজাদের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধে; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মানগেল, কূল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর দেড়েদের (নেড়েদের) না তাড়াইলে আর কি হিন্দুদের হিন্দুয়ানী থাকে?"[৩] বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানানন্দ নামক অন্য একজন সন্ন্যাসীর মুখে বলাইয়াছেন, "আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর

www.bjilibrary.com

জলে ফেলিয়া দিব।"[৪] সত্যানন্দ নামে অপর এক সন্ন্যাসীর উক্তি দিয়া তিনি লিখিয়াছেন।, "আমরা রাজ্য চাহি না-কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করতে চাই।"[৫] ইংরাজদের সহিত মিত্রতার উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবানন্দের উক্তিতে বলিয়াছেন, "কাপ্তেন সাহেব (টমাস), তোমায় মারিব না, ইংরাজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানদের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস তোমার প্রাণ দান দিলাম, আপাতত তুমি বন্দি। ইংরাজের জয় হউক, আমরা তোমার সুহৃদ।"[৬]

হিন্দুদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় জাতীয়তার সূত্রপাত হয় এবং ইহার ভিত্তির উপর তাহাদের রাজনৈতিক জাতীয়তার পত্তন হয়। এই সময় উইলিয়ম জোনস ম্যাকসমুলার ও অন্যান্য পন্ডিতদের গবেষণার ফলে শিক্ষিত হিন্দুদের নিকট তাহাদের প্রাচীন ইতিহাস ও কৃষ্টি উদঘাটিত হয়। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া ডাঃ আর. সি. মজুমদার লিখিয়াছেন, " প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে।" জাতীয় পত্রিকা (National paper) নামক সাময়িকীর মাধ্যমে রাজনারায়ণ বসু ও ননীগোপাল মিত্র হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচার করেন।[৭] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ও নবীনসেন প্রমুখ কবিগণ তাহাদের রচনার মধ্য দিয়া হিন্দুদেরকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহারা মুসলিম শাসনকে অত্যাচারী শাসন বলিয়া আখ্যায়িত করেন এবং ইংরাজ শাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহারা যে সকল রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দুরাজাগণ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাদেরকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়াছেন।[৮]

হিন্দুগণ নিজেদেরকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রূপে বিবেচনা করিতে থাকে এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাহারা হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া হিন্দুদের শিক্ষার পথ সুগম করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের শিক্ষার সযোগ ছিল না। তাহারা ল্যান্ড হোল্ডারস সোসাইটি, বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন নামে কয়েকটি সমিতি স্থাপন করে। এইগুলি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবিধ স্বার্থ রক্ষার কার্যে নিয়োজিত হয়।

মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদ :

হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তা দেখা দেওয়ায় বাংলার মুসলমানগণ ক্রমশ তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম এবং অতীত ইতিহাস ও কৃষ্টির ভিত্তিতে জাতীয় জীবন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আলেমগণ মুসলমান সমাজে মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান। তাঁহাদের নেতৃত্বে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) আন্দোলন

www.bjilibrary.com

শুরু হয়। মুসলমান জিহাদীদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল না। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পৃথক রাজনৈতিক জীবন নির্দেশিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিবিধ সমিতি স্থাপন করিয়া বাংলার হিন্দুগণ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। বাংলার মুসলমানেরা অনুন্নত থাকিয়া যায়। কয়েকজন চিন্তাশীল মুসলমান নেতা অনুন্নত মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে কলিকাতায় মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও ১৮৭৭ সালে কলিকাতায় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে হিন্দুদের মত মুসলমানগণ পৃথক সমিতি ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ইহার ফলে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতিফ রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। মুসলমানদের মনে রাজভক্তি সঞ্চার করা এবং তাহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসার করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা তাঁহার সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষা প্রসার করিয়া ও তাহাদের রাজনৈতিক জীবন সুগঠিত করিয়া তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আমীর আলীর লক্ষ্য ছিল। সৈয়দ আমীর আলী বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং তিনিই সর্বপ্রথম তাঁহার বক্তৃতায় ও লিখায় ইহাদেরকে একটি 'জাতি' (Nationality, Nation) নামে অভিহিত করেন।[৯] ১৮৮৩ সালে মিউনিসিপ্যালিটি বিলে তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন।[১০] বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের অন্যতম সদস্য মুহম্মদ ইয়ূসুফও অনুরূপ দাবী জানান। তিনি মনোনয়ন প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, "মুসলমানদের জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী মিটিতে পারে।"[১১] সৈয়দ আহমদ খান কেন্দ্রীর ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে (১৮৭৮-৮৩) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক মনোনয়ন প্রথা প্রচলনের উপর জোর দেন।[১২]

বাংলাভাষা বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান সকলের মাতৃভাষা এবং বাংলা সাহিত্য ইহাদের সাধারণ কৃষ্টির অন্যতম। কিন্তু বাংলাভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের ধর্মীয় কৃষ্টি অনুসরণ করেন। মুসলমান সাহিত্যিকরাও সেরূপ তাঁহাদের রচনায় মুসলিম কৃষ্টি বজায় রাখিয়া চলেন।[১৩] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমান সমাজে যে সব সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহাতেও মুসলিম কৃষ্টি ও বিষয়বস্তু প্রাধান্য লাভ করে।[১৪] ইহার ফলে হিন্দুদের ভাবধারা ও মুসলমানদের চিন্তাধারার মধ্যে বৈষম্য স্পষ্ট হইয়া উঠে এই সময় শিক্ষিত মুসলমানগণ কয়েকটি সাহিত্য সমিতি গঠন করেন এবং ইহাদের মুসলমানদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। ১৮৮৩ সালে ঢাকা শহরে ঢাকা মুসলিম

www.bjilibrary.com

সুহৃদ সমিতি (Dhaka Muhammedan Friends Association) স্থাপিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিও ইহা সজাগ ছিল। এই সমিতি ১৯০৫ সালের বঙ্গবঙ্গের সমর্থনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৯০ সালে রাজশাহীতে আনজুমান-ই-হিমায়াতুল ইসলাম নামে একটি সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়। মুসলমানদের অতীত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করিয়া শিক্ষা বিষয়ে মুসলমান সমাজকে সচেতন করা ইহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা ১৯০২ সালে মুসলিম সংসদ (Moslem Institute) নামক একটি সমিতি স্থাপন করে। মুসলিম সংসদ ১৯০৪ সাল হইতে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশ করে। ইহা নানাভাবে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণের বাণী প্রচার করে।[১৫]

পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্ররা মুসলিম কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। ১৯২১ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলা অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়।[১৬] ঢাকায় কয়েকটি সমিতি ও সাময়িকীর আবির্ভাব হয়। ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ স্থাপিত হয়। ইহা বাৎসরিক সভার আয়োজন করিত ও শিখা নামক একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিত। মুসলিম কৃষ্টির ভিত্তিতে মুসলমানদের সমাজ জীবন সুগঠিত করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া সমিতির সভাপতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক সভায় বলেন, "হিন্দু সাহিত্য বেদান্ত, গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সাহিত্য কুরআন, হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিবে। হিন্দু সাহিত্য হিন্দু সমাজ জীবনের অনুভূতি গ্রহণ করে। এইরূপ সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অন্যকে জানিতে পারিবে। জানাজানির মধ্য দিয়া ভালবাসা গড়িয়া উঠিবে।"[১৭]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহাতে এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। দুইটি কারণে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভক্ত করেন। একটি শাসনতান্ত্রিক কারণ ও অন্যটি রাজনৈতিক কারণ। বঙ্গদেশ একটি খুব বড় প্রদেশ ছিল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন ছোটলাটের পক্ষে রাজধানী কলিকাতা হইতে এত বড় বিস্তীর্ণ প্রদেশ শাসন করিতে অসুবিধা হইত। যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকায় প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রতি ছোটলাট দৃষ্টি দিতে পরিতেন না। উন্নতির বন্দোবস্তের জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুইটি প্রদেশে ভাগ করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী (দার্জিলিং ব্যতীত) বিভাগ ও আসাম লইয়া একটি প্রদেশ গঠিত হয় ইহার নাম রাখা হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম। এই নূতন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকায়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার বঙ্গদেশ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে।[১৮] এই বিভাগের পিছনে রাজনৈতিক কারণও কিছুটা কাজ করিয়াছিল। সে সময় ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের

www.bjilibrary.com

জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশে। বাঙ্গালী বিশেষত বাঙ্গালী হিন্দুগণ এই জাতীয়তাবাদের অগ্রণী ছিল। লর্ড কার্জন এই নূতন জাতীয়তাবাদ শক্তির মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ দেখিতে পান। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শক্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন।[১৯] বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার দরুন বাঙ্গালী জাতিও বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বঙ্গবঙ্গ হওয়ায় পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় তাহাদের অবস্থার উন্নতির সুযোগ হয়। এইজন্য মুসলমানগণ কার্জনের শাসন ব্যবস্থাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দুগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। তাহারা মনে করে যে, বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল করিবার জন্য এবং ভারতীয় জাতীয়াতাবাদকে পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করা হইয়াছে। তাহারা সারাদেশ ব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তোলে। নবাব সলিমুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতাদের প্রবল আন্দোলনের সমালোচনা করেন। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং ইহাদের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য প্রকট হইয়া উঠে।

নবাব সলীমুল্লাহ ও মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে নবাব সলীমুল্লাহ পূর্ববাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে প্রধান নেতার আসন লাভ করেন। ১৮৭১ সালে ঢাকার নবাব পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিবার জনহিতকর কার্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। নবাব সলীমুল্লাহ সমাজদরদীরূপে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্বের ভূমিকায় আগাইয়া আসেন। পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে তিনি লর্ড কার্জনের সহিত সহযোগিতা করেন।[২০] নবগঠিত প্রদেশের উন্নতির জন্য নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ তাঁহাকে সমর্থন করেন। রাজশাহীর মুহম্মদ ইয়ুসুফ কুমিল্লার নওয়াব আলী চৌধুরী, শ্রীহট্টের মুহম্মদ এহিয়া, ময়মনসিংহের আবদুল হাই আখতার, বগুড়ার খোন্দকার হাফিজউদ্দীন, ধনবাড়ীর নওয়াব আলী চৌধুরী ও বরিশালের এ, কে, ফজলুল হক তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সহচর ছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, নবগঠিত প্রদেশের মুসলমানদের সংহতি ও উন্নতি বিধানের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহার উদ্যোক্তাগণ বলেন যে, ইহা নূতন প্রদেশের মুসলমানদের সংহতি রক্ষা করিয়া জনসাধারণের সর্ববিধ কল্যাণের ব্যবস্থা করিবে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ (Provincial Muhammedan Union) ১৯০৫ সালের ১৬ ই অক্টোবর ঢাকায় নর্থব্রুক হলে এক সভায় প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইদিন হইতে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হইয়াছিল ও নূতন প্রদেশের শাসনকার্য শুরু

www.bjilibrary.com

হইয়াছিল। নবাব সলীমুল্লাহ্ প্রাদেশিক মুসলিম সংঘের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। তিনি উদ্বোধনী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে নূতন প্রদেশে মুসলমানদের যে সব ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে আভাস দেন। মুন্সীগঞ্জে এক জনসভায় তিনি বলেন যে, "বঙ্গবঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন হইতে জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করিয়াছে।" প্রাদেশিক মুসলিম সংঘের উদ্যোক্তাগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।[২১]

পূর্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য শুধু প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ স্থাপন করিয়াই নবাব সলীমুল্লাহ্ থামিয়া যান নাই। তিনি ভারতের মুসলমানদের একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সে সময় নবপ্রতিষ্ঠিত প্রদেশকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য একটি সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ সরকারও তাঁহাদেরকে সন্তুষ্ট করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। নবাব সলীমুল্লাহ্ বুঝিতে পারেন যে, বৃটিশ সরকারের উপর শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব প্রতিহত করিতে হইলে ভারতীয় মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি ভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে নবাব সলীমুল্লাহ্ ভারতের বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের নিকট তাঁহার পরিকল্পনার বিষয় জানাইয়া পত্র (Circular Letter) লিখেন। ইহাতে তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জন্য সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ (Muhammedan All India Confederacy) নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন। সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের (All India Muslim Education Conference) অধিবেশন ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। এই শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনের সময় যাহাতে তাঁহার প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আলোচিত হইতে পারে সেজন্য নবাব সলীমুল্লাহ্ আমন্ত্রিত নেতাদেরকে প্রস্তুত হইয়া আসিতে অনুরোধ করেন।[২২]

এই সময় উত্তর ভারতের মুসলমান নেতাগণ মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৭৭ সালে যখন সৈয়দ আমীর আলী কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলিম সংস্থা (Central National Muhammedan Association) স্থাপন করেন তখন সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিরোধী ছিলেন। ইহার পর ১৮৮৫ সালে সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় উত্তর ভারতে উর্দু-হিন্দী বিরোধ দেখা দেয়। তখন সৈয়দ আহমদ তাঁহার রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা নীতি বর্জন করিতে বাধ্য হন। কংগ্রেসের প্রভাব 'প্রতিহত করিয়া

www.bjilibrary.com

মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি ১৮৮৯ সালে যুক্ত ভারতীয় দেশপ্রেমিক সংস্থা (United Indian Defence Association) এবং ১৮৯৩ সালে উত্তর ভারতীয় মুসলিম রক্ষা-সংসদ Muhammedan Angio-Oriental Defence Organisation of Upper India) স্থাপন করেন। সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী না থাকায় এই সংস্থা দুইটির আতুরেই অপমৃত্যু হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে উর্দু-হিন্দী বিতর্ক প্রবল আকার ধারণ করে। ইহাতে সৈয়দ আহমদের অনুগামীরা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেন।

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে নবাব ওয়াকার-উল মূলক ও অন্যান্য কয়েক জন মুসলমান নেতা লক্ষ্মৌতে এক ঘরোয়া বৈঠকে মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। ১৯০৩ সালে শাহরাণপুরে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাবে ফযল-ই হোসেন একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার নাম রাখেন মুসলিম লীগ।[২৩] এই সময় ভারত সচিব লর্ড মর্লি পার্লামেন্টে আভাস দেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করিতেছে। ইহার ফলে মুসলমান নেতাগণ সক্রিয় হইয়া উঠেন। নূতন শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁহারা বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের আয়োজন করেন। এই প্রতিনিধি দল প্রথমে ১৯০৬ সালের ১৬ ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্মৌতে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। স্যার আবদুর রহিম এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে স্মারকলিপির খসড়া প্রস্তুত করা হয়। বৈঠকে তাঁহারা মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়েও আলোচনা করেন ১৯০৬ সালের আগষ্ট ও নভেম্বর মাসে নাইনটিনথ সেঞ্চুরী নামক সাময়িক পত্রিকায় সৈয়দ আমীর আলীর দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ দুইটিতে আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদেরকে একটি কার্যকরী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পরামর্শ দেন।[২৪]

চোখে অস্ত্রোপচার হওয়ার দরুন নবাব সলীমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজনৈতিক সহচর নওয়াব আলী চৌধুরী এবং এক, কে ফজলুল হক প্রতিনিধি দলে যোগ দেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য নবাব সলীমুল্লাহ নওয়াব আলী চৌধুরীর সহিত তাঁহার প্রস্তাবিত মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার খসড়া পাঠাইয়াছিলেন। সিমলায় এক ঘরোয়া বৈঠকে প্রতিনিধি দলের সভ্যগণ তাঁহার প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[২৫] ইহার পর নভেম্বর মাসে নবাব সলীমুল্লাহ তাঁহার পরিকল্পনা সম্বলিত পত্র মুসলমান নেতাদের নিকট প্রেরণ করেন।

নবাব সলীমুল্লাহর প্রত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া মাওলানা মুহম্মদ আলী লিখিয়াছেন, "১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অধিবেশনে শিক্ষা সমস্যা

www.bjilibrary.com

নিয়া আলোচনার জন্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের ঢাকায় মিলিত হইবার কথা ছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঢাকায় নবাব সলীমুল্লাহ্ বাহাদুর মুসলমান নেতাদের তাঁহার রাজনৈতিক সংঘের পরিকল্পনার খসড়া প্রেরণ করেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহাদের অভিমত জানিতে চাহেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছেন যে, ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার আলোচনা সভায় তাহারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন, অথবা লিখিতভাবেও তাঁহারা তাঁহাদের অভিমত জানাইতে পারেন। নবাব সলীমুল্লাহ্ পত্রের আশ্চর্যজনক সাড়া মিলিয়াছিল। অনেক বিশিষ্ট মুসলমান তাঁহার পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। কেহ কেহ পরিকল্পনার কোন কোন বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ জানাইয়াছিলেন যে, ঢাকায় আলোচনার পর পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। দূরবর্তী স্থান হইতে কয়েক শত মুসলমান ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় যোগ দিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশ হইতে কয়েক হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৬]

পরিকল্পনা সম্বলিত পত্র (Circular Letter): সলীমুল্লাহ লিখেন ১। আজ আমাদের সদাশয় সম্রাটের জন্ম দিন। এই শুভ দিনে আমি আমার মুসলমান ভ্রাতাদের নিকট আমার পরিকল্পিত সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের (Muhammedan All India Confederacy) বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করিতেছি।

২। সিমলায় মহামান্য বড়লাটের নিকট প্রেরিত সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধি দলে যোগ দিতে অসমর্থ হওয়ায় আমি আমার বন্ধু প্রতিনিধিদেরকে লিখিতভাবে আমার পরিকল্পনার বিষয় জানাইয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম যে, সমগ্র ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

৩। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার পরিকল্পনার বিষয় নিয়া প্রতিনিধিগণ সিমলায় ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করিয়াছেন,[২৭] এবং এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তাঁহারা আরও প্রস্তাব করেন যে, ইতিমধ্যে মতামত ও পরামর্শের জন্য এই পরিকল্পনা নকল মুসলমানদের বিভিন্ন সমিতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৪। সিমলায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার পরিকল্পনার পূর্ণ খসড়া আমাদের দেশের বিভিন্ন সংস্থা, সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করি এবং প্রকল্পিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সকলের ন্যায়-সঙ্গত আলোচনা আহবান করি। আমি অনুরোধ করি যেন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রদেশের প্রতিনিধিগণ পরিকল্পনার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা লইয়া ঢাকার সম্মেলনে যোগদান করেন। তাহা হইলে আলোচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হইতে পারিবে।

www.bjilibrary.com

৫। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার পরিকল্পনা নিয়া সিমলায় যে আলোচনা হয় তাহাতে অধিকাংশ প্রতিনিধি মুসলমানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুকূলে মত দিয়াছেন; কিন্তু আমি ইচ্ছা করি যে, সংখ্যালঘুদের মতামতও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, যাহাতে বিস্তৃত আলোচনার পর আমরা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিব ব্যক্তি বিশেষে কিছু মতানৈক্য থাকিলেও তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের খাতিরে সকলের গ্রহণ যোগ্য হইবে।

৬। কেহ কেহ মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, কারণ ইহাতে স্থানীয় সংস্থাগুলি দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাঁহাদের মতে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে স্থানীয় সংস্থা গঠনের উপর জোর দেওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ ভয় করেন যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে ইহা আলীগড়ের মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রর জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে; কারণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইহাকে সব রকম রাজনীতি হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইলে আলীগড় শিক্ষাকেন্দ্রের উপকারিতা ও কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং প্রতি প্রদেশে ইহার মত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হইবে। রাজনীতি সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, যদি আমরা জীবনের প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়িয়া না থাকিতে চাই তাহা হইলে আমাদেরকে যুগের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে হইবে। পঁচিশ বৎসর হইল আলীগড় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার সামর্থ ও উপকারিতা বজায় রাখিতে হইলে আমদেরকে আমাদের দেশ ও জাতির রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি আশা করি যে, আমাদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আমার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও অন্যান্যের প্রদত্ত পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যাহাতে পরিপূর্ণ আলোচনার পর আমরা এরূপ সিদ্ধন্ত গ্রহণ করিতে পারি যাহার দ্বারা আমাদের সম্প্রদায়ের কল্যাণের পথ সুগম হইবে।

৭। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। অনেকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন বড়লাটের নিকট আমাদের সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদল যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছিল : "ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়; তাহাদের নিজস্ব অতিরিক্ত স্বার্থ আছে, এই স্বার্থের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নাই এবং উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকায় এই স্বার্থগুলি অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে।"

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকিলে আমাদের সম্পদায়ের এই বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিলে এই বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়ার সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে আমি টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। বড়লাটের নিকট মুসলমান প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার এক প্রবন্ধে লিখা হইয়াছে, "ইহার (এই সাক্ষাতের) ফলে মুসলমানদের ভাবধারায় যে ঐক্য দেখা দিয়াছে তাহাতে তাহারা অবস্থা অনুযায়ী তাহাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে পারিবে। স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, এই বিশেষ স্বার্থগুলির সহিত অন্য

www.bjilibrary.com

সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক নাই" আমাদের সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সহিত এই বিষয়ে একমত যে, বহু সংখ্যক মুসলিম সংস্থার অস্তিত্ব থাকা বশত সরকারের কর্তৃপক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের সঠিক মতামত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং আমাদের যুবকেরা মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে বলিতে গিয়া অনেক সময় পরস্পর বিরোধী অভিমত ব্যক্ত করিয়া ফেলে। রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোন কোন দায়িত্বহীন মুসলমান ও সংস্থা তাহাদের কার্যকলাপের দ্বারা অনেক বিষয়ে মুসলমান সমাজের ক্ষতি করিয়াছে। তাহারা জনসাধারণের নেতা রূপে সরকারের নিকট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের প্রতি নিবিধত্ব করার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। অবশ্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অগ্রাহ্য করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের অভিমত সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মতামত প্রতিফলিত করে কিনা সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। এই কারণে তাহাদের বক্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আবার যদি বা কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভিমত গ্রহণ করে, ইহা মুসলমান জনসাধারণের সমর্থনযোগ্য হয় না। ফলে ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর হয়। এই অবস্থায় যদি আমরা একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি তাহা হইলে সরকার প্রয়োজন মত আমাদের সম্প্রদায়ের অভিমত জানিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং স্বার্থান্বেষী দলের হাতে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

৮। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন। আমাদের অনেকে হয়ত এই ব্যাপারে আমার সহিত একমত হইবে না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরী ও শক্তিশালী করিতে হইলে প্রথমে ইহার নীতি ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে সম্ভবত সরকারের বিধিব্যবস্থা সমর্থন করা এবং সারাদেশে আমাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য কাজ করা।

৯। কি প্রকারে ইহা করা হইবে তাহা বর্ণনা করিতেছি। আমরা যে প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা ভাবিতেছি তাহার উপযুক্ত নামকরণ খুবই দরকার। অনেক বিবেচনার পর আমি মনে করিয়াছি যে, ইহার জন্য মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংঘ (The Muhammedan All India Confederacy) নাম উপযোগী হইবে কারণ এই প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের সকল সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখপাত্রের কাজ করিবে এবং সকলকে আমাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ করিবে। ইহার উদ্দেশ্য;-

(ক) তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করা। কংগ্রেস ভারতে বৃটিশ শাসন হেয় ও খর্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং ইহার ফলে শোচনীয় [illegible] উদ্ভব হইতে পারে।

www.bjilibrary.com

(খ) আমাদের সম্প্রদায়ের যে সব যুবক আমাদের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় কংগ্রেসে যোগ দিয়াছে, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা ও পরিচয় দিতে সুযোগ পাইবে।

১০। সিমলায় যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কেহ কেহ আমাদের উদ্দেশ্য এরূপ খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করার পক্ষপাতী নহেন; কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, ইহাতে আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের এখন সময় আসিয়াছে যে, এখন আমাদেরকে ভাবাবেগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; এই ভাবাবেগের দরুন এখন আমাদরে মধ্যে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া ধ্বংস ও দুর্দশার সূত্রপাত হইয়াছে। চরমপন্থীদের কর্যকলাপ বৃটিশ শাসনের অনুকূল কিনা সে বিষয়ে আমাদের মুসলমানদেরকে বিশ্বস্ততার সহিত আলোচনা করিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। চরমপন্থী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি অংশ। এই অবস্থায় যদি কংগ্রেস প্রকাশ্য সভায় চরমপন্থীদের মতামতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তাহা হইলে মুসলমানগণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে না। আমরা দুঃখিত, কিন্তু আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, দেশের ব্যাপারে তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতামতকে মূল্য দেওয়া হইতেছে। বৃটিশ সরকারের বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত প্রজারূপে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে আমরা কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করিতে পারি, কারণ ইহার প্রভাবের দরুন আমাদের সকল প্রিয় বস্তু নষ্ট হইতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের শিক্তিত মুসলমান যুবকেরা কংগ্রেসে যোগ না দিলে অথবা অন্ততপক্ষে ইহাকে সমর্থন না করিলে চাকরি পাইতে ও চাকরিতে উন্নতি করিতে পারে না। আমাদের মুসলমানদের সংবাদপত্রে প্রায়ই অভিযোগ দেখিতে পাই যে, আজকাল ডিগ্রীধারী মুসলমান যুককের অভাব নাই। কিন্তু তাহাদেরকে চাকরিতে নিয়োগ করা হয় না এবং ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, সরকারের নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী তাহাদের যোগ্যতা নাই। (বড়লাটের নিকট স্বারকলিপিতে এই তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে)। আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের কর্মসংসদ সকল স্থানীয় সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে এবং আমাদের মেধাবী যুবকদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; জীবনের উন্নতির জন্য তাহাদেরকে আর কংগ্রেসের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না।[২৮]

নবাব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের পরিকল্পনা কংগ্রেসের মুখপত্র দি বেঙ্গলী সংবাদপত্রে ১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং আশা করা হয় যে, মুসলমানেরা ইহা গ্রহণ করিবে না। ইহা মন্তব্য করে "মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংঘের পরিকল্পনা আমাদেরকে পূর্বের মারাঠা সংঘ ও খালসা সংঘের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যখন তোষামোদের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র নবাব কি জন্য ইহার এরূপ যুদ্ধংদেহি নাম রাখিয়াছেন।"[২৯] টাইমস অব ইণ্ডিয়া মুসলমানদের ঐক্যের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, কিন্তু ইহা নবাবের পরিকল্পনাকে

www.bjilibrary.com

অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া মত প্রকাশ করে। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত দি পাওনিয়ার (১৪ই ডিসেম্বর ১৯০৬) ইহার সমালোচনায় বলে যে, মুসলমানদের মতামত প্রকাশের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। দি ইংলিশম্যান (২০শে ডিসেম্বর ১৯০৬) নবাব সলীমুল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে সমর্থন করে।[৩০]

নবাব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দালনের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সমর্থন লাভ করা। এই সময় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও হিন্দুদের তীব্র আন্দোলন চলিতেছিল এবং বঙ্গভঙ্গ বজায় রাখার জন্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান নেতাগণ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থ ও উন্নতির জন্যও তাঁহারা এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমান নেতাদের নিকট তাঁহার পরিকল্পনা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরকে ঢাকায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের রফিউদ্দীন নামক প্রতিনিধি ঢাকা সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি দৈনিক ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছিলেন যে, নবাব সলীমুল্লাহ সর্বভারতীয় মুসলমান নেতদের সম্মেলনের আয়োজন করিয়া এবং মুসলমানদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় উপকার করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলে অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই নূতন প্রদেশের মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সকলে জানিতে পারিয়াছে এবং মুসলমান সম্প্রদায় ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সজাগ হইতে পারিয়াছে।[৩১]

ঢাকায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নবাব সলীমুল্লাহর পরিকল্পনার উপর মুসলমান প্রতিনিধিদের আলোচনা হয় এবং ইহার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব সলীমুল্লাহ ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টার সময় নবাব সলীমুল্লাহর শাহবাগ নামক সুরম্য বাগানে অধিবেশন শুরু হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং সোমালিল্যান্ড, নেটাল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে আগত প্রায় আট হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। নবাব সলীমুল্লাহ অভ্যর্থনা সংসদের সভাপতি ছিলেন। নবাব ওয়াকার-উল-মুলক, শরীফুদ্দীন (পাটনা), পাতিয়ালার খলীফা মুহম্মদ হোসেন, হাসান ইমাম, লক্ষ্ণৌর রাজা নওশাদ আলী খান, খান বাহাদুর সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন, নওয়াব আলী চৌধুরী, মুহম্মদ আলী, ভুপালের মৌলবী নিযামুদ্দীন, নবাব মুহসিন-উল-মূলক, ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ, কুমিল্লার আলী নওয়াব চৌধুরী, চৌধুরী কেরামত উল্লাহ, মাওলানা শওকত আলী,

www.bjilibrary.com

মৌলবী আওলাদ হাসান, সৈয়দ হোসেন, অমৃতসরের খাজা মুহম্মদ ইয়ুসুফ শাহ, খাজা মুহম্মদ আফজাল, শাহজাদা আফতার আহমদ খান প্রমুখ বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। ইহাদের অনেকে সিমলায় বড়লাটের নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলে ছিলেন।[৩২]

সরকারী ও বেসরকারী কয়েকজন য়ুরোপীয়ানও শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শরীফুদ্দীন উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চিবল্ড বিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরী পূর্ব বঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাওলানা শিবলী নোমানী ও নবাব মুহসিন উল-মূলক শিক্ষা সমস্যা নিয়া আলোচনা করেন। বঙ্গভঙ্গের উল্লেখ করিয়া মুহসিন-উল-মূলক নব প্রতিষ্ঠিত প্রদেশের মুসলমানদেরকে নিজেদের উন্নতির জন্য পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। প্রতিনিধিগণ সকলেই বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। ইংলিশম্যান পত্রিকার সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধিগণ আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস হারাইবে না ও তাহাদেরকে বিপদে ফেলিবে না।[৩৩]

রাজনৈতিক অধিবেশন : ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার সকালে শাহবাগে শিক্ষা সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সেখানে এক বিশেষ সভায় মিলিত হইবেন।[৩৪] তদনুযায়ী শাহবাগের প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নবাব সলীমুল্লাহর প্রস্তাব ক্রমে নবাব ওয়াকার-উল-মূলক এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। নবাব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা হয়। সভাপতি উর্দু ভাষায় তাঁহার ভাষণদেন। তিনি সরকারী কর্মচারী ও ছাত্রদেরকে রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে নিষেধ করেন এবং এইজন্য তাহাদেরকে সভা হইতে চলিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সিমলায় মুসলমান প্রতিনিধিদের ঘরোয়া বৈঠকের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেখানে তাঁহারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং ঢাকায় এই বিষয়ে বিবেচনা করিতে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ঢাকার নবাব বাহাদুর তাঁহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনার খসড়া সকলের নিকট প্রেরণ করেন। সভাপতি বলেন, যে বিষয়টি আমরা এতদিন স্থগিত রাখিয়াছি সে সম্বন্ধে আমাদের কর্মপন্থা আজ চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিতে হইবে।" তিনি বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজভক্তি প্রকাশ করেন। বৃটিশ শাসনের অবসান হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনে মুসলমানদের যে কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, প্রতিবেশীদেরকে বিপথে যাইতে বাধা দেওয়া

www.bjilibrary.com

মুসলমাদের কর্তব্য। তিনি কংগ্রেসের উত্তেজনামূলক কার্যকলাপের সমালোচনা করেন এবং মুসলমানদেরকে তাহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের শালীনতা বজায় রাখিতে পরামর্শ দেন। তিনি জানান যে, সিমলায় মুসলিম প্রতিনিধিদেরকে সাক্ষাৎ দান কালে বড়লাট সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, মুসলমানগণ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও শিষ্টতার পরিচয় দিয়াছে।[৩৫]

ইহার পর সভাপতি নবাব সলীমুল্লাহকে তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার প্রস্তাব পেশ করিতে আহবান করেন। নবাব সলীমুল্লাহ তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের বিষয়ও উল্লেখ করেন। তিনি প্রতিনিধিদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন :

"ভদ্রমাহোদয়গণ, আপনারা বহু অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের দূরবর্তী স্থান হইতে এক মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যে অধিকতর রাজনৈতিক তৎপরতার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে সে বিষয়ে আমার বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। আমাদের দেশ ও সম্প্রদায়ের বিষয়ের সহিত যাহাদের সম্পর্ক আছে তাঁহারা অবশ্যই অনুভব করিয়াছেন যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নব জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইতেছে এবং যে মুসলমানদের জীবন স্পন্দন এতদিন রুদ্ধ ছিল তাহাদের মধ্যেও এখন জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে।

যাহারা আমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে লক্ষ্য করে না তাহারা মনে করে যে, আমরা সবেমাত্র রাজনীতিতে নামিয়াছি এবং আমাদের প্রতি যাহাদের শুভেচ্ছা নাই তাহারা মনে করে যে, আমরা যন্ত্র বিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহি এবং আমাদের কার্যকলাপের পিছনে অন্যের হাত রহিয়াছে। কিন্তু যাহারা আমাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন তাহাদের নিকট আমাদের এই প্রচেষ্টা নূতন কিছু বলিয়া মনে হইবে না মাত্র গতকল্য সন্ধ্যায় আমরা শিক্ষা সম্মেলনের বিংশতি অধিবেশন সমাপ্ত করিয়াছি, এবং পঁচিশ বৎসর পূর্বে স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে কাজ শুরু করিয়াছিলেন আমাদের বর্তমান কার্যকলাপ তাহারই স্বাভাবিক পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আমি স্বীকার করি যে, কয়েকটি বাহ্যিক কারণবশত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক নূতন পর্যায়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।[৩৬]

নবাব সলীমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিলাতের দলীয় সরকার ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত নহে, এই কারণে কর্তৃপক্ষ যাহারা বেশি চিৎকার করিতে পারে তাহাদের কথাই শুনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। যদি বিলাতের সরকার ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে খবর রাখিত এবং ভারতের রাজনীতিতে প্রতিপত্তিশালী দেশবাসিগণ সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকারের প্রকৃত সুবিচারের পরিচয় দিত তাহা হইলে সম্ভবত দীর্ঘকাল মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিকল্পনার

www.bjilibrary.com

কথা শোনা যাইত না এবং মুসলমানগণ তাহাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণররূপে শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিত। মুসলমানেরা শান্তশিষ্ট থাকিয়া কিছুই পায় নাই। তাহাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু নেতাগণ হয়ত অস্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা দেখান নাই, কিন্তু যাহারা বাহির হইতে এই সম্মেলনে যোগ দিতে পূর্ব বাংলায় আসিয়াছেন তাঁহারা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, ভারতের অন্তত একটি অঞ্চলে মুসলমানদের অভিযোগের যথার্থ কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

নবাব সলীমুল্লাহ বলেন যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই নাই। ১৮৯৩ সালে শ্রদ্ধেয় নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের জন্য এরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৮৮৭ সালে লক্ষ্মৌতে এক বক্তৃতায় স্যার সৈয়দ মুসলমানদেরকে তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসে যোগ না দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নবাব সলীমুল্লাহ বলেন যে, প্রায় দশ বৎসর পূর্বে সৈয়দ আহমদ যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে সেরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের সম্মুখে চারটি পথ খোলা আছে (১) রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করিয়া মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কাজ সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া, (২) রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিয়া হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করা (৩) হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়া এবং তাহাদের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা, (৪) মুসলমানদের নিজেদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা।

মুসলমানগণ তৃতীয় পথ অনুসরণ করিতে পারে না, কারণ ১৮৮৭ সাল হইতে তাহারা কংগ্রেস হইতে সরিয়া রহিয়াছে। তাহারা দ্বিতীয় পথও অনুসরণ করে নাই, মুসলমানদের পরম শত্রুগণও বলিতে পারিবেন না যে, তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে।১৮৮৭ সাল হইতে মুসলমানগণ প্রথম পথও অনুসরণ করিয়াছে, তাহারা রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয়তার নীতিতে বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় থাকায় তাহাদেরকে খুব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অসুবিধার দরুন ১৮৯৩ সালে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা সংসদ (Defence Association) নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সে সময় মুসলমানেরা রাজভক্তি দেখাইতে উদগ্রীব ছিল, কারণ শাসকেরা তখনও তাহাদের বশ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইতে পারে নাই। তাহাদের সামরিক বীর্য তখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তখন তাহাদের শিক্ষার উন্নতি অত্যাবশ্যক ছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্যের সমালোচনা করিয়া সময় নষ্ট করার মত তাহাদের অবস্থা ছিল না।[৩৭] এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। অতি সংকটজনক পরিস্থিতিতেও মুসলমানগণ রাজভক্তির প্রমাণ দিয়াছে।

www.bjilibrary.com

চিত্রল ও সীমান্তের স্বধর্মীয় লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ও রক্ষক্ষয় করিয়া মুসলমান সিপাহীগণ যে রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছে ১৮৯৭ সালে বড়লাট লর্ড এলগিন তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। অন্য কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে এরূপ রাজভক্তির প্রমাণ দিবার সুযোগ হয় নাই। মুসলমানগণ রাজভক্তির বিশেষ ও অকাট্য প্রমাণ দিয়াছে। এইজন্য তাঁহারা সরকারের নিকট বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে পারে। এক সময় মুসলমানদেরকে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হইত এবং জীবিকার জন্য কৃষিকার্য ছাড়া অন্য কোন পেশায় তাহারা ঢুকিতে পারিত না। এখন শাসকদের কাছে আমাদের মান বাড়িয়াছে, বিলাতের প্রধান রাজনীতিবিদগণ এখন মুসলমানদেরকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজভক্ত পাহারাদার বলিয়া মনে করেন। এখন আর সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের আশংকা নাই, সৈন্যদের উপর সীমন্ত পাহারার ভার দিয়া প্রধান সেনাপতি সাম্রাজের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন।

নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির উপর জোর দেন। মুলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য শিক্ষা বিস্তার অত্যাবশ্যক। তিনি মনে করেন যে, নবাব মহসিন উল-মুলক ও তাঁহার সহকর্মী ও আলীগড় কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিস্তারের কাজ ভালভাবে চলিতেছে। তিনি আশা করেন যে তাঁহাদের উদ্যমে আলীগড় কলেজের চেয়েও বেশি সৃজনশীল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহা ভারতে এক অদ্বিতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা অধিকার করিবে।[৩৮]

প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নবাব সলীমুল্লাহ বলেন যে, যুগের পরিবর্তন হইতেছে, এই যুগধর্মের প্রেরণায় মুসলমানেরা এক রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। ১৮৯৩ সাল অপেক্ষা বর্তমানে মুসলমানদের জন্য সক্রিয় প্রচারণা, তাহাদের দাবী-দাওয়া ও আশা আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্তি এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠিত বিস্তৃতি বেশি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে তাহাদের রাজভক্তি হ্রাস পাইবে না এবং চিরাচরিত শালীনতাও নষ্ট হইবে না। নবাব সলীমুল্লাহ বলেন যে, তিনি যে প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ ইহার উদ্দেশ্য হইবে। ইহাতে বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজভক্তি এবং প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের সদ্ভাব ব্যাহত হইবে না। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানগণ প্রয়োজন মত তাহাদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত সরকারের নিকট উত্থাপন করিবে। সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদি মুসলমানদের মধ্যে কখনও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, তাহা দূর করাও এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হইবে। যে বিষয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানদের স্বার্থের ঐক্য আছে সে সব বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠান সকলের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবে। মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদেরকে এককভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। অন্য সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থের সহিত মুসলমানদের যাহাতে সংঘাত না হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গৌণ স্বার্থের ব্যাপারে কোনরূপ সংঘাতের

www.bjilibrary.com

সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহাদের মুখ্য স্বার্থের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। মুসলমানদের পৃথক প্রতিষ্ঠান না থাকিলে তাহাদের পক্ষে তাহাদরে ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না।

নবাব সলীমুল্লাহ বলেন, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংস্থা ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার মুসলমাদের বিষয়ে ইহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে, মুসলমানেরা ইহার উপদেশ ও সাহায্য পাইতে পারিবে, এবং ইহার মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে ভালভাবে প্রচারিত হইতে পারিবে। বহুদিন হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপকরণ তৈরী হইয়া আছে। এই উপকরণের সাহায্যে এখন সম্মিলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের শক্তিশালী ও মহান রাজনৈতিক সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শক্তি সম্বন্ধে নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমান কবির কথা উধৃত করিয়া বলেনঃ

আযাদ রহু আওর মেরা মাশাক হায় সূলহে কুল
হারগিজ কভি কেসি সে আদাবাদ নাহি মুঝহে।৩৯

ইহার পর নবাব সলীমুল্লাহ তাঁহার প্রস্তাব উথাপন করেন। হাকীম আজমল খান, জাফর আলী এবং আরও কয়েকজন প্রতিনিধি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তাঁহারা সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সামান্য রদবদল করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় এই সভায় সর্বভারতীয় মুসলিম সংস্থা (All India Muslim League) নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য প্রস্তাব করা যাইতেছে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধন করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইবে :-

১) ভারতীয় মুসলমানদের বৃটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তি উদ্রেক করা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিলে তাহা অপনোদন করা।

২) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা করা।

৩) সংস্থার উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি অব্যাহত রাখা এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষভাব সঞ্চার না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

নবাব ওয়াকার-উল-মূলক ও নবাব মুহসিন-উল-মূলক সর্বভারতীয় মুসলিম সংস্থার (All India Muslim League) যুগ্ম-কর্মসচিব নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র রাচনার জন্য ৬০ জন সদস্য লইয়া একটি সাময়িক সংসদ (Provisional Committee) গঠিত হয়; এই সংসদকে চার মাস সময় দেওয়া হয়। মুসলিম লীগের পরবর্তী অধিবেশনে গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হইবে বলিয়া বলা হয়। ঢাকার এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করিয়া এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর নবাব সলীমুল্লাহ ও অধিবেশন সভাপতিকে

www.bjilibrary.com

ধন্যবাদ দিয়া সভার কাজ সমাপ্ত হয়।[৪০] মুসলিম লীগ গঠনের ও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক প্রস্তাবের নকল নাবাব ওয়াকার-উল-মূলক বড়লাটকে প্রেরণ করেন।[৪১]

নবাব সলীমুল্লাহর পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সলীমুল্লাহ তাঁহার প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়াছিলেন সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ (confederacy) কোন কোন প্রতিনিধি 'সংঘ' শব্দটি পছন্দ করেন নাই। এইজন্য ইহার নাম রাখা হয় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। সংঘের পরিবর্তে সংস্থা (League) হইলেও প্রতিষ্ঠানের নামের অর্থ একই থাকে। কিছু রদবদল হইলেও নবাবের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য বস্তুত অপরিবর্তিত থাকে এবং তিনি যে ভারতীয় মুসলমানদের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়।[৪২]

হিন্দু সংবাদপত্রগুলি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার তীব্র সমালোচনা করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত দি বেঙ্গলী পত্রিকায় ইহাকে 'সলীমুল্লাহ লীগ' এবং সরকারের ভাতাভোগী ও তাবেদারদের সমিতি বলিয়া বিদ্রূপ কটাক্ষ করা হয়।[৪৩] মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে শান্তি হইবে কিনা সে বিষয়ে লণ্ডনের টাইমস পত্রিকা (জানুয়ারী ১৯০৭) সন্দেহ প্রকাশ করে। ভারতের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ার মুখপত্র দি ইংলিশম্যান মন্তব্য করে যে, মানুষের প্রত্যেক কার্যকলাপের মধ্যেই কিছুটা বিপদের সম্ভাবনা থাকে: মুসলিম লীগ আন্দোলনের মধ্যেও সেরূপ থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ লীগ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য ছিল, আজ না হইলেও আগামীকাল ইহা প্রতিষ্ঠিত হইত। ইহা সুখের বিষয় যে, মুসলিম লীগকে যেরূপ প্রকৃতিতে গঠিত করা হইয়াছে তাহাতে ইহা বৃটিশ সরকারের গ্রহণযোগ্য হইবে এবং তাহা সাম্রাজ্যের শান্তি বজায় রাখার কাজে সহায়ক হইবে। সম্পাদকীয়তে মুসলমান নেতাদের সংকল্প, শালীনতা ও বিজ্ঞতার প্রশংসা করা হয়। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। রাজভক্তি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি এবং রাজভক্তি বজায় রাখিয়া নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করা তাহাদের উদ্দেশ্য।[৪৪]

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সদর দফতর লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাইর স্যার আদমজী পীরভাই এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করিয়া ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব পাশ করা হয়। লীগের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লীগের সভ্য সংখ্যা ৪০০ নির্দিষ্ট হয়। ৪০ জন সদস্য লইয়া ইহার কেন্দ্রীয় কর্মসংসদ গঠনের ব্যবস্থা হয়। ১৯০৭ সালে নবাব মুহসীন উল-মূলকের মৃত্যু হয় এবং নবাব ওয়াকার-উল-মূলক আলীগড় কলেজের কর্মসচিব নির্বাচিত হন। কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ওয়াকার উল-মূলক মুসলিম লীগের কর্মসচিবের দায়িত্ব বহন করিতে অসমর্থ হন। ১৯০৮ সালের ১৮ই মা আলীগড়ে এক বিশেষ সভা আহুত হয় এবং এই সভায় মাননীয় আগা খান লীগের স্থায়ী সভাপতি ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ইহার কর্মসচিব নির্বাচিত হন। যে সকল নেতা

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার নীতি অনুসরণ করিতে মুসলমানদেরকে এযাবত উপদেশ দিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারাই মুসলিম লীগে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন। ইহার দরুন লীগের পক্ষে রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় হইতে বেশ কিছুটা সময় লাগিয়াছিল।[৪৫] কয়েকটি প্রদেশে লীগের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগে ১৯০৮ সালের ৬ই মে লণ্ডন মুসলিম লীগের শাখা স্থাপিত হয়। আমীর আলীর সভাপতিত্বে লণ্ডন লীগ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে ১৯০৯ সালে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।[৪৬]

মুসলিম লীগের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ১৯০৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আলী ইমাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে লীগের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন এবং ভারত সচিব লর্ড মর্লির সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা দাবী করিয়া লীগের এই অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে সরকারের নিকট আবেদন করা হয় যাহাতে বঙ্গভঙ্গ রদ না করা হয়। শাসন সংস্কার পরিকল্পনার ব্যাপারে মুসলমানদের অভিমত সরকারকে জ্ঞাত করাইবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪৭]

১৯১০ সালের ২৯শে জানুয়ারী লীগের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আর্কটের যুবরাজ স্যার গোলাম মাহমুদ আলী খানের সভাপতিত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ সালে সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ভারত সচিবের ভারতীয় পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় দিল্লী অধিবেশনে মৌলবী মুহম্মদ আজিজ মির্যা লীগের কর্মসচিব নির্বাচিত হন। লীগের সদর দফতর আলী গড় তইতে লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হয়। মুসলিম লীগের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন ১৯১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নাগপুরে আহুত হয়। সৈয়দ নাজিবুল্লাহ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে। লীগের স্থায়ী সভাপতি আগা খানও সভায় যোগ দেন। মুসলিম লীগের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে হইবার কথা ছিল। এই সময়ে সম্রাটের দিল্লী দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ায় লীগের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় এবং ১৯১২ সালের মার্চ মাসে নবাব সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে কলিকাতায় লীগের এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

www.bjilibrary.com

চতুর্দশ অধ্যায়
বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ ও ইহার প্রতিক্রিয়া

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ বাংলাদেশ তথা ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয় ভারতের রাজনৈতিক জীবনে তাহা এক বিরাট ও সুদূরপ্রসারী আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রধানত শাসনতান্ত্রিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করা হইয়াছিল। বাংলাদেশ তখন বৃটিশ ভারতের মধ্যে সর্ব বৃহৎ প্রদেশ ছিল, বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার আয়তন ১৭৯,০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৭৯,০০০,০০০ ছিল। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ একজন ছোটলাটের শাসনাধীন ছিল যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকায় ছোটলাট প্রদেশের পূর্বাঞ্চল দেখাশুনা করিতে পারিতেন না। পাঁচ বৎসর কার্যকালের মধ্যে একবারও তাঁহার পক্ষে পূর্বাঞ্চল পরিদর্শন সম্ভব হইত না। এইজন্য এই অঞ্চলের জিলাগুলির উন্নতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়িত না। ফলে ইহার অধিবাসীদের উন্নতির সুব্যবস্থা হইতে পারিত না।[১]

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি প্রকাশ করে যে, বিরাট বাংলা প্রদেশের শাসন ব্যাপারে যে অসুবিধা বিদ্যমান আছে তাহা দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। ১৮৬৭ সালে বাংলার ছোটলাট স্যার উইলিয়ম গ্রে ও ১৮৭২ সালে স্যার জন কেম্পবেল অভিযোগ করেন যে, এত বড় প্রদেশের শাসনভার এক জনের পক্ষে বহন করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে শ্রীহট্ট, কাচার ও গোয়ালপাড়া একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ইহার পরও এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের শাসন ব্যাপারে অসুবিধা থাকিয়া যায় এবং সরকারী মহল হইতে ১৮৯২ সালে ও আবার ১৮৯৬ সালে সুপারিশ করা হয় যে, আসাম ও পূর্ব বাংলার জিলাগুলি লইয়া একটি প্রদেশ গঠন করা উচিত।[২] ১৯০১ সালে মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার এনড্রো ফ্রেজার উড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং ইহার উপর ভারত সরকারের কর্মসচিবগণ বিভিন্ন পরিকল্পনা সুপারিশ করেন। অবশেষে তাঁহাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি বড়লাট লর্ড কার্জনের নিকট উপস্থাপিত হয়। বড়লাট বিস্মিত হন যে, তাঁহার অজ্ঞাতে বাংলাদেশ, মদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশের ভৌগোলিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হইতেছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, শাসনতান্ত্রিক কারণে বহুদিন হইতে বাংলাদেশে প্রদেশের ভৌগোলিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল এবং লর্ড কার্জনের অজ্ঞাতে তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ এই প্রদেশ বিভাগের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। বড়লাট তাহাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং এই বিষয়ে ভারত সচিব লর্ড হেমিলটনের সহিত পত্র বিনিময় করেন।[৩]

এনড্রো ফ্রেজার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ প্রদেশ বিভাগের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহা বিভাগের পক্ষে তিনি রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ

www.bjilibrary.com

করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, যদি ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহা হইলে এই অঞ্চলের অশান্তি কমিয়া যাইবে এবং পূর্ববাংলা হইতে যে গুরুতর শাসন সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা দূর হইবে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, লর্ড কার্জন ফ্রেজারের উল্লিখিত রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথাও বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাদ্বয় আসামের সহিত যুক্ত করিবার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। শিক্ষিত হিন্দুগণ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস মনে করে যে, বাঙ্গালী জাতীয়তার উপর আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী রিজলী তাঁহার মন্তব্যে বলেন, "কংগ্রেস মনে করে যে, বাংলাদেশ যুক্ত থাকিলে ইহা খুব শক্তিশালী হয়, বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে ইহার শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্নমুখী হইয়া পড়িবে। ইহা খুবই সত্য এবং ইহাই হইবে আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম সুফল।"[৪]

এই পরিকল্পনা মুসলমানদেরও মনঃপুত হয় নাই। ১৯০৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী ঢাকা সুহৃদ সংঘ এক সভায় আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলি লইয়া (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার বাদ দিয়া) একটি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী করে।[৫] ১৯০৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড কার্জন তাঁহার পরিকল্পনার বিষয়ে সরজমিনে তদন্তের জন্য পূর্ববাংলা অঞ্চল পরিদর্শন করিতে আসেন। ঢাকায় নবাব সলীমুল্লাহ্ বড়লাটকে রাজকীয় আতিথেয়তা প্রদান করেন। এই সময় তিনি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার ব্যাপারে বড়লাটের নিকট মুসলমানদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাগুলি আসামের সহিত যুক্ত হইলে এই অঞ্চলের মুসলমানদের বিশেষ উপকার হইবে না। তিনি এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য একটি প্রদেশ দাবী করেন। পূর্ববাংলা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া লর্ড কার্জন উপলব্ধি করেন যে, বাংলাদেশ সরকারের শাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রেজারের পরিকল্পনার কিছুটা সম্প্রসারণ করা দরকার।[৬]

লর্ড কার্জন বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল আসাম নিয়া পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ভারত সচিব ব্রডারিক ইহা অনুমোদন করেন। বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনার ১৯০৫ সালের ১০ই জুলাই প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, চট্টগ্রাম ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলি লইয়া দার্জিলিং বাদ দিয়া, কিন্তু মালদহ ও পার্বত্য ত্রিপুরা জিলাদ্বয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। এই নূতন প্রদেশের আয়তন ১০৬,৫০৪ বর্গমাইল ও ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৩১,০০০,০০০ ছিল। ইহার অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ১৮,০০০,০০০ মুসলমান ও ১২,০০০,০০০ হিন্দু ছিল। পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থাপিত হয়। নবগঠিত প্রদেশের জন্য ছোটলাট, একটি ব্যবস্থাপক পরিষদ ও একটি রাজস্ব বোর্ডের ব্যবস্থা হয়। প্রদেশের বিচার বিভাগ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে রাখা হয়। পশ্চিম বাংলা পুরাতন বঙ্গদেশ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার আয়তন ১৪১৫৮০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা

www.bjilibrary.com

৫৪,০০০,০০০। ইহাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ৪২,০০০,০০০ ও মুসলমানদের সংখ্যা ৯,০০০,০০০ ছিল।

লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়া একটি প্রদেশ হইলে তথাকার অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায় প্রভৃতির উন্নতির পথ সুগম হইবে। তিনি আশা করেন যে, এই নূতন প্রদেশ কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের অন্যতম ঐশ্বর্যশালী প্রদেশে পরিণত হইবে।[৭] ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলাদেশ বিভাগের পিছনে রাজনৈতিক কারণও বিদ্যামান ছিল। ভারতের রাজনীতিতে তখন বাঙ্গালী হিন্দুদের খুব প্রভাব ছিল। বাংলাদেশ বিভক্ত করিয়া ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালীদের প্রভাব নষ্ট করা কার্জনের পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তা'ছাড়া তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুদের থেকে পৃথক করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে হিন্দুগণ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে না পারে। ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন লিখিয়াছিলেন, 'আমার বিশ্বাস যে, কংগ্রেস এখন পতনের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে; এবং ভারতে থাকাকালে কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা আমার একটি বড় আকাঙ্ক্ষা।"[৮] ফ্রেজার মন্তব্য করিয়া ছিলেন যে, ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হইলে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের উপর হইতে হিন্দু নেতাদের প্রভাব লোপ পাইবে।[৯]

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশ বিভাগ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। স্যার বেম্পফিলড ফুলার পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট নিযুক্ত হন। ঢাকায় তাহার বিপুল সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে নবাব সলীমুল্লাহ লিখিয়াছেন যে, নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা আছে। জনসাধারণ ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছে যে, পূর্ববাংলার অধিবাসীদের জন্য বাংলাদেশ বিভাগ করা হইয়াছে। এই প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ; এই কারণে তাহারা সরকারের নিকট হইতে বিশেষ বিবেচনা লাভ করিবে। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। এতদিন দরিদ্র মুসলমান যুবকরা কৃতিত্বের সহিত বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় পাশ করিয়াও উপযুক্ত চাকুরী পাইত না, নূতন প্রদেশে তাহারা উপযুক্ত চাকুরী পাইতেছে। ফলে দরিদ্র পিতামাতাগণ তাহাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়া শিখাইতে উৎসাহ পাইতেছে।[১০] বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া নবাব সলীমুল্লাহ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বলেন যে, হিন্দুগণ কালক্রমে বুঝিতে পারিবে যে, পূর্ববাংলা প্রদেশ স্থাপিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীগণ বিভক্ত হয় নাই; বরং দুইটি সহোদরা প্রদেশের শাসন, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির সুব্যবস্থা হইবে এবং বাঙ্গালী জাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।[১১]

১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সাম্বাৎসরিক উপলক্ষে ইষ্টার্ণবেঙ্গল এণ্ড আসাম ইরা পত্রিকা লিখিয়াছে যে, নূতন প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পূর্বাঞ্চলের নিম্নলিখিত সুবিধা হইয়াছে:-(১) ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি; (২) নদী ও খালগুলির উন্নতি এবং রেললাইনের সম্প্রসারণ ও চট্টগ্রামের সহিত ইহাদের

www.bjilibrary.com

সংযোগ স্থাপন; (৩) নূতন প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের পক্ষে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুযোগ সুবিধা; (৪) সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা ও জনসাধারণের জানমালের অধিকতর নিরপত্তা; (৫) পূর্ববাংলার শিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সংস্পর্শে আসায় অনুন্নত আসামের অধিবাসীদের উপকার; (৬) পূর্ববাংলার জন্য কর্মদক্ষ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা; (৭) প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি; (৮) এক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণ এখন প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তার সংস্পর্শে আসিতে পারে, এবং পূর্বে ইহা সম্ভব ছিল না।[১২]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন : হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এবং তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা ইহাকে জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আঘাত বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা ইহাকে মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন।[১৩] তাঁহারা ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "নূতন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে; বাঙ্গালী হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইবে। আমাদেরকে নিজেদের দেশে আগন্তুকের মত থাকিতে হইবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছি।"[১৪] আইনজীবীগণ বঙ্গভঙ্গের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। বুদ্ধিজীবীরা ইহাকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক নেতাগণ সমালোচনা করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার বাংলাদেশ বিভাগ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, বৃটিশ শাসক ও মুসলমানদের মধ্যে মিত্রতার ফলে বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়াছে।[১৫]

খ্যাতনামা নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ বিভক্ত করিয়া হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা হইয়াছে। কলিকাতার হিন্দুরা ১৬ই অক্টোবর জাতীয় শোক দিবস পালন করে। সভায় নেতাগণ বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন।[১৬] বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কংগ্রেস ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করে। বিলাতী দ্রব্য বয়কট করা হয়। বিলাতী দ্রব্যে প্রকাশ্যে আগুন লাগানো হয়। ছাত্ররা সরকারী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে। জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়; কিন্তু ইহা কার্যকরী করা হয় নাই।[১৭] কংগ্রেসের মারাঠী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তা সুসংহত করার জন্য মারাঠাদের নায়ক শিবাজীকে ভারতের সকল হিন্দুদের জাতীয় বীরের

www.bjilibrary.com

আসনে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। দেশের সর্বত্র শিবাজীর জন্ম বার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপালিত হয়। সভায় সভায় কংগ্রেসের নেতাগণ মুসলমান সম্রাটের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রামের প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে হিন্দুদের জাতীয় বীর ও তাঁহার সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করেন। এতদ্ব্যতীত এই সময় বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গড়িয়া উঠে। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদেরকে হত্যা করিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল।[১৮]

বঙ্গভঙ্গ রদ : ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও বড়লাট লর্ড মিন্টো মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গ একটি চূড়ান্ত বাস্তব। স্যার হেনরী বেনারম্যানের নূতন শ্রমিক সরকারও বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করেন।[১৯] কিন্তু বেনারম্যান আবার এরূপ মন্তব্যও করেন যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ কারণ থাকিলে বিষয়টির পুনর্বিবেচনা হইতে পারে। ইহাতে সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ববাংলার মুসলমান নেতাদের মনে সন্দেহ জন্মে। তাঁহারা স্মারকলিপির মাধ্যমে সরকারকে তাঁহাদের আশঙ্কার কথা জানান। ইহার পর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং প্রকাশ করেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইলে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হইবে।[২০]

কিন্তু নূতন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য গোপনে পরিকল্পনা রচনা করেন। বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য স্যার জন জেনকিন্‌স নূতনভাবে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের এবং কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন।[২১] শাসন পরিষদের অনুমোদনের পর এই নূতন পুনর্গঠন পরিকল্পনা ২০শে আগষ্ট ভারত সচিব ক্রিউর নিকট প্রেরিত হয়। নূতন পরিকল্পনায় বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এই পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ লইয়া বাংলাদেশ প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই নূতন বাংলাদেশ প্রদেশের আয়তন ৭০০০০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৪২,০০০,০০০ হইবে। ইহার রাজধানী হইবে কলিকাতা। বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া অন্য একটি প্রদেশ গঠিত হইবে এবং ইহার রাজধানী হইবে পাটনা। শ্রীহট্টসহ আসাম চীফ কমিশনারের শাসনাধীন থাকিবে। বড়লাট মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে আশ্বাস দেন।[২২] লর্ড হার্ডিঞ্জের ব্যক্তিগত কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, লর্ড ক্রিউ (Crewe) প্রথমে নূতনভাবে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করেন। বড়লাটও বুঝিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শান্ত করা খুবই প্রয়োজন।[২৩]

১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সচিব বঙ্গদেশ পুনর্গঠনের নূতন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত করা হয়। ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনা

www.bjilibrary.com

ঘোষণা করেন। ইহার ফলে বাংলা ভাষাভাষী পাঁচটি বিভাগ লইয়া বাংলাদেশ পুনর্গঠিত হয়, বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ হইতে পৃথক করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

রঙ্গভঙ্গ রদ করায় স্বভাবতই হিন্দুগণ সন্তুষ্ট হয়। কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার বৃটিশ শাসকদের রাজনীতিবত্তার প্রশংসা করেন। কংগ্রেসের ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারাময় লিখিয়াছেন যে, ১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়, বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া বৃটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দেন।[২৪]

বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় মুসলমানেরা মর্হাহত হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসার হইতেছিল। পাঁচ বৎসরে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ৩৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।[২৫] নূতন প্রদেশের অধিবাসীদের উন্নতির ব্যাপারে সরকারের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করায় তাহাদের এই বিশেষ উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। মুসলমানেরা নিরাশ হইয়া পড়ে এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। নবাব ওয়াকার-উল মূলক বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের দরুন ভবিষ্যতে মুসলমানগণ সরকারের উক্তি ও কার্যের উপর আস্থা রাখিতে পারিবে না।[২৬] মাওলানা মুহম্মদ আলী মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকারের বিশ্বাসভঙ্গের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, মুসলমানগণ তাহাদের রাজভক্তির প্রতিদানে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।[২৭] বঙ্গভঙ্গ রদ করায় মুসলমানগণ যে কিরূপ মর্মাহত হইয়াছিল তাহা নবাব সলীমুল্লাহ ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে ব্যক্ত করেন। দিল্লী দরবারে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে কে, সি, আই, ই, উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। কিন্তু তিনি এই উপাধিকে ঘুষ ও তাঁহার গলায় অপমানের বন্ধন বলিয়া গণ্য করেন।[২৮]

পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকে শান্ত করার জন্য বড়লাট ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারী ঢাকায় আসেন এবং তাহাদেরকে আশ্বাস দেন যে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারত সরকার ২রা ফেব্রুয়ারী এক ইশতেহারে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রকাশ করে। হিন্দু নেতাগণ এই প্রস্তাবের বিরেধিতা করেন; তাঁহারা মনে করেন যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বাংগালী জাতি বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্য তীব্রতর হইয়া উঠিবে। পূর্ববাংলার প্রধানত কৃষিজীবী মুসলমানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে হইতে কোন উপকার পাইবে কিনা সে বিষয়ে তাহারা সন্দেহ প্রকাশ করেন।[২৯] লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন।[৩০]

বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দরুন হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। মুসলমান নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, পূর্ব বাংলা প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ

www.bjilibrary.com

মুসলমানরা সুবিধা পাইবে এবং তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এইজন্য হিন্দুগণ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিতেছে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, যখন ভারতের সবগুলি প্রদেশে একই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন তখন পূর্ববাংলার একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হইলে তাহাতে কি জন্য জাতীয় সংহতি বিপন্ন হইবে।[৩১]

এন সি চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষভাব দেখা দেয়। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মনে এইরূপ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয় যে, তাহাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও আন্তরিক মিলামিশার সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়। রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, দোকানপাট, হাট বাজার সর্বত্র একই বিদ্বেষ ছড়াইয়া পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্রগণ তাহাদের সহপাঠী মুসলমান ছাত্রদের পাশে বসিত না; তাহারা বলিত যে, মুসলমান ছেলেদের নিকট হইতে পেয়াজের গন্ধ আসে। ক্লাসে মুসলমান ও হিন্দু ছেলেদের জন্য পৃথক পৃথক শাখার ব্যবস্থা হইত।[৩২] এই সকল কারণে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানগণ একে অন্যের নিকট হইতে দুরে সড়িয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের রাজভক্তির চরম পরীক্ষা হয়। মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে। রাজভক্ত থাকিয়া ও তাহারা সরকারের নিকট হইতে এইরূপ আঘাত পায়। ইহার দরুন যুবক ও শিক্ষিত মুসলমানেরা তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের রাজভক্তির নীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কলিকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের এক সভায় তাঁহারা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এক প্রস্তাব পাশ করেন।[৩৩] রাজভক্তির নীতি ও বৃটিশ সরকারের ন্যায় বিচারের উপর নবাব সলীমুল্লাহর খুব আস্থা ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করায় তিনি খুব মর্মাহত হন। কিন্তু তিনি রাজভক্তির নীতি সরাসরি ত্যাগ করার পক্ষপাতি হইতে পারেন নাই। তিনি এ বিষয়ে একমত হন যে, বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া সরকার মুসলমানদের যে ক্ষতি করিয়াছে সেইজন্য তাহাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত; কিন্তু তিনি মনে করেন যে, মুসলমানের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দাবী ও রাজভক্তির নীতির মধ্যে সমতা রাখিয়া চলা বিবেচনার কাজ হইবে।[৩৪] নবাব সলীমুল্লাহর মনোভাব কলিকাতার মুসলিম লীগের অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে প্রকাশ পায়।

সলীমুল্লাহর অভিভাষণ : বঙ্গভঙ্গ রদ জনিত নৈরাশ্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে কলিকাতায় ১৯১২ সালের ৩রা মার্চ মুসলিম লীগের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নবাব সলীমুল্লাহ তাঁহার সভাপতির ভাষণের প্রারম্ভে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মুসলিম লীগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারত ভ্রমণ ও যুগান্তকারী দিল্লী দরবারের কথা উল্লেখ করেন তাঁহাদের প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধা ও রাজভক্তি জ্ঞাপন করেন। তিনি দিল্লী দরবারের কয়েকটি ঘোষণার

www.bjilibrary.com

উল্লেখ করেন এবং মন্তব্য করেন যে ইহাদের একটি পূর্ববাংলার মুসলমানদের মনে আঘাত করিয়াছে এবং তাহাদের ঘরে ঘরে বিষাদের সঞ্চার করিয়াছে। কলিকাতা হইতে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইহাতে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপকার হইবে।[৩৫]

বঙ্গভঙ্গ রদের সমালোচনা করিয়া সলিমুল্লাহ বলেন, "আমি আর একটি দরবার ঘোষণার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছিনা এবং এই সম্বন্ধে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা না বলিয়াও উপায় নাই। এই ব্যাপারে আমি চুপ থাকিতে পারি না, কারণ আমি চুপ করিয়া থাকিলে তাহার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইতে পারে। আমি দুঃখিত যে, আমাকে এইরূপ কথা বলিবার ঝুকি লইতে হইতেছে যাহার ফলে আমার বিরূপ সমালোচনা হইতে পারে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদের দরুন মুসলমানদের মনে যে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে তাহা প্রকাশের এই সুযোগ আমি ত্যাগ করিতে পারি না।" বঙ্গভঙ্গের ফলে অনুন্নত পূর্ববালা ও আসামের অবহেলিত অধিবাসীগণ উন্নতির যে সুযোগ পাইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, যাহারা পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের উন্নতির ব্যবস্থা সহ্য করিতে পারে নাই তাহারা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য তীব্র আন্দোলন ও রাজদ্রোহীতামূলক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইয়াছিল। তিনি বলেন যে, বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহীতামূলক আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়াছে। ইহাতে সারকারের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং বৃটিশ শাসনের মর্যাদা খর্ব হইয়াছে। তিনি মন্তব্য করেন, "এতদিন সমগ্র প্রাচ্যে মনে করা হইত যে, বৃটিশ সরকাররের কথাই ইহার বন্ধন এবং যাহাই ঘটুক না কেন সরকার কখনও ইহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। যদি কোন কারণে এই বিশ্বাস খর্ব হয় তাহা হইলে ভারতে ও প্রাচ্যের সর্বত্র বৃটিশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে।[৩৬]

নবাব সলিমুল্লাহ বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে পূর্বে জানানো হয় নাই বা তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে মুসলমানেরা আরো বেশি দুঃখিত হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা আন্দোলন করিতে পরিত, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে সংযত রাখিয়াছে এবং সরকারের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা হইতে বিরত রহিয়াছে। তিনি বলেন, "আমি আশা করি, আমরা অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের সম্রাটের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ত রাজভক্তির ও অকুণ্ঠ বাধ্য তার যে প্রমাণ দিয়াছি তাহা দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিবে।"[৩৭]

সরকার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নবাব সলিমুল্লাহ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হিন্দুদের বিরোধিতার নিন্দা করেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ ও বিশেষ সুবিধার দাবী করেন।[৩৮] তিনি ব্যবস্থাপক সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের উপর জোর দেন। তিনি সরকারের নিকট আবেদন করেন যেন দাতাদের ইচ্ছানুযায়ী ওয়াকফ সম্পত্তি ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হয়।[৩৯] তিনি শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের চাকুরী সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে,

www.bjilibrary.com

চাকুরীতে নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সরকারের কর্তব্য এবং মুসলমান প্রার্থীদেরকে এই ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা উচিত। যতদিন সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন এই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।[৪০] শিক্ষার উন্নতির জন্য বরিশালের হাজী মুহম্মদ ইসমাইল যাহা করিয়াছেন নবাব সলীমুল্লাহ্ তাঁহার প্রশংসা করেন।[৪১]

অভিভাষণের শেষে নবাব সলীমুল্লাহ্ স্বাস্থ্য হানির দরুন রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গত বৎসর আমি আপনাদের একজন সামান্য সহচর সৈনিক ছিলাম এবং আপনারা আমাকে সব সময় যুদ্ধের মধ্যস্থলে দেখিয়াছেন। দশ বৎসরের অধিক পূর্বে যখন আমি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখন আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা চারিদিক হইতে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আল্লাহর রহমতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হইয়াছে। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।" তিনি বলেন যে, তিনি এখন নিশ্চিন্ত মনে অবসর গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যখনই জাতির সেবার জন্য ডাক পড়িবে তখনই তিনি সাড়া দিবেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহাদের বলিষ্ঠ হাতে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা পাইবে।[৪২]

ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুন নবাব সলীমুল্লাহ্ প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের অন্য কারণও ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করায় তিনি নিরাশ হইয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি রাজভক্তির নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু তখনকার শিক্ষিত যুবকদের ভাবধারার সহিত রাজভক্তির নীতি সামঞ্জস্য বিধান কঠিন হইয়া পড়ে। শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরা বৃটিশ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারা প্রাচীনপন্থী বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের রাজভক্তি নীতির প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শান্তিপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব হইবে না।

নবাব সলীমুল্লাহর কয়েকজন সহচর রাজভক্তির নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ধনবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী ও কুমিল্লার শাসসুল হুদা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা পূর্ববাংলা আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইহার পর ১৯১২ সালে শামসুল হুদা বাংলার গবর্ণরের কর্মপরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। নওয়াব আলী চৌধুরী ও শামসুল হুদা নবাব সলীমুল্লাহর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া মুসলমানদের রাজনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। অন্যদিকে শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরা বুঝিতে পারে যে, মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এ, কে, ফজলুল হক বাংলাদেশের এই মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের ভাবধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিলেন।

www.bjilibrary.com

বঙ্গভঙ্গ রদ ছাড়াও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আরও কয়েকটি অভিযোগ ছিল। বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে ইতালী কর্তৃক ত্রিপলী আক্রমণ সমর্থন করে। ইহাতে মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আলীগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারেও সরকার গড়িমসি করিতেছিল। যদিও মুসলমান নেতাগণ পর্যাপ্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবু সরকার কোন না কোন অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে বিলম্ব করিতে থাকে।[৪৩]

এই সমস্ত কারণে বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয় এবং তাহাদের ভাবধারা মুসলিম লীগের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের প্রভাবে মুসলিম লীগের নীতি ও কর্মসূচী পরিবর্তিত হয়। রাজভক্তির নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯১২ সালে ৩১শে ডিসেম্বর বাকিপুরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ পরিষদের এক সভায় মাওলানা মুহম্মদ আলী, সৈয়দ ওয়াজির হাসান ও মুহম্মদ আলী জিন্নাহর[৪৪] উদ্যোগে এক প্রস্তাব পাশ হয় এবং এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা মুসলিম লীগের লক্ষ্য। মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি আগা খান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। আগা খান, নবাব ওয়াকার উল মূলক ও অন্যান্য রাজভক্ত সদস্যগণ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাঁহারা ব্যর্থ হন। মুসলিম লীগের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন ১৯১৩ সালের ২৩শে মার্চ লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। মিয়া মুহম্মদ শফী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও সরোজিনী নাইডু লীগের এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে লীগ পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন দাবী মুসীলম লীগের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪৫] অন্য সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের উপযোগী স্বায়ত্তশাসন অর্জন মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয়।

www.bjilibrary.com

পঞ্চদশ অধ্যায়
ফজলুল হক ও হিন্দু–মুসলিম সহযোগিতা

বাংলার মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা নবাব সলীমুল্লাহ ১৯১২ সালে প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরেও বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব বজায় ছিল। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানদের নেতৃত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজভক্ত অভিজাত শ্রেণী তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে অসমর্থ হন। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হুদা, স্যার এ, কে গজনবী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুসলমান যুব সম্প্রদায় এই নীতির প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অভিজাত শ্রেণীর নেতাগণ জমিদার সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সংযোগ ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন যে, তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় আইনসভায় এক বিতর্কে স্যার এ, কে, গজনবী বলিয়াছিলেন যে, ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন হাজার হাজার নিরক্ষর গ্রামবাসীকে ভোটাধিকার প্রদান করিয়া তাহাদেরকে বিপথে চালিত করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে।[১]

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রচলন, প্রজা আন্দোলন ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ইত্যাদির ফলে অভিজাত শ্রেণীর নেতাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী ক্ষুণ্ন হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের প্রগতিশীল কর্মসূচী ও প্রজাকল্যাণকর কার্যকলাপের দ্বারা জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এ, কে, ফজলুল হক মুসলমানদের প্রধান নেতার আসন দখল করেন। ফজলুল হক ও তাঁহার রাজনৈতিক সহচরেরা মুসলিম রাজনীতিতে নুতন কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহারা সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ রাজভক্তি নীতি পরিহার করেন। দেশের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রামে তাঁহারা হিন্দুদের সহিত সহযোগিতা করার পক্ষপাতি ছিলেন। আবার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তাঁহারা সচেতন ছিলেন। ফজলুল হক তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের জনপ্রিয় নেতা হইয়া উঠেন। জনসাধারণের উপর তাঁহার অসামান্য প্রভাব স্থাপিত হয়। কৃষকদের জন্য তাঁহার অকৃত্রিম দরদ, মুসলমানদের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহার দুর্দম সাহসের জন্য তাঁহার নাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে এবং জনসাধারণের নিকট তাঁহার নাম মন্ত্রের মতো কাজ করে।

ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ শে অক্টোবর বরিশালের অন্তর্গত চাখারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ও বি, এল, পাশ করিয়া ১৯০০ সালে তিনি কলিকাতায় স্যার আশুতোষ মখার্জির সহকারীরূপে আইন ব্যবসা

www.bjilibrary.com

শুরু করেন। ১৯০২ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি বরিশালে চলিয়া আসেন। এই সময় হইতে তিনি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সাল হইতে কয়েক বৎসর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে চাকুরী করেন। কো-অপারেটিভ বিভাগের রেজিস্ট্রারের পদ না দেওয়ায় তিনি ১৯১২ সালে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দেন। তিনি আইন ব্যবসায় ফিরিয়া আসেন এবং অল্পকালের মধ্যেই আইনজীবীরূপে কলিকাতায় খ্যাতি অর্জন করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতেও তিনি বিশিষ্ট আসন লাভ করেন। তিনি বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মসচিব নির্বাচিত হন; নবাব সলিমুল্লাহ ইহার সভাপতি ছিলেন।[২] ১৯১৩ সালে ফজলুল হক ঢাকা বিভাগ হইতে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি তাঁহার নির্বাচনী বক্তৃতায় কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণের জন্য তাহার সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং সারা জীবন তিনি তাহাদের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

১৯১৩ সালে এপ্রিল মাসে ফজলূল হক বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি যেরূপ সাহসের সহিত সরকারের নীতি ও কার্যের তীব্র সমালোচনা করেন তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বাধীনতার স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বক্তৃতায় মুসলিম রাজনীতিতে এক নূতন সুর ধ্বনিত হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের রাজভক্তির সুরের সহিত এই সুরের সঙ্গতি ছিল না। মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর রাজভক্ত নেতাদের অভ্যস্ত সৌজন্যের পথ বর্জন করিয়া ফজলুল হক সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, মুসলমানদের দাবীর প্রতি ক্রমাগত উপেক্ষা করিয়া চলিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য সৈয়দ শামসুল হুদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন এবং ফজলুল হকের উক্তির সত্যতা অস্বীকার করেন। কিন্তু শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় ফজলুল হককে তাঁহার জোরদার বক্তৃতার জন্য যেভাবে অভিনন্দিত করে তাহাতে মনে হয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল।[৩] 'বঙ্গভঙ্গ রদ করায় ফজলুল হক সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই গুরুতর অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা দাবী করেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলিম কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে সরকারের গড়িমসি নীতির উল্লেখ করিয়া তিনি মন্তব্য করেন, "আমরা সরকারের বহু প্রস্তাবের মধ্যে প্রচুর আশ্বাসের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বাস্তব সত্য যেরূপ মুসলমানদের উপকারে আসে নাই এই সকল শুভেচ্ছামূলক প্রতিজ্ঞা ও অবাস্তবায়িত অঙ্গীকার হইতেও তাহারা উপকার পাইবে না।" তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থার দাবী জানান।[৪]

বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১৩ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকায় বাংলাদেশের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি রূপে ফজলুল হক যে অভিভাষণ দেন তাহা হইতে তাহার স্বাধীন চেতনা সংগ্রামী মনের

www.bjilibrary.com

পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, "আমি শাসকদেরকে আশ্বাস দিতে পারি যে, শাসন ব্যবস্থা যত বেশিই সহানুভূতিহীন হউক না কেন মুসলমানেরা ইহার প্রকোপ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে, এবং তাহারা বঙ্গভঙ্গ রদ জনিত অবিচার সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকিবে। আমি বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয় উল্লেখ করিয়া শুধু ইহাই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, সময়ের ব্যবধান হইলেও মুসলমানগণ এরূপ কোন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারে না যাহার ফলে তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে পারে।[৫]

ফজলুল হকের আবির্ভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক ছিলেন এবং নিপীড়িত কৃষক ও জনসাধারণের মুক্তির জন্য সংগ্রামী নায়ক ছিলেন। তিনি প্রধানত মুসলমানের নেতা ছিলেন এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি সাহসের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মুসলমানদের মঙ্গল করিতে হইলে তাহাদেরকে হিন্দুদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতে হইবে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া দেশের সত্যিকার কল্যাণ সাধিত হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, হিন্দু মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হইলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হইবে এবং সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইবে। তখন চুক্তি অনুযায়ী উভয় সম্প্রদায় ক্ষমতার অংশীদার হইবে।[৬] এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ফজলুল হক মুসলিম লীগের সভ্য হইয়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৪ সালে মেদেনীপুরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।[৭] ফজলুল হক ও তাঁহার রাজনৈতিক সহচরদের চিন্তাধারা ও সহযোগিতার মনোভাবের ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক বুঝাপড়া ও সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। তুরস্ক ও ইরানের প্রতি সরকারের বিরুদ্ধ মনোভাব ও লক্ষ্ণৌর মসজিদ সম্পর্কিত ঘটনার দরুন এই সময় ভারতীয় মুসলমানগণ শাসকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।[৮]

দেশের বৃহত্তম স্বার্থের জন্য হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে ফজলুল হকের ন্যায় বাংলাদেশের আরও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার আব্দুর রসুলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭০ সালে কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত গুণায়ক গ্রামে আবদুর রসুলের জন্ম হয়। তিনি বিলাত হইতে এম, এ, ও, বি, সি, এল, পাশ করেন এবং ১৮১৮ সালে কলিকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেসে থাকিয়া ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি সজাগ ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে 'দি মুসলমান' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা মুসলমানদের প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করিতে প্রয়াস পান।[৯]

www.bjilibrary.com

লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে বাংলাদেশের ভূমিকা : স্বায়ত্তশাসন মুসলিম লীগের লক্ষ্য ছিল। কংগ্রেস স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে মুসলিম লীগও কংগ্রেসের মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু এই দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেস সভ্য যোগ দেন এবং সারোজিনী নাইডু লীগের সভায় বক্তৃতাও করেন। এই দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সমঝোতার জন্য কংগ্রেস ও লীগের নেতাগণ যুক্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এক প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ অন্য প্রতিষ্ঠানের সভায় যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মুসলিম লীগের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন মযহারুল হকের সভাপতিত্বে ১৯১৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়।[১০] এই সভায় নবাব সলীমুল্লাহ, আলতাফ হোসেন হালী ও খাজা গোলাম উস সাকলাইনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস অধিবেশনেও এই সময় বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সভাপতি এস পি, সিংহ ও লীগের সভাপতি মাযহারুল হক তাঁহাদের অভিভাষণে হিন্দু, মুসলিম ঐক্য ও সহযোগিতার উপর জোর দেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, আবদুর রসুল, ফজলুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে এই দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বৃটিশ সরকারের নিকট যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিবে। মুসলিম লীগের তরফ হইতে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি সংস্কার সংস্থা গঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষ হইতে এই সংস্থায় ১১ জন সভ্য ছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরী, আবদুর রসুল, ফজলুল হক, মুহম্মদ ইসমাইল খান, মুজিবর রহমান, মাওলানা আকরাম খান ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ইহাদের অন্যমত ছিলেন।[১১] কংগ্রেসও শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি সংস্কার সংস্থা গঠন করে।

১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ১৯জন মুসলমান ও হিন্দু সভ্য সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে তাঁহারা একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী এই স্মারকলিপিতে দস্তখত করেন নাই, কারণ তিনি মনে করেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয় নাই।[১২]

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যদের স্মারকলিপি উপস্থাপনের পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্মতৎপর হইয়া উঠে। উভয়ের গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার জন্য নবেম্বর মাসে কলিকাতায় ইহাদের সংস্কার সংস্থাদ্বয়ের বৈঠক বসে। ইহার পর কংগ্রেস ও লীগের বার্ষিক অধিবেশন ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে আহুত হয়। মুসীলম লীগের অধিবেশনে (নবম বার্ষক) এম, এ, জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেন এবং আবদুর রসুল যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রস্তাব আনয়ন

www.bjilibrary.com

করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[১৩] কংগ্রেস অধিবেশনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের গৃহীত এই যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা লক্ষ্ণৌ-চুক্তি (Lucknow Pact) নামে অভিহিত।

লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা ও আইন সভাগুলিতে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার দাবী মানিয়া লয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি সম্প্রসারিত করিতে হইবে এবং ইহাদের তিন চতুর্থাংশ আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি সম্প্রসারিত করিতে হইবে। এবং ইহাদের তিন চতুর্থাংশ আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদেরকে তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি আসন দেওয়া হয়। যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেগুলির আইনসভায় মুসলমানদেরকে অতিরিক্ত আসন দেওয়া হয়। ইহার বিনিময়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে হিন্দুদেরকে অতিরিক্ত আসন দিতে হয়।

তখন বাংলাদেশের লোক সংখ্যার শতকরা ৫৪ জন মুসলমান ছিল। সংখ্যা লঘিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদেরকে অতিরিক্ত আসন দিবার জন্য ফজলুল হক ও অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ বাংলাদেশের আইনসভায় মুসলমানদের জন্য শতকরা মাত্র ৪০টি আসন লইতে স্বীকার করেন এবং শতকরা ৪টি আসন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থের জন্য ছাড়িয়া দেন। পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫। পাঞ্জাবের মুসলমান নেতাগণ শতকরা ৫০টি আসন রাখিয়া ৫টি আসন অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সুবিধার জন্য ছাড়িয়া দেন। ইহার বিনিময়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানেরা অতিরিক্ত আসন লাভ করে। ইহাদের লোকসংখ্যা ও অতিরিক্ত আসন ব্যবস্থা নিম্নরূপ ছিল।

প্রদেশ	মুসলমানদের সংখ্যা, শতকরা	আসন, শতকরা
যুক্তপ্রদেশ	১৪	৩০
মধ্যপ্রদেশ	৪	১৫
মাদ্রাজ	৭	১৫
বোম্বাই	২০	৩৩
বিহার	১৩	২৯

লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া বাংলাদেশের মুসলমানগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সুবিধার জন্য বিরাট স্বার্থ ত্যাগের পরিচয় দেয়; প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইতে সম্মত হয়। এই জন্য কোন কোন নেতা ফজলুল হক ও তাঁহার রাজনৈতিক সহচরদের তীব্র সমালোচনা করেন। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন সভ্য লক্ষ্ণৌ চুক্তির প্রতিবাদে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলিম সংস্থায় (Central National Muhammedan Association) যোগদান করেন। কয়েকজন সভ্য

www.bjilibrary.com

আবার ভারতীয় মুসলিম সংস্থা (Indian Moslem Association) নামে এক নূতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই অবস্থায় ফজলুল হক লক্ষ্ণৌচুক্তির অন্যান্য সমর্থকেরা বড়ই সমস্যায় পড়িয়া যান এবং তাঁহারা বাংলাদেশের আইনসভায় আসন বন্টন ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০টি আসন দাবী করেন।[১৪] বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং প্রদেশের অন্যান্য মুসলিম সংস্থাগুলি মন্টেগো, চেমসফোর্ড ও বাংলাদেশ সরকারের নিকট বাংলাদেশের আইন সভায় মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০টি আসনের দাবী জানায়।[১৫] ১৯১৯ সালের মন্টেগো চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাশ হইলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের আইনসভায় মুসলমানদেরকে মাত্র শতকরা ৪৫টি আসন দেওয়া হইয়াছে।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের দশম অধিবেশন ১৯১৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে মাওলানা মুহম্মদ আলীর সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাঁহাকে অন্তরীণাবদ্ধ করায় তিনি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই। এইজন্য সভাপতির আসন শূন্য রাখা হয়।[১৬]

মুসলিম লীগের একাদশ অধিবেশন ১৯১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে সাম্রাজ্যবাদী ইয়ুরোপীয় দেশগুলির আক্রমণাত্মক নীতির ও বৃটিশ সরকারের অন্যায় নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "আমরা বৃটিশ রাজনীতিবিদদের অতীতের গর্হিত আচরণের কথা ভুলিয়া যাইতে পারি; কিন্তু এখন আমাদের উচিত হইবে তাহাদেরকে সাবধান করার জন্য বলিয়া দেওয়া যে, মুসলমানদের রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহাদেরকে উপেক্ষা করিয়া চলিলে বিজ্ঞতার কাজ হইবে না। মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষার বোঝা শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং তাহারা তৃণসম উপেক্ষাও আর সহ্য করিতে পারিবে না। যদি ভারতীয় মুসলমানেরা আরও উপেক্ষা সহ্য করে তাহা হইলে অলৌকিক কিছু ঘটিয়া যাইবে বলিয়া মনে করিতে হইবে।[১৭] বৃটিশ শাসনে কিভাবে বাংলাদেশ শোষিত হইয়াছে এবং এই ঐশ্বর্যশালী প্রদেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সর্বনাশ হইয়াছে ফজলুল হক তা বর্ণনা করেন।[১৮]

দেশের স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া ও হিন্দু মুসলমান সহযোগিতার উপর জোর দিয়া ফজলুল হক বলেন, "আমাদের আকাঙ্ক্ষার গন্তব্যস্থল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন; ইহার জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।" বৃটিশ শাসকদের গর্বের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি তাহাদেরকে ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন এবং মন্তব্য করেন, "ভারতের মাটিতে বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে, ইহাদের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে; বৃটিশ সাম্রাজ্যের অদৃষ্টেও একদিন এই অবস্থা হইবে।" তিনি বৃটিশ সরকারের অস্ত্র আইন, ভারত রক্ষা আইন ও সংবাদপত্র আইনের সমালোচনা করেন।[১৯] দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রচলনের দাবী করিয়া লীগ অধিবেশনে

www.bjilibrary.com

প্রস্তাব পাশ হয়। তুরস্কের অখণ্ডতার ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২০]

কংগ্রেস লীগ সহযোগিতা

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি দমননীতি অনুসরণ করিয়া চলে। ইহাতে দেশে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। তা'ছাড়া এই সময় তুরস্কের প্রতি বৃটিশ সরকারের শত্রুতামূলক আচরণে ভারতীয় মুসলমানগণ রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল এম. কে. গান্ধীর নেতৃত্বে রাউলাট বিলের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল ডায়ার এই সভার উপর গুলি চালাইয়া কয়েকশত নর নারী ও বালক বালিকাকে হত্যা করেন। এই বর্বর হত্যাকান্ডের সংবাদে সারা দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য কংগ্রেস একটি সংস্থা গঠন করে। মতিলাল নেহেরু, সি, আর, দাস, ফজলুল হক ও তায়েবজী এই তদন্ত সংস্থার সভ্য মনোনীত হন।[২১]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন : ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মনোভাব খুব প্রবল ছিল। তাহারা তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলিয়া মান্য করিত এবং তাহাকে মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক বলিয়া মনে করিত। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর সহিত যোগ দিয়াছিল এবং যুদ্ধে ইহাদের পরাজয় হয়। বৃটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড করার আয়োজন করে। ভারতীয় মুসলমানেরা খলীফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এক আন্দোলন গড়িয়া তোলে। এই আন্দোলন খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

বহুদিন হইতেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো তুরস্কের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়া আসিতেছিল। বল্কান যুদ্ধের সময় ইহাদের শত্রুতা প্রকট হইয়া উঠে। তুরস্কের অখণ্ডতা এবং মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেম প্রভৃতি পবিত্র স্থানের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। ১৯১৩ সালে লক্ষ্ণৌর মাওলানা আবদুল বারী ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য মাওলানা মুহম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী আঞ্জুমান-ই-খুদ্দাম-ই-কাব্য নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। খলিফা ও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত মক্কা-মদীনার মর্যাদা রক্ষা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী নাযারাত আল মায়ারুফ নামক অনুরূপ একটি সমিতি দিল্লীতে গঠন করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলী খিলাফত আন্দোলনের প্রধান প্রচারক ছিলেন। জর্মানদের সহিত ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে বৃটিশ সরকার ১৯২৪ সালের ১৪ই মে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। মাওলানা বারী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে। ১৯১৯ সালে মাওলানা বারী লক্ষ্ণৌতে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম বৈঠক আহ্বান

www.bjilibrary.com

করেন। বৈঠকে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। বোম্বাইকে কেন্দ্র করিয়া সকল প্রদেশে ইহার শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। খলীফার মর্যাদার জন্য ভারতে একদিন প্রার্থনা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

১৯১৯ সালের ১৪ই নভেম্বর ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খিলাফত বৈঠকের (Khilafat Conference) প্রথম অধিবেশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে তুরস্কের অখণ্ডতা ও খলীফার মর্যাদা রক্ষার দাবী করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি না পাইলে মুসলমানগণ সরকারের সহিত অসহযোগ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। কয়েকজন কংগ্রেস নেতা খিলাফত বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন এবং গান্ধী ইহার একটি বিশেষ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। গান্ধী খিলাফতের বিষয়ে কংগ্রেসের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। খিলাফত বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন মাওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে তুরস্ক ও খলীফার ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব জানাইবার জন্য বড়লাট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২০ সালের জানুয়ারীতে ডঃ এম, এ, আনসারীর নেতৃত্বে মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের একটি প্রতিনিধিদল বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। খিলাফতের ব্যাপারে বড়লাট তাঁহাদেরকে কোনরূপ আশ্বাস দিতে অসমর্থ হন। ইহার পর মাওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মার্চ মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ব্যর্থ হন।

১৯২০ সালের ২৮শে মে বোম্বাইয়ে খিলাফত কমিটির বৈঠক বসে। এই সভায় গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জুন মাসে এলাহাবাদে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তুরস্কের উপর সেভারস সন্ধি চাপাইয়া দিবার প্রতিবাদে ভারতে মুসলমানগণ ৩১শে আগস্ট খিলাফত দিবস পালন করে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়াতুল উলামায়ে হিন্দ।[২২] সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় ইহাদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এবং এই বিশেষ অধিবেশনে ইহারা অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ্ গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, অসহযোগ নীতি অবলম্বন করা ব্যতীত জনগণের সম্মুখে আর কোন পথ খোলা নাই, কিন্তু এই অসহযোগ বলিতে গান্ধীর অসহযোগের কর্মসূচী নয়।[২৩] মতিলাল নেহেরু, সি, আর, দাস এবং আরও কয়েকজন নেতাদের গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ইহা সত্ত্বেও গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে মতিলালও দাস উভয়ে গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। আনসারীর সভাপতিত্বে নাগপুর অধিবেশনে মুসলিম লীগও আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং 'স্বরাজ' ইহার মূল লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করে। খিলাফত কমিটিতে অসহযোগ কর্মসূচী গৃহীত হয়। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলিত

www.bjilibrary.com

আন্দোলন গান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।

ফজলুল হক অসহযোগের নীতি পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তিনি স্কুল কলেজ বয়কট করার বিরোধী ছিলেন। মুসলমানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে বহু পিছনে পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় তাহারা স্কুল কলেজ বয়কট করিলে তাহাদের অপুরণীয় ক্ষতি হইবে। ১৯২০ সালের ১২ই ডিসেম্বর ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে, সি, আর, দাস এক বক্তৃতায় ছাত্রদেরকে স্কুল-কলেজ বয়কট করিতে উপদেশ দেন। পরের দিন একই ময়দানে এক বক্তৃতায় ফজলুল হক ছাত্রদেরকে স্কুল-কলেজ বয়কট না করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, করদাতাদের ৪০ কোটি টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের ব্যাপারে কংগ্রেসের নেতাদের সহিত তাঁহার মতান্তর হয়। এই কারণে তিনি অসহযোগ কর্মসূচী মানিয়া চলিতে পারেন নাই।[২৪]

আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও উলেমা অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁহাদের উপদেশে ১৮০০০ মুসলমান আফগানিস্তানে হিজরত করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে পথে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মারা যায়। নানা কারণে অসহযোগ আন্দোলনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মালাবারের মোপলা মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুক্ত প্রদেশের চৌরিচরায় এক মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি জনতা পুলিশ থানায় অগ্নিসংযোগ করে এবং ইহাতে ২২জন পুলিশ মারা যায়। এই ঘটনায় গান্ধী মর্মাহত হন এবং অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় আলী ভ্রাতৃদ্বয় নিরাশ হইয়া পড়েন। তবু তাঁহারা খিলাফত আন্দোলন চালাইয়া যান। কিন্তু ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক রাজতন্ত্র ও খিলাফত উঠাইয়া দিয়া তুরস্কে সাধারণতন্ত্র প্রচলন করেন। ইহার ফলে খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া যায়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও ইহা একেবারে বিফল হয় নাই। এই আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের সঞ্চার হয় এবং এই গণজাগরণ স্বাধীনতা সংগ্রমের শক্তি বৃদ্ধি করে।

বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। ইহাতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিছুকাল মন কষাকষির পর আবার বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ পায়। উদারচিত্ত রাজনীতিক দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস, ফজলুল হক ও এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর সহিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়া আলাপ-আলোচনা করেন এবং হিন্দু-মুসলমানের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। এই চুক্তি বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।

www.bjilibrary.com

সি, আর, দাস জনপ্রিয় ও উদারপন্থী নেতা ছিলেন। জে, এম, সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু এবং আরও কয়েকজন তেজস্বী যুবক তাঁহার রাজনৈতিক শিষ্য ও সহচর ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর সি, আর, দাসের সহিত কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মতানৈক্য হয়। তিনিও তাঁহার সহচরগণ ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে যোগদানের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি আইনসভায় প্রতিবন্ধকমুলক নীতি অবলম্বন করিয়া ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন অচল করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসে এবং এমনকি বাংলাদেশ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গান্ধী অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্য সি, আর, দাস সবভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার নীতি কংগ্রেস অধিবেশনে পাশ করাইতে পারেন নাই।[২৫] যাহা হউক তিনি মতিলাল নেহেরুর সমর্থন লাভ করেন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে এই দুই কংগ্রেস নেতা স্বরাজ পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সি, আর, দাস ইহার নেতা নির্বাচিত হন। ইহার পর তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে ইস্তফা দেন। অল্পদিনের মধ্যে স্বরাজ পার্টির সভ্যগণ বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সি. আর. দাস, ও সুভাষ বসু যথাক্রমে ইহার সভাপতি ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন।[২৬]

সি, আর, দাস বাস্তবদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদের মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে তিনি তাঁহার প্রতিবন্ধকমূলক নীতি সফল করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া তিনি মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতেন এবং স্বরাজ লাভে তাহাদের সহযোগিতা যে অত্যাবশ্যক তাহা বিশ্বাস করিতেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধিকারের বিষয়েও সজাগ ছিলেন। ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী[২৭] সি, আর, দাসের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হন এবং তাঁহার সহিত বেঙ্গল প্যাক্ট নামক রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। স্বরাজ কাউন্সিল পার্টির ১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের এক সভায় বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। বাংলা কংগ্রেস কমিটির কর্মসচিব সুভাষ বসুর স্বাক্ষর সহ এই চুক্তির শর্তগুলি ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শর্তগুলি এইরূপ :-

"সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, বাংলাদেশে যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেজন্য প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তি অত্যাবশ্যক; যখন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন এই চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাইবে। লোক সংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশে ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রত্যেক জিলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাইবে এবং সংখালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০টি আসন পাইবে। সরকারী দফতরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে এবং যে পর্যন্ত তাহারা এই সংরক্ষিত পর্যায়ে না পৌছে সে পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৮০ জনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। যে পর্যন্ত চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের হার উপরোক্ত পর্যায়ে না আসে সে পর্যন্ত

www.bjilibrary.com

তাহাদেরকে নূন্যতম যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইবে; ইহার পর মুসলমানগণ চাকুরীর শতকরা ৫৫টি ও অমুসলমানেরা শতকরা ৪৫টি পাইবে, মধ্যবর্তী কালে হিন্দুগণ শতকরা ২০টি চাকুরী পাইবে। কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কীয় কোন আইন ব্যবস্থাপক পরিষদে পাশ করিতে হইলে সে সম্প্রদায়ের আইন সভায় নির্বাচিত তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকিতে হইবে। মসজিদের সম্মুখে গান বাজনা সহকারে মিছিল করা হইবে না। এবং গরু জবেহ করার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করে; ইহার প্রার্থীগণ শতকরা ৭৫টি হিন্দু আসন ও শতকরা ৫০টি মুসলমান আসন দখল করে। ব্যবস্থাপক পরিষদের মোট ১৩৯টি আসনের মধ্যে স্বরাজ দল ৪৬টি আসন লাভ করে। ইহার ফলে সি, আর, দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রূপে আবির্ভূত হয়।[২৯] বাংলার গবর্ণর লর্ড লিটন তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করেন। সি, আর, দাসের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসন অচল প্রতিপন্ন করা। এইজন্য তিনি গভর্ণরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।[৩০]

ফজলুল হক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। এই বিষয় নিয়া তাঁহার সি, আর, দাসের সহিত মতানৈক্য হয়। ইহার ফলে তিনি তাঁহার ৮জন সমর্থক লইয়া স্বরাজ দল হইতে সরিয়া পড়েন এবং ১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসে শিক্ষা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। আইনসভায় স্বরাজ দলের বিরোধিতার দরুন ফজলুল হক এ, কে, গজনবী, সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মন্ত্রীদের অবস্থা কঠিন হইয়া পড়ে। মন্ত্রীগণ শাসন পরিষদের উপদেষ্টাদের সহিত যোগ দিয়া আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে প্রয়াস পান। গবর্ণরের অন্যতম উপদেষ্টা স্যার আবদুর রহিম তাঁহাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৩১] তাঁহারা মন্ত্রীদের বেতন বিল পাশ করাইতে অসমর্থ হন। আইন সভায় পরাজিত হইয়া ফজলুল হক ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সি, আর, দাস ও স্বরাজ পার্টির নীতি ফলপ্রসূ হয়।[৩২] এই সময় কলিকাতা কর্পোরেশনে যে নির্বাচন হয় তাহাতে স্বরাজ দল প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসন দখল করে। সি, আর, দাস মেয়র নির্বাচিত হন। এবং ৩১ বৎসর বয়স্ত যুবক এইচ, এস, সেহরাওয়াদী সহকারী মেয়র নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশনের চাকুরীতে মুসলমানদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ২৫ জন মুসলমান চাকুরীতে নিযুক্ত হয়।[৩৩]

হিন্দু সংবাদপত্রগুলি বেঙ্গল প্যাক্টের বিরূপ সমালোচনা করে। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কোকনাদ অধিবেশনে এই চুক্তি সম্পর্কে বিতর্ক হয়; কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ব্যাপারে কোন পৃথক প্রদেশিক চুক্তি মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হয়।[৩৪] ইহাতে বাংলাদেশের মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য দলের মুসলমান সদস্যগণ বেঙ্গল প্যাক্টের অসারতা প্রমাণ করিতে সুযোগ পান।

www.bjilibrary.com

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মোশাররফ হোসেন ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রস্তাব করেন যে, অচিরে বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তগুলি কার্যকরী করা হউক, যে পর্যন্ত সকল সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫৫ না হয়, সে পর্যন্ত শতকরা ৮০টি চাকুরী তাহাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। এই প্রস্তাবের দরুন সি, আর, দাস একটু অসুবিধায় পড়েন এবং তিনি প্রস্তাবটি বিবেচনা মুলতবী রাখিবার অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, বেঙ্গল প্যাক্টের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, যখন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় ইহার অধিকার পাইবে। তিনি বলেন যে, স্বরাজ লাভের পর বেঙ্গল প্যাক্ট কার্যকরী করা হইবে।[৩৫]

সন্ত্রাসবাদীদের (Terrorists)[৩৬] সহিত স্বরাজ দলের সম্পর্ক থাকায় ইহার প্রতি অনেক মুসলমান সভ্যের আস্থা কমিয়া যায়। সি, আর, দাস নিজে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সহচরদের কেহ কেহ সন্ত্রাসবাদীদের সহিত সংশ্রব রাখিতেন। এই সময় বাংলাদেশ কংগ্রেসে সন্ত্রাসবাদীদের কিছুটা প্রভাব পড়িয়াছিল। প্রকাশ্যে ইহাদের কার্যকলাপের সমর্থন না করিলেও অনেকে ইহাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই কারণে সি, আর, দাসের পক্ষে ইহাদেরকে অসন্তুষ্ট করা সম্ভব ছিল না। সন্ত্রাসবাদী দলের গোপীনাথ নামক একজন ছাত্র পুলিশ কমিশনারকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে একজন ইংরাজ ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। গোপীনাথ ধরা পড়ে এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা হয়। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে সি, আর, দাস গোপীনাথের স্বদেশ প্রেমের প্রশংসা করেন। কংগ্রেসে স্বীয় প্রভাব রক্ষার জন্য তাঁহার পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল। এই অধিবেশনে প্রাদেশিক কংগ্রেসে, সি, আর, দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের সহিত স্বরাজ পার্টির সংশ্রব ও সহানুভূতি থাকায় ইহার মুসলমান সভ্যগণ বিপদের আশঙ্কা করে। মুসলমান নেতৃবৃন্দ রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ পরিহার করিয়া চলিবার পক্ষপাতি ছিলেন।[৩৭]

নিজ ব্যক্তিত্বের বলে সি, আর, দাস স্বরাজ পার্টির সংহতি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ১৯২৫ সালের ২৫শে মার্চ আইনসভায় নওয়াব আলী চৌধুরী ও মন্মথ রায় চৌধুরী এই দুইজন মন্ত্রীর বেতনের প্রস্তাবের উপর স্বরাজ দলের শক্তি পরীক্ষা হয়। স্বতন্ত্র জতীয়তাবাদী সভ্যদের ও ফজলুল হকের দলের সহযোগিতায় সি, আর, দাস ৬ ভোটের আধিক্যে মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।[৩৮] এইভাবে সি, আর, দাস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা অচল ও অকেজো প্রতিপন্ন করিতে সফল হন। ইহার পর বাংলাদেশের গবর্ণর লিটন ১৯২৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র স্থাগিত রাখিতে বাধ্য হন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন সি, আর, দাসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে বেঙ্গল প্যাক্ট ও স্বরাজ পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। সি, আর দাস খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। উদার মতবাদ ও দেশের প্রতি দরদের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান সকালের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন এবং দেশবন্ধু আখ্যা লাভ করিয়ছিলেন। তিনি যে বাংলাদেশ চুক্তি

www.bjilibrary.com

সম্পন্ন করিয়া বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তিনি কয়েক বৎসর জীবিত থাকিলে বাংলাদেশের জাতীয়তা বাস্তব রূপ পাইতে পারিত। সি, আর, দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য সহকারী জে, এম, সেনগুপ্ত স্বরাজ পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। তিনি বেশি দিন নেতৃত্বে থাকিতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যে সুভাষ বসু নেতৃত্ব লাভ করেন। ইহার পর স্বরাজ পার্টির কর্মসূচীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং হিন্দু মুসলমান সভ্যদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে সি, আর, দাসের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয় এবং "বাংলাদেশ চুক্তি" অচল হইয়া পড়ে।[৩৯]

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বরাজ দলের বিরোধিতা চলিতে থাকে। নূতন নির্বাচনের পর ১৯২৭ সালের জানুয়ারীতে তৃতীয় ব্যবস্থাপক সভা আহুত হয়। স্যার আবদুর রহিম মন্ত্রী নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি একজন হিন্দু সহকারী সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও স্যার এ, কে, গজনবী মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অনাস্থা। প্রস্তাবের ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের মন্ত্রিসভার পতন হয়। নবাব মশাররাফ হোসেন ও ভূপেন্দ্রনারায়ন সাহার মন্ত্রিসভারও একই অবস্থা হয়। ইহার পর ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কুমার শিব শেখরেশ্বর রায়, খান বাহাদুর কে, জি, এম, ফারুকী এবং খাজা নাযিমুদ্দিন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বরাজ দল ব্যবস্থাপক সভা বয়কট করে। ইহার ফলে মন্ত্রিসভার বিপদ কাটিয়া যায়। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নাযিমুদ্দিনের সহিত মতান্তর হওয়ায় শিব শেখরেশ্বর রায় আগষ্ট মাসে পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থলে বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় মহাজনী (Bengal Money Lenders Bill) এবং বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংশোধনী আইন (Bengal Rural Self-Government Amendment Bill) পাশ করে। প্রথমোক্ত আইনে কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘবের ব্যবস্থা হয় এবং শেষোক্ত আইনের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৩৪ সালে নাযিমুদ্দিন গবর্ণরের কর্মপরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তাঁহার জায়গায় খান বাহাদুর আজিজুল হককে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ফারুকী, বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ও আজিজুল হক ১৯৩৫ সালের ভারত আইন অনুযায়ী নির্বাচনের পর নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

হিন্দু—মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টা

দেশের স্বায়ত্তশাসন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল। মুসলিম লীগ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কয়েকটি রক্ষাকবচ দাবী করিয়াছিলেন। এই রক্ষাকবচের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য মুসলিম লীগ-নেতা কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে

www.bjilibrary.com

প্রস্তুত ছিলেন। জিন্নাহ্ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সহযোগিতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই জন্য তাঁহাকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত বলা হইত। ১৯২০ সালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর বিরোধিতা করেন এবং ইহার পর তিন বৎসর রাজনীতি হইতে দূরে থাকেন। ১৯২৪ সালে তিনি আবার কংগ্রেস ও লীগের সহিত সংশ্রব স্থাপন করেন।

জিন্নাহ ১৯২৪ সালের ২৪ শে মে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে লীগের নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত 'স্বরাজ' সম্পর্কীয় কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। 'স্বরাজ' সম্বন্ধে বলা হয় যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহাতে প্রদেশগুলি স্বাধিকার (autonomy) স্বতন্ত্র নির্বাচন ও ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকিবে। জিন্নাহ তাহার অভিভাষণে বলেন যে, তিনি জাতীয়তাবাদী এবং এমনকি স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার বিরোধী। তিনি প্রকাশ করেন যে, মুসলমানগণ স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করিবে, তবে ইহার বিনিময়ে তাহারা কয়েকটি ব্যাপারে হিন্দু নেতাদের নিকট প্রতিশ্রুতি দাবী করে।[৪০] মুসলিম লীগের ষষ্ঠদশ অধিবেশন ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধী, মতিলাল নেহেরু এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এই অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে লীগের সপ্তদশ অধিবেশন আলীগড়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি স্যার আবদুর রহিম মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে একতা স্থাপনের উপর জোর দেন।[৪১]

১৯২৫ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিন্দু মুসলমান সহযোগিতার জন্য লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে এক নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। হিন্দু মহাসভার নেতাগণ কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং ১৯২৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নিবাস আয়েঙ্গার মুসলিম লীগের গ্রহণের জন্য পাঁচটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জিন্নাহ, মুহম্মদ আলী এবং আরও কয়েকজন লীগ নেতা ২০শে মার্চ দিল্লীতে এক সভায় এই প্রস্তাবগুলি নিয়া আলোচনা করেন। তাঁহারা কয়েকটি প্রস্তাব রচনা করেন; এইগুলি দিল্লী প্রস্তাব নামে পরিচিত। তাঁহারা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করিতে সম্মত হন এবং এই শর্তগুলি হইল : বংলাদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে হইবে; বোম্বাই প্রদেশ হইতে সিন্ধু প্রদেশকে পৃথক করিতে হইবে; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসন সংস্কার করিতে হইবে; কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদেরকে এক তৃতীয়াংশ আসন দিতে হইবে এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আসনের ব্যবস্থা হইবে। লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুযায়ী হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের জন্য অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় মুসলমানদের কিছুই সুবিধা হয় নাই। এইজন্য দিল্লী প্রস্তাবে ইহা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।[৪২]

যুক্ত নির্বাচন প্রস্তাবের ব্যাপারে মুসলিম লীগে মতানৈক্য দেখা দেয়। মিয়া মুহম্মদ শফী এবং আরও কয়েকজন নেতা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার ফলে লীগে দুইটি উপদল হইয়া যায়, জিন্নাহর দল ও শফীর দল।

www.bjilibrary.com

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরের অধিবেশনের কংগ্রেস দিল্লী প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ইহার উদ্যোগে ১৯২৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় বৈঠক বসে। জিন্নাহ, ফজলুল হক এবং আরও কয়েকজন লীগের পক্ষ হইতে বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ মুঞ্জে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংরক্ষণ এবং বোম্বাই হইতে সিন্ধু প্রদেশের স্বতন্ত্রীকরণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিদেরকে প্রভাবান্বিত করেন। এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বৈঠক মুলতবী করা হয়। মে মাসে বোম্বাইয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। বৈঠকে অনেক আলাপ-আলোচনার পর শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলি পরীক্ষার জন্য আইনবিদদেরকে নিয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। মতিলাল নেহেরু এই কমিটির সভাপতি এবং এম, এস, অ্যানি, সুভাস বসু, এম, আর, জয়কার, এন, এম, জোর্সী শোয়েব কুরেশী, আলী ইমাম, তেজ বাহাদুর সাপুর, মঙ্গল সিংহ ও জি, আর প্রধান সভ্য নির্বাচিত হন। ইহা নেহেরু কমিটি বলিয়া অভিহিত। নেহেরু কমিটিতে শোয়েব কুরেশী লীগের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। আলী ইমাম কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন।[৪৩]

এলাহাবাদে কয়েকটি বৈঠকে আলাপ আলোচনার পর নেহেরু কমিটি ইহার রিপোর্ট প্রস্তুত করে। নেহেরু রিপোর্টে ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন, সিন্ধুদেশ স্বতন্ত্রীকরণ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক মর্যাদা, যুক্ত নির্বাচন ও বয়স্কদের ভোটাধিকার নেহেরু রিপোর্টের মূল প্রস্তাব ছিল। নেহেরু কমিটি বাংলাদেশের ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাহ্য করে।

নেহেরু রিপোর্টে লক্ষ্ণৌচুক্তি বাতিল হইয়া যায়; বাংলাদেশ চুক্তি ও দিল্লী প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় বৈঠক বসে। বৈঠকে নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হয় এবং নেহেরু কমিটিকে শাসনতন্ত্র পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। জিন্নাহ ও মাওলানা মুহম্মদ আলী এই সময় দেশে ছিলেন না। দিল্লী প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় তাঁহারা মর্মাহত হন।[৪৪]

১৯২৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতায় সর্বদলীয় বৈঠক আহূত হয়। জাতীয়তাবাদী নেতা ডঃ এম, এ, আনসারী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফৎ কমিটির অধিবেশনও এই সময় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় বৈঠকে জিন্নাহ ও মাওলানা মুহম্মদ আলী নেহেরু কমিটির রচিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন : (১) কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদেরকে এক-তৃতীয়াংশ আসন দিতে হইবে; (২) বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিবে (৩) শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকিবে এবং অতিরিক্ত বিষয়গুলির

www.bjilibrary.com

ক্ষমতা (Residuary Powers) প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হইবে। হিন্দুনেতাগণ এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।[৪৫]

ফজলুল হক, স্যার আবদুর রহিম, মাওলানা আকরম খান ও বাংলাদেশের অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ কমিটির শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন।[৪৬] কংগ্রেস এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং প্রস্তাব পাশ করে যে, যদি সরকার ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী না করে তাহা হইলে সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হইবে।[৪৭]

মিয়া মুহম্মদ শফীর দল কলিকাতায় সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেন নাই। তাঁহারা ৩১শে ডিসেম্বর আগা খানের সভাপতিত্বে দিল্লীতে মিলিত হন এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন বজায় রাখিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জিন্নাহ ১৯২৯ সালের জানুয়ারীতে দিল্লীতে মুসলিম লীগ পরিষদের সভা আহ্বান করেন এবং শফীকেও এই সভায় আমন্ত্রণ করেন। এই সভায় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জিন্নাহ রচিত ১৪ দফা দাবী গৃহীত হয়। ইহাদের প্রধান দাবীগুলি হইল ঃ (১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে; (২) প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা থাকিবে এবং অতিরিক্ত বিষয়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে থাকিবে; (৩) কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানগণ পাইবে; (৬) সরকারী চাকুরীতে মুসলনদের ন্যায্য অীধকার থাকিবে; (৭) ধর্মকর্ম মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।[৪৮]

ইতিমধ্যে আইন সংস্কার সম্বন্ধে তদন্তের বৃটিশ সরকার বিলাতের খ্যাতনামা আইনজীবী জন সাইমনকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করে। ইহা সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন ভারতে আসে। এই কমিশনে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় সকল রাজনৈতিক দল ইহাকে বয়কট করে, কেবল শফীর দল ইহার সহিত সহযোগিতা করে।[৪৯] সাইমন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী বড়লাট লর্ড আরউইন কমিশনের সহিত যুক্ত অধিবেশনের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার ৭জন সদস্য মনোনীত করেন। ইহাদের মধ্যে তিন জন মুসলমান ছিলেন। নবাব জুলফিকার আলী খান ও ডঃ আবদুল্লাহ আল মামুন শফীর দলের সদস্য ছিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষপাতি ছিলেন।

১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন রিপোর্ট দাখিল করে। সাইমন কমিশন রিপোর্ট শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে সব সুপারিশ করা হয় তাহা কোন রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ফলে দেশে বিক্ষোভ চলিতে থাকে। ভারতের জাগ্রত জনমতকে শান্ত করার জন্য বৃটিশ সরকার নুতনভাবে প্রচেষ্টা চালাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনালড ১৯৩০ সালের নভেম্বরে হিন্দু মুসলমান নেতাদেরকে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। ১২ই নভেম্বর প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ৫৭জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করেন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ১৬জন ও সরকারের পক্ষ হইতে ১৫জন প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দেন। আগা খান, জিন্নাহ, ফজলুল হক এবং আরও কয়েকজন মুসলমানদের

www.bjilibrary.com

প্রতিনিধিত্ব করেন। ফজলুল হক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষে জোরদার বক্তৃতা দেন।[৫১] হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের সম্পর্কীয় সমস্যার মীমাংসা না হওয়ায় ১৯৩১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী গোলটেবিল বৈঠক মুলতবী করা হয়। ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। মহাত্মা গান্ধী এই বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকেও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে মতানৈক্য হয়। ইহার পর ১৯৩২ সালের ২রা অগস্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) নামে অবহিত। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বীকার করা হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আইন সভায় আসন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বাংলাদেশে মুসলমানদেরকে শতকরা ৪৮.৪ হিন্দুদেরকে ৩৯.২ এবং ইয়ুরোপীয়দেরকে শতকরা ১০টি আসন দেওয়া হয়।[৫২] ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক আহুত হয়। এই বৈঠকেও সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র রচনার প্রচেষ্টা দুরাশা বলিয়া মনে হয়। ইহার পর বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সকল সম্প্রদায়ের অধিকার, দেশীয় রাজাদের মর্যাদা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, বোম্বাই প্রদেশ হইতে সিন্ধুদেশের স্বতন্ত্রীকরণ, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ প্রভৃতি এই শাসন আইনের উল্লেখযোগ্য বিধি ব্যবস্থার অন্যমত।

www.bjilibrary.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্য

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাশ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুসলমান নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়। বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল; ভারত শাসন আইনের বলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলমান নেতাগণ এই প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের ও জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির সুযোগ দেখিতে পান। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাহাদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। এই সময় বাংলাদেশে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। তখন নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি একমাত্র সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল।

কৃষক—প্রজা সমিতি (পার্টি)

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষকদের অভাব-অভিযোগ হইতে কৃষক-প্রজা সমিতির উৎপত্তি হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদরগণ জমির মালিক হইয়াছিল, জমিতে প্রজাদের স্বত্ব ছিলনা এবং প্রজাদেরকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। জমিদার প্রজাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিলেও অথবা তাহাদেরকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিলেও তাহারা প্রতিকার পাইতে পারিত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা ও অন্যান্য কর বাবদ জমিদারদের ১৩ কোটি টাকা আদায় করিবার কথা ছিল এবং ইহা হইতে মাত্র তিন কোটি টাকা তাহাদের রাজস্ব হিসাবে সরকারকে দিবার চুক্তি ছিল। কিন্তু জমিদারগণ অন্যায়ভাবে প্রজাদের নিকট হইতে ১৩ কোটি টাকার অনেক বেশি আদায় করিত। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে ৬৩ কোটি টাকা আদায় করিত এবং তাহা হইতে মাত্র ৬ কোটি টাকা সরকারকে রাজস্ব দিত। কিন্তু আদায়কৃত ৬৩ কোটি টাকা তাহারা হিসাবে দেখাইত না।; তাহাদের হিসাবের খাতায় মাত্র ১৮ কোটি টাকা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় হইয়াছে বলিয়া লিখা হইত। এইরূপে তাহারা ৪৫ কোটি টাকা অন্যায়ভাবে আদায় করিত এবং এই অর্থ জমিদার ও তাহার আমলাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইত।[১] জমিদারের অতিরিক্ত খাজনা ও করের ভারে উপায়হীন হইয়া প্রজাগণ মহাজনের নিকট হইতে অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ করিতে বাধ্য হইত। ইহার পর একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে মহাজন এই দুইয়ের নিষ্পেষণে প্রজাদের দুর্দশা চরমে পৌছে। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকেরা জমিদারদের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কখনও আন্দোলনের আশ্রয় নিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তিতুমীর ও ফরায়েজী নেতা মৌলবী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁহার পুত্র দুধু মিয়া প্রজাদেরকে জমিদারের কবল হইতে বাঁচাইবার জন্য কৃষক আন্দোলন গঠন করিয়াছিলেন।

www.bjilibrary.com

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর সরকার জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা হইতে প্রজাদেরকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন অনুভব করে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৯ সালে বঙ্গীয় ভূমিকর আইন বিধিবদ্ধ হয়; জমিদারের অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য প্রজাদেরকে আদালতের আশ্রয় নিবার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এই আইনের দ্বারা প্রজাদের কোন উপকার হয় নাই, কারণ গরীব প্রজাদের পক্ষে ব্যয়সংকুল আদালতের আশ্রয় লওয়া সম্ভবপর ছিল না; প্রবল জমিদারদের বিরুদ্ধে মামলা করিয়া তাহাদেরকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইত। সৈয়দ আমীর আলী বাংলাদেশের ভূমি সমস্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কৃষকদের দুর্দশার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার পর বড়লাট লর্ড রিপনের শাসনকালে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল পাশ হয়। জমিদারগণ সাধ্যমত এই বিলের বিরোধিতা করিয়াছিল। তাহারা যাহাতে অন্যায়ভাবে কর বৃদ্ধি করিতে ও প্রজাদেরকে উচ্ছেদ করিতে না পারে, সে জন্য এই বিলে ব্যবস্থা করা হয়।[২] কিন্তু এই আইনের ফলেও প্রতাপশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিশেষ সুবিধা হয় নাই।

কৃষক ও সাধারণ শ্রেণীর লোকের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কোন কর্মসূচী ছিল না। মুসলিম লীগ কার্যত জমিদার শ্রেণীর অভিজাতদের হাতে ছিল। তাঁহারা মুসলিম রাজনীতির কার্যক্রম নির্ণয় করিতেন; কৃষক ও জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সংযোগ ছিল না। কৃষকদের অধিকাংশ মুসলমান ছিল এবং জমিদার ও মহাজনদের অধিকাংশ হিন্দু ছিল। কৃষক জনসাধারণের অধিকারের বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য প্রজাদরদী গণনেতার প্রয়োজন ছিল। জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হকের আবির্ভাবে তাহাদের সে অভাব পূর্ণ হয়। বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের জন্য তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ১৯১৩ সালের নির্বাচনী বক্তৃতায় ফজলুল হক নিজেকে কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করিবেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি নিজে একজন প্রজা এবং জমিদার ও মহাজনদের কবল হইতে প্রজাদেরকে মুক্ত করা ও তাহদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার রাজনৈতিক ব্রত।[৩]

প্রজাদের মধ্যে নিজেদের অধিকারের বিষয়ে আত্মচেতনার উদ্ভব হওয়ার ফলে এবং ফজলুল হক ও অন্যান্য কয়েকজন প্রজা দরদী নেতার উৎসাহ ও উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলায় প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জমিদার ও মহাজনদের কবল হইতে প্রজাদেরকে রক্ষা করা এবং তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। জিলায় জিলায় যে প্রজা আন্দোলন শুরু হয় তাহা অচিরেই সংঘবদ্ধ আকার ধারণ করে। ১৯১৪ সালে জামালপুর মহকুমায় কামারিয়ার চরে এক বিরাট প্রজা সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুরের খোশ মুহম্মদ ইহার আহ্বায়ক ছিলেন। ফজলুল হক, মৌঃ আবুল কাসেম, মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বগুড়ার রজীবুদ্দিন তরফদার প্রমুখ নেতাগণ এই সম্মিলনীতে যোগ দেন। অতিরিক্ত কর রহিত করা এবং প্রজাদের জন্য আরও কয়েকটি

www.bjilibrary.com

অধিকার দাবী করিয়া সম্মিলনীতে প্রস্তাব পাশ করা হয়।[৪] ১৯১৫ সালে বরিশাল জিলায় কৃষকদের কয়েকটি সভা হয়। তাপর ১৯২১ সালে বরিশাল জিলার আগাইলঝরাতে এক প্রজা সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। খান বাহাদুর হাশিম আলী খান ইহার সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যোগ দিয়াছিল।[৫] এই বৎসর ফজলুল হক নবযুগ নামে একটি সংবাদপত্র বাহির করেন। তিনি মুজাফফর আহমদ ও নজরুল ইসলামকে ইহার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করেন। নবযুগ পত্রিকায় প্রজা ও জনসাধারণের অবস্থা ও অধিকারের বিষয় প্রচার করা হইত।

প্রজা আন্দোলন অচিরেই গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯২৪ সালে ঢাকায় প্রজা-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ফজলুল হক ইহার সভাপতি ছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে ফজলুল হক বলেন, "বিধাতা আমাদের হাতে সম্মানজনক লাঙ্গল দিয়াছেন, আমরা লাঙ্গলের ফাল দিয়া এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়া জমি চাষ করিব যাহাতে এই কর্তিত জমির উপর আমরা জাতীয় পুনর্জাগরণের বীজ বপন করিতে পারি।" তিনি প্রজাদেরকে তাহাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধ হইতে উপদেশ দেন। এই সম্মিলনীতে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয় এবং ইহার কর্মসূচী গৃহীত হয়। নবযুগ পত্রিকাকে ইহার মুখপত্র করা হয়। ১৯২৬ সালে প্রজা আন্দোলনের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[৬] মানিকগঞ্জের সাহা মহাজনেরা অনেক প্রজার বন্ধকী জমি দখল করিয়াছিল। আবদুল লতিফ বিশ্বাস এবং আরও কয়েকজন প্রজানেতার উদ্যোগে মানিকগঞ্জের ঘিউরে এক প্রজা সম্মিলনী আহ্বান করা হয়। ফজলুল হক এই সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে প্রজাদেরকে তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়া বলেন, "যদি আমি সুযোগ পাই তাহা হইলে আল্লাহর অনুগ্রহে আমি আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিব যাহাতে জামিদারের অনুমতি ছাড়াই আপনারা দালান তৈরি করিতে পারেন, পুকুর খনন করিতে পারেন, ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে পারেন এবং যাহাতে জমিদারগণ আর আপনাদেরকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে না পারে এবং আপনাদের নিকট হইতে বে-আইনী কর আদায় করিতে না পারে। আমি মহাজনদের মারাত্মক সুদের কারবার বন্ধ করিব এবং তাহাদের কবল হইতে আপনাদের বন্ধকী জমি মুক্ত করিব।" তিনি প্রজাদেরকে পরামর্শ দেন যে, যে পর্যন্ত সাহা মহাজনেরা তাহাদের বন্ধকী জমি ফেরত না দেয় সে পর্যন্ত তাহাদের কেহই যেন তাহাদের জমি চাষ না করে। ইহার পর সকল প্রজা সাহাদেরকে বয়কট করিয়া চলে। উপায় না দেখিয়া সাহা মহাজনেরা প্রজাদের বন্ধকী জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।[৭]

১৯২৭ সালে ফজলুল হক মানিকগঞ্জে নির্বাচন কেন্দ্র হইতে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় এবং প্রজা আন্দোলনের প্রভাবে সরকার ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে। জমিদারগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল। কংগ্রেসও ইহার বিরুদ্ধে ছিল। এইজন্য এই সময় মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ অনেক মুসলমান নেতা কংগ্রেসের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করেন। এই আইনের বলে প্রজাগণ কয়েকটি অধিকার লাভ করে। ১৯২৯ সালে মুসলমান নেতাগণ কলিকাতায়

www.bjilibrary.com

এক বৈঠকে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ব্যাপকভাবে গঠন করেন। স্যার আবদুর রহিম সমিতির সভাপতি এবং মাওলানা আকরম খা ইহার কর্মসচিব নির্বাচিত হন। ফজলুল হক, মুজিবর রহমান, আবদুল করিম, ডঃ আবদুল্লাহ সোহরাবর্দী ও খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সমিতির সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। শামসুদ্দীন আহমদ ও তমিজুদ্দিন খাঁ ইহার যুগ্ম কর্মসচিব নিযুক্ত হন। জিলায় জিলায় সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়।[৮]

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ব্যাক্তিগত উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে একটি প্রজা সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন এবং খান বাহাদুর আবদুল মোমিন (বর্ধমান) ইহার সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মিলনীতে বিরাট লোক সমাগম হয় এবং জমিদারী উচ্ছেদ, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণ, প্রভৃতি দাবী করিয়া প্রস্তাব পাশ করা হয়। এই সম্মিলনীর ফলে প্রজা সমিতির শক্তি বৃদ্ধি পায়।[৯]

১৯৩৫ সালে স্যার আবদুর রহিম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তিনি নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির পদে ইস্তেফা দেন। মাওলানা আকরম খা, খান বাহাদুর আবদুল মোমিনকে সমিতির সভাপতি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ প্রজাদরদী ও জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হককে সমর্থন করেন। ইহার ফলে ফজলুল হক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ফজলুল হক ১৯৩৪ সালে কুষ্টিয়ায় এবং পর বৎসর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।[১০] নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি সারা প্রদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সময় জিলার সর্বত্র লোক্যাল বোর্ড ও জিলা বোর্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি হিসাবে প্রজা সমিতি সমস্ত লোক্যাল বোর্ডে প্রার্থী খাড়া করে। ময়মনসিংহ জিলায় ৭২টি আসনের মধ্যে প্রজা সমিতি ৬৪ টি আসন দখল করে। সে সময় লোক্যাল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে জিলা বোর্ডের সভ্য নির্বাচিত হইত। এই নির্বাচনেও প্রজা সমিতি জয়লাভ করে। ইহার ফলে জিলা বোর্ড প্রজা সমিতির হাতে আসে।[১১]

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির পরবর্তী অধিবেশন ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় সমিতির একদল সভ্য দাবী করেন যে, প্রকৃত কৃষকদেরকে ইহার সভ্যভুক্ত করা উচিত এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া কৃষক প্রজা পার্টি রাখিতে হইবে তদনুযায়ী প্রস্তাব পাশ হয় এবং সমিতির নাম কৃষক প্রজা সমিতি (পার্টি) রাখা হয়। সম্মিলনীতে কৃষক প্রজা সমিতির আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য চৌদ্দ দফার নির্বাচনী কর্মসূচী পাশ করা হয়। (১) বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, (২) মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ, (৩) ঋণ সালিসী বোর্ড প্রতিষ্ঠা, (৪) বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, (৫) পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, (৬) মন্ত্রী বেতন ১০০০ টাকায় হ্রাস (৭) রাজবন্দীদের মুক্তি, ইত্যাদির ১৪ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১২] সমিতিতে প্রগতিপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া জমিদার ও তালুকদার সভ্যগণ ক্রমশ ইহা হইতে সরিয়া পড়েন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা প্রজা

www.bjilibrary.com

সমিতিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমিতিতে প্রগতিপন্থীদের প্রভাবের দরুন তাহাদের নেতৃত্বের পথ রুদ্ধ হয়। এইজন্য তাঁহারা সমিতির সহিত সংশ্রব ত্যাগ করেন।[১৩] নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লব আনয়ন করা কৃষক প্রজা পার্টির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতিতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল, কিন্তু ইহা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না।[১৪]

ফজলুল হক তালুকদার ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও প্রজাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং ইহাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী রূপে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নামিবার সংকল্প করেন। তাঁহার নির্বাচনী ইসতেহার খুব সরল ও সহজ ছিল, ইহার এক মাত্র বক্তব্য ছিল প্রজাদের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা করা।[১৫] নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে প্রজা আন্দোলন খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং জমিদারী ও তালুকদারী উচ্ছেদের জন্য জোর দাবী চলিতে থাকে। এইরূপ দাবী করা হয় যে, "লাঙ্গল যার জমি তার।"

মুসলিম লীগের পুনর্জীবন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের শাখারূপে ১৯০৭ সালে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। নবাব সলীমুল্লাহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি এবং বিচারপতি জাহিদ হোসেন ও নওয়াব আলী চৌধুরী ইহার যুগ্ম কর্মসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৩৫সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশেও মুসলিম লীগ কার্যত অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বাংলাদেশের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান নেতাগণ একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহারা কলিকাতায় এক সভায় মিলিত হন। এই সভায় নবাব হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা সাহাবুদ্দিন, রতনপুরের জমিদার কে, জি, এম, ফারুকী, আজিজুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। ফজলুল হক নওয়াবজাদা হাসান আলী (বগুড়া) নওশের আলী, শামসুদ্দীন, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ প্রজানেতাগণ এই সভায় যোগ দেন নাই।[১৭]

জিন্নাহ ১৯৩২ সাল হইতে বিলাতে ব্যবসায় করিতেছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং নির্জীব মুসলিম লীগকে পুনর্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সকল মুসলমান নেতাদেরকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সন্নিবেশিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহারা মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীরূপে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন সেরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। জিন্নাহ খুব সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। সরকার পক্ষীয় সদস্যদের সাহায্যে তিনি খুব কৌশলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করাইয়া ছিলেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের সহিত যোগ দিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন

www.bjilibrary.com

আইনের যুক্তরাষ্ট্র শাসনের অংশটুকু নাকচ করাইয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করেন। এই সুনাম লইয়া তিনি মুসলিম লীগের পুনরুত্থানের কাজে নিয়োজিত হন।

জিন্নাহর উদ্যোগে ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে বোম্বাই শহরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ পরিষদের সভা আহুত হয়। এই সভায় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থা (Central parliamentary Board) গঠিত হয়। জিন্নাহ ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালের ৮ ই জুন লাহোরে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থার প্রথম বৈঠক বসে। বাংলাদেশের ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও প্রজা পার্টির কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রদেশের রাজনীতিতে অন্য কোন প্রদেশের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নাই। তাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রার্থী রূপে নিবাচনে প্রতিযোগিতা করার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯৩২ সালে কালিকাতায় নিউ মজলিশ পার্টি নামে মুসলমান ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছিল।[১৮] এই দলের প্রতিনিধি রূপে আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও এম, এ, এইচ ইস্পাহানী লাহোরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থার বৈঠকে যোগ দেন। পাঞ্জাবে তখন স্যার ফজলে হোসেন ও তাঁহার গঠিত ইউনিয়নিষ্ট পার্টির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। ফজলে হোসেন মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। যাহা হউক, লাহোর বৈঠকে লীগ নির্বাচনী ইশতেহার গৃহীত হয়। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী করিতে সাহায্য করা এবং দেশের পুর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য চেষ্টা করা মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৯]

প্রাদেশিক লীগ নির্বাচনী সংস্থা গঠনের জন্য জিন্নাহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করেন। এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী তাঁহাকে কলিকাতায় আমন্ত্রণ করেন। জিন্নাহ ১৯৩৬ সালের ১৭ই আগস্ট কলিকাতায় আসেন এবং ইস্পাহানীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি, নিউ মজলিশ পার্টি ও প্রজা পার্টির নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাহাদেরকে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীরূপে নির্বাচনে নামিতে অনুরোধ করেন। এই তিন দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়া বাংলাদেশ মুসলিম লীগের একটি নির্বাচনী সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা হয়।[২০] বাংলাদেশ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাচনী সংস্থার প্রথম বৈঠকে প্রজা দলের প্রতিনিধিদের সহিত অন্যান্য সদস্যদের মতানৈক্য দেখা দেয়। ইস্পাহানী বলেন যে, ফজলুল হক ও তাঁহার দলীয় সদস্যগণ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ এবং অতিরিক্ত কর ব্যতিরেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবী নির্বাচনী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্য দলের সদস্যগণ এই বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। এইজন্য ফজলুল হক ও তাঁহার সহচরেরা লীগ নির্বাচনী সংস্থা হইতে সরিয়া পড়েন এবং তাহারা কৃষক প্রজা পার্টির কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে নামিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২১]

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাচনী সংস্থার অধিকাংশ সদস্য অভিজাত শ্রেণীর জমিদার ও ব্যবসায়ী ছিলেন। ইহার ১৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন কৃষক প্রজা পার্টি হইতে লওয়া হইয়াছিল। ফজলুল হক বুঝিয়াছিলেন যে এই অভিজাত শ্রেণীর সংস্থায় যোগ দিলে তিনি কখনও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিতে ও প্রজাকল্যাণকর কর্মসূচী কার্যকরী করিতে পারিবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের এক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাচনী সংস্থা প্রধানত অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিদেরকে নিয়া গঠিত হইয়াছে; তদুপরি জিন্নাহ সাহেব অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের কয়েকজন প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া ইহার মধ্যে অভিজাত লোকদের প্রাধান্য অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তিনি ইস্পাহানি ও মাহমুদাবাদের নবাবদের মত লোকদের উপর নির্ভর করিতেছেন। ফজলুল হক প্রকাশ করেন যে, ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির তিনজন প্রতিনিধি নবাব হাবীবুল্লাহ, খাজা নাযিমুদ্দিন ও সাহাবুদ্দিন একই জমিদার পরিবারের লোক এবং অন্য তিনজন প্রতিনিধি এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, স্যার, এ, এফ, রহমান ও আকরম খাঁ শহরের অধিবাসী। ফজলুল হক বলেন যে কলিকাতার অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে ও তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে তাহা তিনি পছন্দ করেন না।[২২]

নির্বাচনী প্রতিযোগিতা

১৯৩৭ সালের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার্যত মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিযোগিতায় পরিণত হইয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রজা পার্টির নেতাগণ কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতেন এবং ইহাদের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাঁহাদের প্রধান নেতা ফজলূল হকের বিপুল জনপ্রিয়তা কৃষক প্রজা পার্টির মূলধন স্বরূপ ছিল। অন্য দিকে লীগ জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছিল। জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না এবং মাওলানা আকরম খাঁ ব্যতীত অন্য কোন লীগ নেতা গ্রামের কোন জনসভায় বাংলা বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। জিন্নাহ তখনও কলিকাতা ব্যতীত বাংলার অন্যান্য স্থানে ভালভাবে পরিচিত হন নাই। তিনি যখন ঢাকা আসেন তখন খুব কম লোকই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেও সভায় বিশেষ লোক সমাগম হয় নাই। নির্বাচনের প্রাক্কালে আকরম খাঁ দৈনিক আজাদ বাহির করেন। মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারকার্য্যে আজাদ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।[২৩]

প্রজা নেতা ফজলুল হক ও লীগ নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে ১৯৩৭ সালে ঢাকার নবাব পরিবারের জমিদারী পটুয়াখালী নির্বাচন কেন্দ্রে যে প্রতিযোগিতা হয় তাহা হইতে ফজলুল হকের বিপুল জনপ্রিয়তা ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। নাযিমুদ্দিন তাঁহার জমিদারী কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আসনের জন্য প্রার্থী হন। আশা করা গিয়াছিল যে, তিনি সহজেই নির্বাচিত হইবেন। ফজলুল হক এই

www.bjilibrary.com

পটুয়াখালীতেই নাযিমুদ্দিনের সহিত নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নামিয়া পড়েন। নাযিমুদ্দিন তখন গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। একদিকে ঢাকার নবাব পরিবারের অর্থ, জনবল ও প্রভাব প্রতিপত্তি, তার উপর সরকারী প্রভাবও নাযিমুদ্দিনের জন্য কাজ করিয়াছিল। এব বিবৃতিতে ফজলুল হক বলিয়াছিলেন যে, স্যার নাযিমুদ্দিনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া কার্যত তিনি বাংলার গবর্ণর স্যার জন এন্ডারসনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি প্রজার অধিকারের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন এবং অবশ্যই তিনি জয়লাভ করিবেন; কিন্তু যদি তিনি পরাজিত হন, তাহা হইলে ইহা ওয়াটারলু যুদ্ধে নিপোলিয়নের পরাজয় হইতে অধিকতর গৌরবজনক হইবে।[২৪] গণনেতা ফজলুল হক প্রজাদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। পটুয়াখালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাযিমুদ্দিন পরাজিত হন। তিনি মাত্র ৫০০০ ভোট পান। ফজলুল হক ১৩০০০ ভোটে নির্বাচিত হন। কৃষক প্রজার নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি সরকার কৃষকদের দাবী গ্রহণ না করে তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশের সরকারী ভবন (Writers Building) লালদীঘিতে নিক্ষেপ করিবেন।[২৫] ফজলুল হক আরও একটি কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হন। এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী দুইটি কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি নাযিমুদ্দিনের জন্য একটি কেন্দ্র ছাড়িয়া দেন। ইহার ফলে নাযিমুদ্দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন পান।[২৬]

প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। এ সাফল্যের মূলে ছিল প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থার কর্মসচিব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী কর্মকুশলতা ও সংগঠন ক্ষমতা। তাঁহার সংগঠন ও নির্বাচনী প্রচারকার্যের ফলে মুসলিম লীগ মুসলমান ছাত্র সমাজের সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে লীগের সাফল্যের পথ সুগম হয়। ১১৯টি সংরক্ষিত মুসলমান আসনের মধ্যে লীগ ৪০টি দখল করে; প্রজা পার্টি ৩৮টি এবং স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থীগণ ৪১টি পায়। সাধারণ আসনগুলির মধ্যে কংগ্রেস ৬০টি লাভ করে এবং বাকিগুলি স্বতন্ত্র বর্ণ হিন্দু তফসিলী হিন্দু ও ইউরোপীয় প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থীদের কেহ কেহ মুসলিম লীগে ও কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেয়। ইহার ফলে ব্যবস্থাপক সভায় লীগের সভ্য সংখ্যা ৫৫ হয়। ব্যবস্থাপক সভায় মোট ২৫০টি আসনের ব্যবস্থা ছিল।[২৭]

অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় মোট ১৭৫টি আসন ছিল। সেখানে মুসলিম লীগ মাত্র ২টি আসন পায়। ইউনিয়নিষ্ট পার্টি প্রায় সব কয়টি মুসলমান আসন দখল করে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লাল কোর্তা (Red Shirt) দল ব্যবস্থাপক সভায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে, মুসলিম লীগ একটি আসনও পায় নাই। সিন্ধু প্রদেশেও মুসলিম লীগের অবস্থা নৈরাশ্যজনক ছিল। আসামে লীগ ৯টি আসন পায় এবং কংগ্রেস অধিকাংশ আসন দখল করে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের একাধিপত্য

www.bjilibrary.com

হল এবং মুসলিম লীগের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কেবল মাত্র যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ৬৪টি মুসলমান আসনের মধ্যে লীগ ২৬টি আসন লাভ করে।[২৮]

ফজলুল হকের প্রজা–লীগ মন্ত্রিসভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন রাজনৈতিক দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কংগ্রেস দলের নেতা শরৎচন্দ্র বসু, ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থনের আশ্বাস দেন, কিন্তু তিনি ও তাহার দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তা'ছাড়া মন্ত্রিসভাকে সমর্থনের বিনিময়ে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দাবী করেন। এই শর্ত ফজলুল হকের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ নেতাগণ প্রজা- কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখিয়া শংকিত হইয়া পড়েন। এবং ফজলুল হকের সহিত আপেষ মীমাংসায় আসিতে উদগ্রীব হইয়া উঠেন। এইচ. এস, সোহরাওয়ার্দী ফজলুল হকের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাকে সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিছু সংখ্যক বর্ণ হিন্দু ও তফসিলী হিন্দু সভ্য ফজলুল হককে সমর্থন করেন। ইহার ফলে ব্যবস্থাপক সভায় তাহার সমর্থনকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। গবর্ণর ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করেন। ফজলুল হক প্রজা-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্যার খাজা নাযিমুদ্দিন, নবাব হাবীবুল্লাহ, এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নওশের আলী, নবাব মোশাররফ হোসেন, স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, মুকুন্দবিহারী মল্লিক ও প্রসন্নসদেব রায়কট এই কয়জন সদস্যকে লইয়া ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রিত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

মন্ত্রিসভা গঠনের কয়েকদিন পর ফজলুল হক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ফজলুল হকের প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের মুসলমানদের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। প্রায় দুই শতাব্দীর দূরবস্থার পর বাংলাদেশের মুসলমানগণ আবার তাহাদের রাজনৈতিক প্রধান্য ফিরিয়া পায়। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলমানদের মনে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় জন্মে। স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী করিতে ও আইন সভায় প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার ব্যাপারে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী সুদক্ষ রাজনীতিকের পরিচয় দেন। বাগ্মিতায় তাহারা সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেন। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁহার নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসন যেরূপ সুন্দরভাবে চলিয়াছিল তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জন্য আদর্শ স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ ফজলুল হকের সাহস ও কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে 'শেরেবাংলা' নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন।[২৯]

১৯৩৭ সালে বাংলাদেশই ছিল বৃটিশ ভারতের মধ্যে একমাত্র প্রদেশ যেখানে মুসলিম লীগের প্রাধান্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। বাংলাদেশে লীগ মন্ত্রিসভা ছিল এবং আইন সভায় লীগ দলের সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলাদেশই ছিল মুসলিম

www.bjilibrary.com

লীগের একমাত্র আশাভরসাস্থল এবং অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। যদি বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা ও আইনসভায় মুসলিম লীগের অবস্থা ভিন্ন রূপ থাকিত তাহা হইলে সর্বভারতীয় লীগ মহলে নিরাশার আবহাওয়া বিরাজ করিত।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ফজলুল হক ও তাঁহার লীগ প্রজা মন্ত্রিসভা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং প্রদেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য এই কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলির ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। দরিদ্র কৃষকদের সুদখোর মহাজনদের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন (Bengal Agricultural Debtors Act) পাশ করেন। এই আইনের বলে বাংলাদেশের ষাট হাজারটি ঋণ সালিশী বোর্ড (Debt Settelment Board) স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। মহাজনগণ খাতকদের বন্ধকী জমি হইতে বৎসরের পর বৎসর যে সুবিধা পাইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া ঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকা হইতে ৬০ কোটি টাকায় হ্রাস করা হয়। ঋণ সালিশী বোর্ডগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যাহাতে ইহারা খাতকদের সুবিধাজনক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এই আইনের ফলে কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘব হয় এবং তাহারা বন্ধকী জমি ফিরিয়া পায়। ভবিষ্যতে যাহাতে কৃষকগণ মহাজনের কবলে না পড়ে সেজন্য ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় কুসিদজীবী আইন (Bengal Moneylenders Act) পাশ করেন। এই আইনের দ্বারা সুদের ব্যবসায়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এবং ইহার অন্যায় হইতে কৃষকদের রক্ষার ব্যবস্থা হয়।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং জমির উপর কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা ফজলুল হকের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন জমিদার; লীগ দলের প্রায় সকলেই জমিদার ছিলেন। তাঁহারা কিছুতেই জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক, ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন (Bengal Tenancy Amendment Act 1938) পাশ করা হয়। এই আইনের দ্বারা প্রজাদের উপর জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা হয়। এই আইনে বলা হয় যে জমিদার ভূমিকর বৃদ্ধি করিতে ও প্রজার জমি দখল করিতে পরিবে না এবং প্রজাদের জমি হস্তান্তরের সময় কোন কর দাবী করিতে পরিবে না।[৩০] জমিদার সমিতির (Land holders Association) এক সভায় জনৈক জমিদার মন্ত্রী প্রজাদেরকে এই সব সুবিধা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত কুকুরদের জন্য হাড়ের টুকরা নিক্ষেপ করিতেছেন, কারণ যদি ইহাদেরকে হাড়ের টুকরা দেওয়া না হয় তাহা হইলে হতাশার মধ্যে পড়িয়া জমিদারদেরকে হত্যা করিতে পারে।[৩১] ইহা হইতে প্রজাদের প্রতি জমিদারদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং জমিদারী প্রথা রহিত করিবার ব্যাপারে ফজলুল হককে জমিদারদের যে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয় তাহার আভাস পাওয়া যায়।

www.bjilibrary.com

ফজলুল হক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিতে না পরিলেও ইহা রহিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিবার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য তিনি ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন। ফ্লাউড কমিশন জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য সুপারিশ করেন এবং জমিদারীর দেয় রাজস্বের অনুপাতে ইহার ৫ হইতে ১০গুণ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জমিদারদেরকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ফজলুল হক ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জমিদারী বিলোপের জন্য একটি প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করেন। মন্ত্রিসভার জমিদারেরা এই প্রস্তাবটি বানচাল করিয়া দিতে নানাভাবে চেষ্টা করেন। তাহাদের কেহ কেহ ফজলুল হককে গদীচ্যুৎ করিতে চেষ্টার কসুর করেন নাই। নবাব মোশাররাফ হোসেন আইন সভায় বলিয়াছিলেন যে, ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি নিজের সর্বস্ব ব্যয় করিবেন। ফজলুল হক জমিদারদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া জমিদারী উঠাইয়া দিবার পক্ষে প্রস্তাব পাশ করাইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটিকে আইনের খসড়ায় রূপ দিবার পূর্বে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহার পক্ষে জমিদারী উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নাই। তবে জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য তিনি একটি শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই দেশের আবাদীর পর ১৯৫১ সালে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা পূর্ববাংলা জমিদারী দখল আইন (East Bengal Zamindari Acquisition Bill, 1951) পাশ করিয়া জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ফজলুল হকের জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ১৯১২ সালে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি (Central Muhammedan Educational Society) স্থাপন করিয়াছিলেন। দরিদ্র মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ফজলুল হকের চেষ্টায় ১৯১৮ সালে মুসলমান ছাত্রদের জন্য কলিকাতায় কারমাইকেল হোস্টেল ও টেইলার হোস্টেল স্থাপিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে ফজলুল হক ছয়মাস শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শিক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।। মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি মুসলিম শিক্ষা তহবিল (Fund) প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজে আরবী ও ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তিনি মুসলিম শিক্ষা বিভাগ প্রবর্তন করেন এবং এইজন্য একজন অতিরিক্ত ডিরেকটার নিয়োগের সংস্থান করেন এবং এইজন্য একজন অতিরিক্ত ডিরেকটার নিয়োগের সংস্থান করেন। খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ এই পদে নিযুক্ত হন। আহসানউল্লাহ মাদ্রাসা শিক্ষাকে নূতন ছাচে পুনর্গঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ফজলুল হক ১৯২৪ সালে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন; ১৯২৬ সাল হইতে এই কলেজে প্রিন্সিপাল নিয়োগ করেন। ইহার পূর্বে কোন ভারতীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন নাই।

www.bjilibrary.com

জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাহাতে তিনি শিক্ষা বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্গঠন করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং খান বাহাদুর মাওলা বখশকে ইহার সভাপতি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষ কর্মচারীরূপে নিয়োগ করেন। মাওলা বখশ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষা পুনর্গঠিত হয়। বাংলাদেশের কৃষক ও জনসাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্য ফজলুল হক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রত্যেক জিলায় স্কুল-বোর্ড স্থাপিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য অবস্থাপন্ন লোকদের থেকে ভূমিকরের সহিত শিক্ষাকর আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের আমলে ঢাকার কৃষি কলেজ ও বরিশালের চাখার কলেজ স্থাপিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য কলিকাতায় লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ ও ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৪]

ফজলুল হক মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতির পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪০ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রণয়ন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত হইলে ইহার উপর হিন্দুদের প্রাধান্য নষ্ট হইবে। এইজন্য হিন্দু নেতাগণ মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার দরুন আইন সভায় বিলটির আলোচনা মুলতবী রাখা হয়।[৩৫]

সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগের ব্যাপারে ফজলুল হক কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পূর্বে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের প্রবেশ কঠিন ছিল। সরকারী দফতরগুলিতে হিন্দুদের প্রতিপত্তি থাকায় সেখানে হিন্দু প্রার্থীগণ সহজে ঢুকিতে পারিত এবং মুসলমান প্রার্থীদের পক্ষে চাকুরী পাওয়া কঠিন ছিল। মুসলমান প্রার্থীদের এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে ফজলুল হক নির্দেশ দেন যে, মুসলমানদের জন্য সকল দফতরে শতকরা ৫০টি আসন সংরক্ষিত থকিবে। নির্দেশটি এইরূপ ছিল। বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, কোন কারণবশত যে সকল পদে কেবল ভারতীয়দেরকে নিয়োগ করা হয় সেইগুলি ছাড়া প্রদেশের অন্যান্য সরকারী চাকুরীতে ভবিষ্যতে সরকার যতদূর সম্ভব মুসলমান ও অমুসলমানদেরকে সমান সমান হারে নিয়োগের নীতি অনুর্সরণ করিয়া চলিবে। সরকারী চাকুরীর শতকরা ৫০টি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। যদি তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের জন্য শতকরা ১৫টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে, কিন্তু তাহাদের সংরক্ষিত চাকুরী অমুসলমানদের মোট চাকুরীর শতকরা ৩০টির বেশি হইবে না।[৩৬] এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে যাহাতে এই সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ করা হয় তাহা দেখাশুনার জন্য একজন সাম্প্রদায়িক হার কর্মচারী

www.bjilibrary.com

(Communal Ratio Officer) নিয়োগ করা হয়।[৩৭] তাহা ছাড়া, ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংশোধন আইন পাশ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। এই আইনের ফলে কর্পোরেশনে হিন্দু প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং ইহার পরিচালনার ব্যাপারে মুসলমানগণ কিছুটা অংশ লাভ করে।[৩৮]

ফজলুল হক ও তাঁহার মন্ত্রিসভার বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয় এবং জনসাধারণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। প্রজাগণ জমিদার ও মহাজনদের কবল হইতে রেহাই পায় এবং তাহাদের জমির উপর তাহাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন চাকুরীর জন্য মুসলমান যুবকেরা যোগ্যতা অর্জন করে। সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী দফতরগুলিতে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হয়।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভার শাসন আমলে বাংলাদেশের মুলসমানদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং তাহারা মনে করে যে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কংগ্রেস দল নানাভাবে তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৩৯] ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিল। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার হইতেছিল সে বিষয়ে ফজলুল হক তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের দুরবস্থার প্রতি তিনিই প্রথম সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য মুসলিম লীগ একটি কমিটি গঠন করে। পীরপুরের রাজা সৈয়দ মুহম্মদ মেহেদী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। বিহারের মুসলিম লীগ শরীফ কমিটি নামে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। পীরপুর কমিটি ও শরীফ কমিটির রিপোর্ট হইতে মুসলমানদের প্রতি অন্যায়ের কথা প্রকাশ পায়।[৪০] ভারত সরকারের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। এই উপলক্ষে জিন্নাহর নির্দেশে ভারতের মুসলমানগণ ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর নাযাত দিবস পালন করে। এই সময় ফজলুল হক যে বিবৃতি দেন তাহা 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুরবস্থা' নামে পুস্তিকার আকারে বাহির হয়।[৪১]

ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদানের পর এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি ও এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী কর্মসচিব নির্বাচিত হন। হকের জনপ্রিয়তা ও সোহরাওয়ার্দীর সংগঠন ক্ষমতার ফলে বাংলাদেশে লীগ এইরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, আইনসভার উপ নির্বাচনে ইহার মনোনীত প্রার্থীগণ সব কয়টি আসন দখল করে। এই সময় পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দর হায়াত খান জিন্নাহর সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন যে, ইউনিয়নিষ্ট পার্টিতে থাকিয়াও তিনি ও তাঁহার সহচরেরা মুসলিম লীগকে সমর্থন করিবেন।[৪২] ইহাতে ভারতে মুসলিম লীগের উন্নতি হয়। চৌধুরী খালিকুজ্জমান মন্তব্য

www.bjilibrary.com

করিয়াছেন যে, "যদি পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রিগণ যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের রক্ষার জন্য আসিতে সম্মত না হইতেন তাহা হইলে কি ঘটিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এই অবস্থায় লীগ মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকিত এবং কালক্রমে ইহাকে কংগ্রেসের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইত। মুসলিম লীগের খুব সংকটজনক মুহূর্তে স্যার সিকান্দার ও ফজলুল হক তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়া ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করেন।[৪৩]

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সমাধানের প্রস্তাবক হিসাবে তাঁহার নাম ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়। বাংলাদেশের মুসলমানরা লীগের আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে এবং ছাত্র সম্প্রদায় ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।

হক জিন্নাহ মতান্তর

ফজলুল হক বাংলাদেশের অদ্বিতীয় জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের যে মহা উপকার করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ইহা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জিন্নাহর সহিত মতান্তর হওয়ায় ফজলুল হকের নেতৃত্ব ক্ষুণ্ন হয়। সে সময় বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান ও ছাত্র সমাজ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করিয়াছে। এবং লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহারা তাহাদের জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হককে ত্যাগ করিতে ইতস্তত করে নাই।

ফজলুল হককে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য নিয়োগের বিষয় লইয়া জিন্নাহর সহিত তাহার মতান্তর হয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বৃটেনের পক্ষে ভারতের যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এই ব্যাপারে ভারতের দলগুলির মতামত গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রদেশগুলির কংগ্রেস মন্ত্রিদের পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয়। মুসলিম লীগ ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করে। ১৯৪০ সালের ২৭শে মে সংবাদপত্রে বিবৃতিতে জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, যে সব প্রদেশে মুসলিম লীগের পাধান্য আছে সেগুলি ইচ্ছা করিলে সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে পারে।[৪৪] মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি ১৪-১৭ জুন জিন্নহর বিবৃতির অনুরূপ একটি প্রস্তাব পাশ করে।[৪৫] আগস্ট মাসে বৃটিশ সরকার বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ সম্পসারণ, ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। ইহা আগস্ট প্রস্তাব নামে পরিচিত।[৪৬] লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি বোম্বাই শহরে ৩১শে আগস্ট অনুষ্ঠিত সভায় আগস্ট প্রস্তাব বিবেচনা করে। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, লীগ

www.bjilibrary.com

সভাপতি বড়লাটের নিকট হইতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন এবং যে পর্যন্ত তাহা না হয় সে পর্যন্ত কোন মুসলমান, বিশেষ করিয়া লীগ সভ্য কোন যুদ্ধ কমিটিতে যোগদান করিবেন না।[৪৭] বড়লাটের কার্যনির্বাহক কমিটি ও জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির গঠন সম্পর্কে লিনলিথগোর ব্যাখ্যা লীগ কর্মকর্তাদের গ্রহণযোগ্য হয় নাই এবং এই কারণে লীগ কমিটি ২৮শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখিয়া প্রস্তাব পাশ করে।[৪৮]

১৯৪১ সালের ২০শে জুলাই এক পত্রে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর স্যার রোজার লামলী লীগ সভাপতিকে জানান যে, বড়লাট তাঁহার কার্যনির্বাহক কমিটি সম্প্রসারিত করিয়া ৫জন অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ইহাদের মধ্যে ২জন মুসলমানকে (স্যার আকবর হায়দরী ও ফিরুয খান নূন) লওয়া হইয়াছে। ৩০ জন সভ্য নিয়া জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত হইতেছে এবং ইহাতে বাংলাদেশ, আসাম ও পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রিদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[৪৯] লামলীর পত্রের উত্তরে জিন্নাহ লিখেন যে, লীগের সভাপতি ও কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়া বড়লাট মুসলমান প্রধান মন্ত্রিদেরকে ও সভ্যদেরকে পরিষদে নিয়োগ করিতেছেন, তিনি বড়লাটের এই কার্যের সমর্থন করিতে পারেন না।[৫০] জিন্নাহর নির্দেশে মুসলিম লীগের কর্মসচিব লিয়াকত আলী খান জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে মনোনীত মুসলমান সদস্যদের নিকট কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ প্রেরণ করেন। এই বিষয় বিবেচনার জন্য তিনি ২৪শে আগস্ট বোম্বাইয়ে লীগ কমিটির সভা আহ্বান করেন।

ফজলুল হক কেন্দ্রীয় লীগ কমিটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু তিনি এই সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দর হায়াত খান সভার একদিন পূর্বে বোম্বাই আসেন। জিন্নার পরামর্শে তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতে সম্মত হন। আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ পরিষদ হইতে পদত্যাগ করেন। লীগ কমিটি ফজলুল হক ও বেগম শাহনেওয়াজকে পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতে দশ দিনের সময় দেয়, এবং তাহারা পদত্যাগ না করিলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লীগ সভাপতিকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে।[৫১]

ফজলুল হক খুব স্পর্শকাতর মনের লোক ছিলেন। আত্মসম্মানে আঘাত তিনি সহ্য করিতে পরিতেন না। লীগের কর্মসচিব তাহাকে কারণ দর্শাইবার জন্য যে নোটিশ দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি অপমানবোধ করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া জিন্নাহ যেভাবে কমিটিতে পরিষদ হইতে পদত্যাগের ব্যাপারে প্রস্তাব পাশ করিয়াছিলেন। তাহাতেও ফজলুল হক মনে আঘাত পান। চৌধুরী খালিকুজ্জামান লিখিয়াছেন যে, তিনি লীগ কমিটির সভায় প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, লীগের কোন আইনের বলে ইহার সভ্যদের প্রতি কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারী করা হইয়াছে, কিন্তু জিন্নাহ এই প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়া দেন।৫২ ফজলুল হক বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা ও লাহোর প্রস্তাবের

www.bjilibrary.com

উত্থাপক ছিলেন। যদি লীগের কর্মকর্তাগণ সিকান্দর হায়াতের মতন তাঁহাকে শোভন সৌজন্যের সহিত প্রতিরক্ষা পরিষদ হইতে পদত্যাগের পরামর্শ দিতেন তাহা হইলে তিনি মনে আঘাত পাইতেন না এবং লীগের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেন। লীগ কর্মকর্তাদের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া ফজলুল হক ৮ই সেপ্টেম্বর এক পত্রে জানান যে, তিনি প্রতিরক্ষা পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতেছেন এবং লীগ কমিটি ও লীগ পরিষদ হইতেও পদত্যাগ করিতেছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, লীগ সভাপতি অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ও স্বেচ্ছাচারী রূপে কাজ করিতেছেন এবং বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসনকার্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করিতেছেন।[৫৩] লীগ কমিটি এই অভিযোগ আপত্তিজনক বলিয়া মনে করেন এবং তাহাকে দশদিনের মধ্যে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে নির্দেশ দেন।[৫৪] ফজলুল হক জানান যে, তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই এবং কাহারও মনে আঘাত করার তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার এই কৈফিয়ৎ অধিকাংশ সদস্যের মত অনুযায়ী গৃহীত হয়।[৫৫]

আবেগ প্রবণতা ফজলুল হকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "আমার সকল কাজ ক্ষণিকের আবেগের প্রাবল্য দ্বারা পরিচালিত হইত।" ইহার ফলে অনেক সময় তিনি অনেক গঠনমূলক কাজ করিয়ছেন, আবার কোন কোন সময় ভুলও করিয়াছেন। তা'ছাড়া তিনি স্বভাবত বিদ্রোহী ছিলেন এবং কাহারও কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পরিতেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে তিনি বাহিরের কাহারো হস্তক্ষেপ মানিয়া লইতে পারেন নাই।[৫৬] জিন্নাহর সহিত মতান্তরের পর লীগের কর্মকর্তাদের সহিত ফজলুল হকের সম্পর্ক তিক্ত হইয়া পড়ে। তিনি তাহাদেরকে উপেক্ষা করিয়া চলেন এবং মনে করেন যে, স্বীয় জনপ্রিয়তার বলে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন স্বাধীনভাবে চালাইতে পারিবেন। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। এই সময় বাংলার শিক্ষিত ও ছাত্র সমাজ লীগের আদর্শে ও নেতৃত্বে অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করিয়াছে এবং লীগের সংহতির জন্য তাহারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সময় ফজলুল হকের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সুযোগ পায়; তাঁহারা তাঁহাকে হয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় লাগিয়া যায়।[৫৭]

ফজলুল হক দলীয় ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী নীতি অনুসরণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদে থাকিয়াও তিনি আইন সভায় মুসলিম সভ্যদেরকে লইয়া প্রগ্রেসিভ পার্টি নামে একটি দল গঠনে উৎসাহ দেন। ইহার পর এই পার্টি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হিন্দু মহাসভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক প্রজা ও তফসিলী হিন্দু এই দলগুলির সহিত মিলিয়া প্রোগ্রেসিভ যুক্ত দল গঠন করে। ফজলুল হক ইহার নেতা নির্বাচিত হন। তিনি মুসলিম লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেন। আইন সভায় তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এইজন্য গভর্নর তাঁহাকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। (১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪১)। ফজলুল হক প্রোগ্রেসিভ যুক্ত

www.bjilibrary.com

মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ইহার ৯ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৫জন মুসলমান ও ৪জন হিন্দু ছিলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে অর্থ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সময় আইন সভায় ৪০জন লীগ দলের সভ্য ছিলেন। তাঁহারা খাজা নাযিমুদ্দীনের নেতৃত্বে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রোগ্রেসিভ যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করায় জিন্নাহ ফজলুল হককে ও তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য নবাব হাবীবুল্লাহকে মুসলিম লীগ হইতে বাহির করিয়া দেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "আমি ফজলুল হককে বড়দিনের উপহার স্বরূপ বড়লাটকে দিতেছি এবং ঢাকার নবাবকে বড়দিনের সওগাত স্বরূপ বাংলার গবর্ণরকে দিতেছি।"[৫৮] জিন্নাহর এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া লীগ কমিটি প্রস্তাব পাশ করে যে, ফজলুল হক মুসলিম লীগ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাঁহাকে এই প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।[৫৯] ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসীলম লীগ সম্মেলনে জিন্নাহ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ করেন এবং যে সকল ঘটনার দরুন তাঁহাকে লীগ হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন।[৬০]

ফজলুল হকের প্রোগ্রেসিভ যুক্ত মন্ত্রিসভা মুসলমান স্বার্থের প্রতি সজাগ ছিলেন। এই সময় এ, আর, পি ও অন্যান্য সরকারী বিভাগে বহু মুসলমানকে নিয়োগ করা হয়। মুসলমান প্রার্থীদেরকে যাহাতে নির্ধারিত হার অনুযায়ী নিয়োগ করা হয় সেজন্য ফজলুল হক কড়া নির্দেশ জারি করেন এবং এ বিষয়ে ভারপাপ্ত কর্মচারীকে (Commnunal Ratio Officer) তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের সহায়তায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুইশত মুসলমানের চাকুরীর ব্যবস্থা করেন।[৬১] ইহা সত্ত্বেও, হিন্দু মহাসভার সহিত যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করায় এবং মুসলিম লীগে না থাকায় মুসলমান ছাত্র সমাজে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যে ছাত্রগণ পূর্বে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করিত তাহারা তাঁহাকে কাল পতাকা প্রদর্শন করে। ঢাকা-বরিশাল যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানেই তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে। সোহরাওয়ার্দী ছাত্রদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়া ফজলুল হক এবং তাঁহার মন্ত্রী ও সভ্যদের বিরুদ্ধে এক বিরুদ্ধ শক্তি গড়িয়া তোলেন এবং তাহাদের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে কয়েকজন সভ্য ফজলুল হকের দল ছাড়িয়া লীগে যোগ দিতে বাধ্য হন। নাটোর ও বাগেরহাট উপনির্বাচনে তাঁহার দলীয় প্রার্থীগণ লীগের প্রার্থীদের নিকট হারিয়া যায়।[৬২] বাংলার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা শেরেবাংলা সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম বার জনসাধারণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অবস্থায় পড়েন।

www.bjilibrary.com

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতন

মুসলিম লীগের সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও ফজলুল হক আইনসভায় তাঁহার দলের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহাকে অন্য এক প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে হয়। বাংলার গভর্ণর স্যার জন হাবার্ট তাঁহার বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি ফজলুল হকের রাজনৈতিক ব্যাপারে অবাধ নীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। ফজলুল হক সুভাষ বসুর ফরওয়ার্ড ব্লককে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে সুভাষ বসুকে ভারতরক্ষা আবনি গ্রেফতার করা হয়। অসুস্থতার দরুণ ১৯৪১ সালে জানুয়ারীতে তাঁহাকে জেল হইতে ছাড়িয়া দিয়া গৃহবন্ধী করিয়া রাখা হয়। সুভাষ বসু বন্দীদশা হইত পালাইয়া জার্মানীতি পৌছেনএবং পরে জাপান যান। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রেফতার করা হয়। ইহার পর সন্তোষ কুমার বসু ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা নির্বাচিত হন। বৃটিশের পরম শত্রু সুভাষ বসুর দলের সহিত মন্ত্রিসভা গঠন করায় ফজলুল হকের প্রতি গভর্ণর বিরূপ হইয়া পড়েন। ইহার পর ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট যখন কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' (Out India) আন্দোলন শুরু করেন তখন এই বিক্ষেভের প্রতিক সরকারী নীতি নিয়া গভর্ণর ও ফজলুল হকের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। বঘর্ণর শক্ত হাতে এই আন্দোলন দমন করিতে মনস্ত করেন। এবং এই ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সংকল্প করেন। মন্ত্রিসভাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি স্থায়ী কর্মচারীদের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইতে চেষ্ঠা করেন। অন্যদিকে ফজলুল জক গভর্ণরকে প্রদেশের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রূপে কাজ করিতে এবং রাজনৈতিক বিষয় মন্ত্রিদের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দেন। কিন্তু গভর্ণর ইহা অগ্রাহ্য করিয়া চলেন। ১৯৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী গভর্ণরের নিকট এক পত্রে ফজলুল হক তাঁহার অনিয়মতান্ত্রিক কার্যের প্রতিবাদ করেন এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যাপারে তিনি যে ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করেন।[৬৩]

গভর্ণর ফজলুল হককে গদীচ্যুত করিবার অজুহাত খুঁজিতেছিলেন। এই সময় 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় মেদেনীপুরের কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের উপর পুলিশের অকথ্য জুলুম হয়। আইন সভায় অনেক সভ্য পুলিশের জুলুমের জন্য মন্ত্রিসভার নিন্দা করেন এবং এই ব্যাপারে তদন্ত দাবী করেন। ফজলুল হক সভ্যদেরকে নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দেন। কোন বিষয়ে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু গভর্ণর এই সামান্য ব্যাপারটিকে উপলক্ষ করিয়া ফজলুল হককে অশোভন ভাষায় এক পত্র লিখেন। তিনি দাবী করেন যে, তদন্তের বিষয়টি তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত এবং প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া তদন্তের আশ্বাস দিয়া বিধিবহির্ভুত কাজ করিয়াছেন। সেজন্য তিনি প্রাধানমন্ত্রীর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। ফজলুল হক গভর্ণরের অশোভন ভাষায় লিখিত পত্র পাইয়া খুবই ক্রুদ্ধ হন এবং তাহার অশিষ্টতার সমুচিত জবাব দেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৩) এক পত্রে ফজলুল হক লিখেন, "আপনার মতে,

www.bjilibrary.com

সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে আমি আপনার সহিত পরামর্শ করি নাই আমার এই আচরণের জন্য আপনাকের কোন কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু আপনার পত্রে আপনি আমার প্রতি যেরূপ অশোভন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন ভবিষ্যতে গভর্ণর প্রধানমন্ত্রীর সহিত পত্র বিনিময়ে যাহাতে সেইরূপ ভাষা ব্যবহার না করেন সেজন্য আপনাকে শিষ্টভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমি আপনার প্রতি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

গভর্ণর অশোভন আচরণের সমুচিত প্রতিদান পান; তিনি এই অপমান হযম করিতে পারেন নাই। আইনসভায় ফজলুল হকের সংখাগরিষ্ঠতা ছিল। এইজন্য গভর্ণর প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পরিতেছিলেন না। তিনি কূট চক্রান্তের আশ্রয় লন। ২৮শে মার্চ বিকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনার জন্য লাটভবনে আহ্বান করেন। তিনি ফজলুল হকের নেতৃত্বে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করেন এবং ইহা ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলেন। গভর্নর তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রকাশ করা হইবে না। পদত্যাগ পত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়া ছিল। ফজলুল হকের সম্মুখে তখন দুইটি পথ খোলা ছিল, হয় তাঁহাকে পদত্যাগ পত্রে দস্তখত করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হইবে। গভর্ণরের কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি পদত্যাগ পত্র স্বাক্ষর করেন। সেদিন রাত ১০টার সময় ফজলুল হক লাটভবন হইতে একটি পত্র পান। সে পত্রে তাঁহাকে জানান হয় যে, গভর্ণর তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। গভর্ণর বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফজলুল হকের দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ক্ষমতাচ্যুত করেন। ৩০শে মার্চ কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভায় ফজলুল হক ও অন্যান্য নেতাগণ জন হার্বার্টের অবৈধ কার্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং তাহার অপসারণের দাবী জানান।[৬৭]

নাযিমুদ্দীনের লীগ মন্ত্রিসভা

১৩ই এপ্রিল (১৯৪৩) গভর্নর আইনসভায় লীগ দলের নেতা খাজা নাযিমুদ্দীনকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করেন। তখন আইনসভায় লীগ দলের ৫০ জন সদস্য ছিল। কিছু সংখ্যক হিন্দু এবং ইয়ুরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সভ্যের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে নাযিমুদ্দীন ৭ জন মুসলমান ও ৬জন হিন্দু সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভায় এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের (Civil Supplies) ভার গ্রহণ করেন।[৬৮] নাযিমুদ্দিনের মন্ত্রিত্বের আমলে বাংলাদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় জাপানীদের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বৃটিশ সরকার বাংলাদেশের যানবাহন নষ্ট করিয়া দেয় এবং খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া গুদামজাত করে ও সৈন্যদের প্রয়োজনে বাহিরে প্রেরণ করে। ইহাতে প্রদেশে ভীষণ খাদ্যাভাব হয়। দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের প্রায় বিশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সোহরাওয়ার্দী খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার ফলে লক্ষ অনশন ক্লিষ্ট লোক মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পায়।[৬৯]

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংগঠন লীগ মন্ত্রিসভার সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের চেষ্টায় বাংলাদেশে লীগের শক্তি সুসংহত হয়। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মসচিব নির্বাচিত হন।[৭০] লীগকে জনগণের প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি প্রতি জিলা ও ইউনিয়নে ইহার শাখা স্থাপন করেন। ইহার ফলে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছে এবং শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের লোকেরা জিলা লীগ পরিষদ ও প্রাদেশিক লীগ পরিষদে আসন লাভ করে।[৭১] কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ফলে পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই সময় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিতির সুযোগে লীগ প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই সময় বিশ লক্ষ লোক সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভ্যভুক্ত হয়। ইহার ফলে লীগ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শক্তিশালী আন্দোলনে অবতীর্ণ হইতে পারে।

কিন্তু আইনসভায় নাযিমুদ্দীনের লীগ মন্ত্রিসভার অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল, নাযিমুদ্দীনকে হিন্দু ও ইউরোপীয়ান সভ্যদের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হইত। ১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের উপর ভোট গ্রহণ করা হইলে তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন হয়।[৭২] গভর্ণর আর, জি, কেসী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ না করিয়া প্রদেশে গভর্ণরের শাসন প্রচলন করেন।[৭৩]

www.bjilibrary.com

সপ্তদশ অধ্যায়
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী : লাহোর প্রস্তাব

মুসলমানগণ ভারতে সংখ্যালঘু ছিল; কিন্তু সংখ্যালঘু হইলেও সম্প্রদায় হিসাবে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ভারতের চল্লিশ কোটি অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নয় কোটি। তাহাদের নিজেদের ধর্মীয় ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল। তাহারা আশঙ্কা করে যে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু ছিল। এই অবস্থায় অখণ্ড ভারতের শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য কিছুটা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করাই ছিল মুসলমান নেতাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা প্রদেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা ন্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছেন।

জিন্নাহ, ফজলুল হক ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভারতের শাসনতন্ত্রে মুসলমামানদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যাপারে একটি মীমাংসায় আসিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) সম্পাদিত হয়। কংগ্রেস ও লীগ সম্মিলিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ইহারা মিলিতভাবে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন পরিচালনা করে। ইহার পর কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কংগ্রেস লক্ষ্ণৌচুক্তির কোন কোন শর্ত পুনর্বিবেচনা করিবার অভিমত প্রকাশ করে। বাংলাদেশের নেতাগণ ইহার একটি শর্ত তাঁহাদের প্রদেশের জন্য অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কারণ সংখ্যা লঘু প্রদেশের মুসলমানদেরকে তাহাদের প্রদেশে অতিরিক্ত আসন দিতে গিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানেরা প্রদেশে সংখ্যগুরু হইয়াও আইনসভায় সংখ্যালঘু হইয়া পড়িয়াছিল। কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নেহেরু কমিটি গঠিত হয়। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে নেহেরু কমিটির রিপোর্ট জিন্নাহ এবং আরও অনেক লীগ নেতার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। জিন্নাহ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে চৌদ্দদফা দাবী উত্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ও ভারতের ভবিষৎ শাসনতন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানাদের দাবীদাওয়ার সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় নাই।[১]

ইহার পরও জিন্নাহ হিন্দু-মুসলমানদের প্রশ্নে কংগ্রেসের নেতাদের সহিত আপোষমূলক মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন; তাঁহাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়

www.bjilibrary.com

নাই।[২] ১৯৩৭-৩৮ সালে জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। জিন্নাহ দাবী করেন যে, মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। গান্ধী ইহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। কারণ তখন কংগ্রেসেও অনেক মুসলমান সভ্যভুক্ত ছিলেন এবং কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবী করিত। জিন্নাহ ও জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে পত্রালাপ হয়। নেহেরু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মীমাংসার ব্যাপারে লীগকে কংগ্রেসের সমমর্যাদা দিতে অসম্মত হন। ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত পত্র বিনিময় করেন। ইহাতেও হিন্দুমুসলমান সমস্যায় কোন আপোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না।[৩] ইহার পর প্রদেশের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে জিন্নাহ মুসলমানদেরকে নাযাত দিবস পালন করিতে নির্দেশ দেন। নেহেরু জিন্নাহ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ ভুলাভাই দেশাইর সহিত আলাপ-আলোচনা করেন; তিনি প্রদেশে কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।[৪]

মুসলিম লীগ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটি রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছিল। মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ইহাও লীগের অন্যতম দাবী ছিল। কংগ্রেস নেতাগণ লীগের দাবী মানিয়া লন নাই। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হইবে, এরূপ ধারণা তাঁহারা অমূলক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহাতে লীগ ও কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া মুসলিম লীগ মনে করে যে, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। ওয়ার্দা শিক্ষা পরিকল্পনা, বিদ্যামন্দির শিক্ষা ব্যবস্থা, বন্দেমাতরম গান ও হিন্দুয়ানী পাঠ্যপুস্তক প্রচলন করায় মুসলমানেরা তাহাদের ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়ে।[৫] স্যার ভার্নি লোভেট লিখিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে হিন্দু নেতাগণ কিছুটা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিলেন।[৬] ইহার পর লীগ নেতাগণ অখণ্ড ভারতের আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া পড়েন এবং তাহাদের মধ্যে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী উত্থিত হয়।

কিছুকাল হইতেই ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কোন মুসলমান নেতা ও বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। বিশ্ব মুসলিম পরিকল্পনার অন্যতম প্রবক্তা জামালুদ্দীন আফগানী উত্তর পশ্চিম ভারত, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া লইয়া একটি মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের দাবী তুলিয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশের ডাঃ আবদুল জব্বার খায়েরী, আবদুল কাদির বিলগ্রামী ও সরদার মুহম্মদ গুল খান (১৯২২) হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমাধানরূপে ভারত বিভাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।[৭] ১৯২৪ সালে পাঞ্জাবের নেতা লালা লাজপত রায় ভারত বিভাগের কথা বলিয়াছিলেন। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, আমি সাত কোটি মুসলমানের জন্য ভীত নহি; কিন্তু আমি মনে করি যে, ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরব, মোসোপটেমিয়া ও তুরস্কের অস্ত্রধারী মুসলমানগণ যোগ দিলে ইহাদের শক্তি অপ্রতিহত হইবে।[৮] নেহেরু

www.bjilibrary.com

রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া ১৯২৮সালে আগা খান উত্তর পশ্চিম ভারতে ও পূর্ব ভারতে মুসলমানদের জন্য কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র (Free states) স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে গঠিত হইবে।[৯]

১৯৩০ সালে স্যার মুহম্মদ ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান লইয়া একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।[১০] এই সময় বিলাতে প্রবাসী পাঞ্জাবী ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী উত্তর ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনে পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। (১৯৩০)। তিনি এই রাষ্ট্রের নাম দেন পাকিস্তান : ইহা পাঞ্জাব, আফগানিয়া (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধু প্রদেশ (কচ ও কাথিয়াবারসহ), তুখারিস্তান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান নিয়া গঠিত হইবে। ইহার প্রত্যেকের নামের প্রথম অক্ষর লইয়া তিনি পাকিস্তান নাম রচনা করেন।[১১] তিনি আরও দুইটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন, বাংলাদেশে বঙ্গ-ই-ইসলাম ও নিযাম শাসিত হায়দরাবাদে উসমানিস্তান।[১২] হায়দরাবাদের ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ ও সিন্ধু প্রদেশের স্যার আবদুল্লাহ হারুনও উত্তর ভারতে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।[১৩] পাঞ্জাবের স্যার সিকান্দর হায়াত খান ভারতকে ৭টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া ইহাদের সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।[১৪] আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সৈয়দ জাফরুল ইসলাম ও আফজাল হোসেন কাদরী উত্তর ভারত বাংলাদেশ ও হিন্দুস্তান এই তিনটি রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন।[১৫] সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৩৮ সালে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করে যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি জাতি এবং ইহার শাসনতন্ত্র এইরূপভাবে রচিত হইতে হইবে যাহাতে মুসলমানগণ পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতে পারে।[১৬]

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মুসলমান চিন্তানায়কেরা হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন সমাধানের জন্য তিন প্রকার সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছেন। (১) উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম আধ্যুষিত অঞ্চল নিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইবে। অধিকাংশ চিন্তানায়কেরা এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শাসনতান্ত্রিক সমাধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বাংলাদেশকে উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। (২) দ্বিতীয় প্রকারের শাসনতান্ত্রিক সমাধানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি ও বাংলাদেশে আর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। (৩) তৃতীয় প্রকারের পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে ভারত কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত হইবে এবং এই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি নিয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভাগ ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনাসমূহ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমান চিন্তানায়কেরা রচনা করিয়াছেন। বাংলাদেশের কোন নেতা এইরূপ পরিকল্পনা করেন নাই অথবা ১৯৪০ সালের পূর্বে ভারত বিভাগের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বাংলাদেশে মুসলমানেরা

www.bjilibrary.com

সংখ্যাগুরু ছিল। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ায় বাংলাদেশে কার্যত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলাদেশের নেতাগণ সব সময় প্রদেশের জন্য বেশি পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছেন। যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা থাকে এবং বাকী সকল বিষয়ের উপর প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তাহারা মনে করিতেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান হইলে বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

১৯৩৯ সালে মুসলমান নেতাদের মধ্যে ভারত বিভাগ এবং হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের চিন্তাধারা প্রবল হইয়া উঠে। লীগ সভাপতি জিন্নাহ ও ইহা হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার বিবৃতিও লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির প্রস্তাব হইতে ইহা বুঝা যায়। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মসে অনুষ্ঠিত সভায় লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি সিদ্ধান্ত করে যে, যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ভারতের অধিবাসীদের জন্য উপযোগী হইতে পারে না, কারণ ইহারা বহু জাতিতে বিভক্ত এবং ইহাদের মধ্যে এক এক জাতীয়তার অস্তিত্ব নাই।[১৭] ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের এক সাংবাদিকের নিকট জিন্নাহ প্রকাশ করেন যে, মুসলমানেরা স্বাধীন হইতে চায় এবং তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তাহাদের সামর্থ অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করে। তিনি বলেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্ব আছে।[১৮] ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে লণ্ডনের টাইম ও টাইড নামক সাপ্তাহিককীতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জিন্নাহ লিখিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা দুইটি জাতি এবং নিজেদের মাতৃভূমির শাসন ব্যাপারে 'উভয়েরই' অবশ্য অংশ থাকিতে হইবে।[১৯]

১৯৩৭ সালের ১৫ই অক্টোবর লক্ষ্মৌ অধিবেশনে মুসলিম লীগ দাবী করে যে, স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে প্রদেশগুলিকে বেশি স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কিন্তু ১৯৩৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে লীগ নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রয়োজনবোধে মুসলিম লীগ সভাপতি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবেন।[২০] এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে লীগ সভাপতি ও কার্যনির্বাহক কমিটি ১৯৩৯ সালের ২৬শে মার্চ মীরাটে অনুষ্ঠিত এক সভায় শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা পর্যালোচনার জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করে। নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়া এই সাব কমিটি গঠিত হয় : (১) এম, এ, জিন্নাহ (সভাপতি), (২) স্যার সিকান্দার হায়াত খান, (৩) নবাব মুহম্মদ ইসমাইল খান, (৪) সৈয়দ আবদুল আজিজ, (৫) স্যার আবদুল্লাহ হারুন, (৬) স্যার খাজা নাযিমুদ্দীন, (৭) আবদুল মতিন চৌধুরী, (৮) সরদার আওরঙ্গজেব খান, (৯) লিয়াকত আলী খান (আহ্বায়ক)।[২১] পরে আবদুল আজিজের স্থলে চৌধুরী

www.bjilibrary.com

খালিকুজ্জামানকে সাব কমিটির সভ্য মনোনয়ন করা হয়।[২২] ১৯৪০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম লীগ পরিষদের দিল্লী অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, লীগের সপ্তবিংশতি অধিবেশন ২২শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত হইবে।[২৩]

লাহোর প্রস্তাব : বাংলার নেতাদের ভূমিকা

লাহোরের ঐতিহাসিক মুসলিম লীগ অধিবেশন ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণের জন্য এই অধিবেশন আহুত হয়। এই অধিবেশনের সময় শহীদগঞ্জ মসজিদের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া আল্লামা মাশরেকীর খাকসার দল সিকান্দার হায়াত খানের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লাহোরে ভীষণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফজলুল হক যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রায় চারশত প্রতিনিধির একটি দল লইয়া লাহোর রেলস্টেশন পৌছেন তখন খাকসার বাহিনী 'ফজলুল হক ফিরে যাও' প্রভৃতি ধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে বিরূপ অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ফজলুল হক স্বীয় বুদ্ধি বলে ও সহানুভূতি দ্বারা খাকসারদের হৃদয় জয় করেন। তখন তাহারা তাঁহাকে মিয়া আবদুল আজিজের বাড়ীতে লইয়া যায়।[২৪]

অধিবেশনে যোগ দিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে জনতা ফজলুল হককে 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ' ধ্বনি করিয়া স্বাগত জানায়। যখন তিনি মঞ্চস্থলে পৌছেন তখন সভার সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া ও 'শেরেবাংলা জিন্দাবাদ' ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সময় জিন্নাহ সভাপতির অভিভাষণ দিতেছিলেন। শেরেবাংলা জিন্দাবাদ ধ্বনির দরুন জিন্নাহকে অভিভাষণ বন্ধ করিতে হয় এবং তিনি এই বলিয়া বসিয়া পড়েন যে, "যখন সিংহ উপস্থিত হয় তখন মেষ-শাবককে পথ হইতে সরিয়া পড়িতে হয়।" জনতা শেরেবাংলার বক্তৃতা শুনিতে চায়। নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখিবার অনুরোধ করিয়া ফজলুল হক তাহাদেরকে শান্ত করেন। ইহার পর জিন্নাহ অসমাপ্ত অভিভাষণ সমাপ্ত করেন।[২৫]

এই দিন (২২শে মার্চ) মামদোত ভিলায় লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠক বসে। ফজলুল হক, নাযিমুদ্দিন, আবদুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ ১৫ জন সদস্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিষয় কমিটিতে (Subject Committee) উত্থাপনের জন্য এই বৈঠকে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। ২২ তারিখ রাত্রে বিষয় কমিটির সভা হয়। এইসভায় লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির খসড়া প্রস্তাব লইয়া আলোচনা হয়।[২৬] প্রস্তাবটি সম্পর্কে সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলিম প্রতিনিধিদের সহিত সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলিম প্রতিনিধিদের মূলগত মতানৈক্য দেখা দেয়। সংখ্যালঘু প্রদেশের প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতি ছিলেন এবং এই শাসনতন্ত্রে তাঁহারা মুসলমানদের জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান করার পক্ষপাতি ছিলেন।[২৭] মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে সংখালঘু প্রদেশের মুসলমানদের কোন উপকার হইত না এবং তাহাদের

www.bjilibrary.com

সমস্যার সমাধান হইত না, কারণ সেইরূপ তাহারা নিজেদের প্রদেশে সংখ্যালঘুই থাকিয়া যাইত এবং তাহাদের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রাধান্য বজায় থাকিত।[২৮]

বাংলাদেশ ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশের সমস্যা ভিন্নরূপ ছিল। বাংলাদেশের শতকরা ৫৫জন মুসলমান ছিল। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে বাঙ্গালী মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইবার পর হইতে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষা করা বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য তেমন কিছু সমস্যা ছিল না, কারণ বাংলাদেশে তখন তাহাদের শাসন ও প্রাধান্য চলিতেছিল। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, মুসলমানদের আর্থিক জীবনের উন্নতির ব্যবস্থা করাই হইল বাংলাদেশের মুসলমানদের বড় সমস্যা এবং জমিদারী প্রথা ও ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি রহিত করিতে পারিলে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হইবে। যদি বাংলাদেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ইহার শাসন ব্যাপারে বাহিরের কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থাকিবে না এবং বাংলাদেশ সরকার মুসলমানদের আর্থিক জীবনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে।[২৯]

বিষয় কমিটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মুখপত্র রূপে এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরদার অভিমত প্রকাশ করেন। আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় স্বভাবতই পরিশেষে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হইয়া পড়ে। বাংলাদেশ ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশের জন্য তিনি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দাবী করেন এবং বলেন যে, ইহারা নিজেদের প্রদেশের উপযোগী সার্বভৌম রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে এবং এক প্রদেশ অন্য কোন প্রতিবেশী প্রদেশ অথবা অন্য কোন প্রদেশের সহিত কোনরূপ কমনওয়েলথে যোগ দিবে কিনা তাহা এই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকিব। সোহরাওয়ার্দী সকলকে সতর্ক দিয়া বলেন যে, যদি বাংলাদেশের মুসলমানগণ মুসলিম লীগের মাধ্যমে তাহাদের অভীপ্সিত স্বাধীন রাষ্ট্র আদায় করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিবে।[৩০]

২৩শে মার্চ (১৯৪০) মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় তিনি মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, "যাহারা বিষয় কমিটিতে প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া একটি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, আমরা ১৯৩৭ সালে মুসলমান ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা প্রায় দুই শতাব্দী পরে আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের লোকদের জন্য

www.bjilibrary.com

কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমরা কোন মতেই আমাদের এই ক্ষমতা ও সুযোগ কোন কাল্পনিক ও অজানা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না.। আমরা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটুকু প্রবর্তিত হইতে বাধা দিয়াছি এবং এইভাবে আমরা সাফল্যের সহিত আমাদের উপর হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দূর করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতেও যদি আমাদের উপর হিন্দু প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা হয় তাহাও আমরা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিব।" ইহার পরে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ফজলুল হক বলেন, "আমি কয়েক মাস পূর্বে পাটনায় যাহা বলিয়াছিলাম মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে আমার বন্ধুদেরকে আমি পুনর্বার বলিতেছি।[৩১] আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে এবং কংগ্রেস সরকারগুলিকে জানাইবার জন্য আমি আমার আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। যদিও বাংলাদেশে আমি যুক্ত মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করিতেছি তবু আমি প্রথমে মুসলমান এবং পরে বাঙ্গালী। ১৯০৬ সালে বাংলাদেশেই প্রথম মুসলিম লীগের নিশান উত্তোলিত হইয়াছিল; এখন বাংলাদেশের নেতা হিসাবে সেই মুসলিম লীগের মঞ্চ হইতে আমি মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অধিকার পাইয়াছি।"[৩২]

ফজলুল হক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং আরও কয়েকজন প্রতিনিধি ইহা সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি প্রকাশ্য অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহা লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত এবং পরে ইহা পাকিস্তান প্রস্তাব বলিয়া পরিচিত হয়। এই প্রস্তাবের দ্বারা মুসলিম লীগ ভারতের শাসনতন্ত্রিক সমস্যা সমধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে এবং দ্বি-জাতির ভিত্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য দাবী জানায়। লাহোর প্রস্তাবে বলাহয় :-

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিম্নে বর্ণিত মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত না হইলে তাহা দেশে কার্যকরী হইবে না। যেমন ভৌগোলিক সংলগ্ন প্রদেশগুলির (Units) সীমা নির্ধারণ করিয়া ইহাদেরকে নিয়া একাধিক অঞ্চল (Regions) গঠন করিতে হইবে যাহাতে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে অবস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করিয়া একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (Independent States) গঠন করা যায় এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রদেশগুলি (Units) স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী (autonomous and sovereign) হয়।

এই অঞ্চলগুলির সংখ্যালঘু অধিবাসীদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য ইহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্যকরী ও বিধিবদ্ধ বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান করা হইবে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেখানেও মুসলমানদের ও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য ইহাদের সহিত

www.bjilibrary.com

পরামর্শ করিয়া শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্যকরী ও বিধিবদ্ধ বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান করিতে হইবে।

"এই মূলনীতিগুলি অনুযায়ী একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এই অধিবেশন কার্যনির্বাহক কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছে : অঞ্চলগুলি যাহাতে পরিশেষে নিজেদের এলাকায় প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় যোগাযোগ শুল্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত হয।, (শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায়) সেরূপ ব্যবস্থা থাকিবে।"[৩৩]

প্রস্তাব সমর্থনকালে চৌধুরী খালিকুজ্জামান সংখালঘু প্রদেশের মুসলমানদের অশ্বাস দিয়া বলেন, "ভারত বিভক্ত হইয়া হিন্দু ভারত ও মুসলমান ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের কি হইবে তাহা ভাবিয়া তাহাদের ভয় পাওয়া উচিত হইবে না। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের যাহা হইবে তাহাদেরও তাহাই হইবে।"[৩৪]

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর এইরূপ সমালোচনা হয় যে, ইহার ফলে হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে। এই প্রচারকার্য্যের জবাবে জিন্নাহ এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে জানাইয়া দিতে চাই যে, এই অপপ্রচারের মূলে কোন সত্য নাই। ভারত বিভাগের সময় লোক বিনিময়ের বিষয় যতদূর সম্ভব বিচেচনা করা হইবে। দ্বিতীয়ত এই অপ-প্রচারের দরুন সংখ্যালঘু আরও খারাপ হইবে এবং তাহারা বিপদে পড়িবে। আমি বলিতে চাই যে, সংখ্যালঘু মুসলমানগণ কোন স্থানে বা কোন অবস্থায় অখণ্ড ভারতে বা কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পরিবে না। যাহাই ঘটে না কেন, তাহারা সকল অবস্থায় সংখ্যালঘুই থাকিয়ে যাইবে। কিন্তু তাহারা ন্যায়ত যে কোন সভ্য দেশে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিজেদের জন্য যতটা বেশি সম্ভব রক্ষাবকচের দাবী করিতে পারে। কিন্তু ভারত বিভাগের বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইয়া তাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না এবং পারিবেন না। অন্যদিকে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া তাহারা ছয় কোটি মুসলমানদের আবাসভূমিকে এক শাসনের অধীনে রাখিয়া দিতে পারে এবং সেখানে তাহারা চিরকালের জন্যসংখ্যালঘু ব্যতীত আর বেশি কিছু থাকিবে না।" জিন্নাহ আরও বলেন যে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া হিন্দু ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লাহোর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে এবং ভারতের নয় কোটি সংখ্যালঘু মুসলমানের মধ্যে ছয় কোটি মুসলমানকে তাহাদের এলাকায় স্বাধীন আবাসভূমির অধিকারী হইতে সাহায্য করিয়াছে।[৩৫]

কেহ কেহ মনে করেন যে, সিকান্দর হায়াত খান লাহোর প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। লাহোর প্রস্তাবের কয়েক বৎসর পর সিকান্দর হায়াত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাবের খসড়া আমূল সংশোধন করা হইয়াছিল এবং তিনি যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছিল।[৩৬] আবদুল্লাহ হারুন দাবী করিয়াছেন যে তিনি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারীতে জিন্নাহকে একটি

www.bjilibrary.com

প্রস্তাবের খসড়া দিয়াছিলেন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া লাহোর প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল।[৩৭] আলীগড়ের জনৈক ছাত্রের নিকট ১৯৪৫ সালের ১৪ই অক্টোবর লিখিত এক পত্রে ফজলুল হক দাবী করিয়াছিলেন যে, তিনি লাহোর প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,. "পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যে প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং যে প্রস্তাব মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং যে প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান দাবী গড়িয়া উঠিয়াছে সে প্রস্তাবের প্রতি আমার আস্থা আছে।"[৩৮]

লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী করিয়াছিল। এই প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছিল। সোহরাওয়াদী ও ফজলুল হক লাহোর অধিবেশনে তাঁহাদের বক্তৃতায় বাঙ্গালী মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবীর প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। প্রস্তাবের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান ও ছাত্র সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়ে। স্বাধীন আবাসভূমি স্থাপনের প্রত্যাশায় তাহাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা অত্যধিক বাড়িয়া যায় এবং ছাত্রেরা ইহার আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিতে জীবনপণ করে।

কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যদি আমরা শ্রীজিন্নাহর অভিমত গ্রহণ করি, তাহা হইলে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমানেরা দুইটি স্বতন্ত্র ও পৃথক জাতি হইয়া পড়ে।" ভারত বিভাগ করাকে পাপ বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। জওহরলাল নেহেরু বলেন যে, লাহোর প্রস্তাব করিয়া মুসলিম লীগ ভারতে ইয়ুরোপের বলকান অঞ্চলের মত বহু রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী করিয়াছে। কলিকাতার হিন্দু পত্রিকাগুলি লাহোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে এবং ইহাকে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে আখ্যায়িত করে। হিন্দুগণ মনে করে যে বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু নেতৃবৃন্দ পূর্বে বাঙ্গালী জাতীয়তার প্রবক্তা ছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমান নেতাদের সহিত বাংলাদেশে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে যখন ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন বর্ণ হিন্দুগণ বাংলাদেশের তাহাদের প্রাধান্য হারাইয়া ফেলে। তাহারা ভয় করে যে, যদি লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয় তাহা হইলে এই রাষ্ট্রে মুসলমানদের শাসন স্থায়ী হইবে এবং তাহাদের জমিদারী, মহাজনী ইত্যাদি রহিত হইবে। এই জন্য বাংলাদেশের হিন্দু নেতাগণ সর্বভারতীয় শাসনতন্ত্রে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের পক্ষপাতি হইয়া পড়েন।

লাহোর প্রস্তাবের অর্থ

www.bjilibrary.com

লাহোর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি ছিল? ইহা কি উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পূর্ব ভারতে একটি অথবা দুইটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিল? ভাষাগত বিশ্লেষণ হইতে বুঝা যায় যে, লাহোর প্রস্তাবে দুইটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইয়াছে। একটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ও আর একটি পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে। প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে ইউনিট (Unit) এবং ভৌগোলিক সংলগ্ন ইউনিটগুলির জোটকে অঞ্চল (Region, Zone) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে উত্তর ভারতে একটি অঞ্চল ও পূর্ব ভারতে আর একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের নকশা অঙ্কিত হইয়াছে। প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে, ইউনিটগুলি (প্রদেশগুলি) স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে এবং ভৌগোলিক সংলগ্ন ইউনিটগুলিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করিয়া একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (Independent States) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান এই চারটি ভৌগোলিক সংলগ্ন ইউনিট (প্রদেশ) নিয়া একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও আসাম লইয়া আর একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে।

যখন লাহোর প্রস্তাব প্রকাশিত হয় তখন সকলেই ইহা দুটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী বলিয়া মনে করিয়াছিল। মাহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন যে, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের মুসলমানগণ স্বতন্ত্র ও পৃথক জাতি। নেহেরুও ভাবিয়াছিলেন যে, লাহোর প্রস্তাবে ভারতকে বহু রাষ্ট্রে বিভাগ করিবার দাবী করা হইয়াছে।[৪০]

লাহোর প্রস্তাবের মর্মার্থ ইহার রচয়িতা ও উদ্যোক্তাদের বক্তব্য হইতে পাওয়া যায়। প্রস্তাব উত্থাপন কালে ফজলুল হক বলিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা বাঙ্গালী মুসলমানদের হাতে আসিয়াছে এবং এই শাসন ক্ষমতা তাহারা কোন মতেই কোন কাল্পনিক ও অজানা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না। বিষয় কমিটিতে প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশ ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দাবী করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশ ইহার উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে, ইহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং প্রতিবেশী প্রদেশ অথবা অন্য কোন প্রদেশের সহিত কমনওয়েলথে যোগ দিবে কিনা তাহা ইহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকিবে। তিনি আরও বলেন যে, মুসলিম লীগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানেরা তাহাদের প্রদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাহারা এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, লাহোর প্রস্তাবের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং এই প্রদেশগুলি ইচ্ছা করিলে মিলিত হইয়া কমনওয়েলথ বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। চৌধুরী খালিকুজ্জামানের উক্তি হইতে এইমতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগের প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পাঞ্জাব সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান এবং অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রগুলি লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।[৪২]

www.bjilibrary.com

লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া জিন্নাহ সময় সময় যে বিবৃতি ও বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পূর্ব ভারতের মুসলমানদের জন্য একাধিক রাষ্ট্র (Independent States) স্থাপন করা ইহার লক্ষ্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ২৬শে মে বোম্বাই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁহার বাণী[৪৩] ১৯৪১ সালের ১০ই মার্চ আলীগড়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ[৪৪] ১৫ই এপ্রিল মাদ্রাজে মুসলিম লীগ অধিবেশন তাঁহার অভিভাষণ।[৪৫] ১৯৪২ সালের অক্টোবরে ঈদ উপলক্ষে তাঁহার বাণী[৪৬] ও ৯ই নভেম্বর লীগ পরিষদের সভায় তাঁহার বক্তৃতা এবং ১৯৪৩ সালের ২৪ শে এপ্রিল দিল্লীতে লীগ অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণ[৪৭] হইতে প্রকাশ পায় যে তিনি মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (States) লীগের উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালেল ২রা ডিসেম্বর চীনের 'কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থার (Central News Agency) প্রতিনিধি পল পেঙ্গকে সাক্ষাৎদানকালে জিন্নাহ বলিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের ছয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশে, "আমরা আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ (Independent sovereign Muslim States) প্রতিষ্ঠার দাবী করি"।[৪৮]

প্রথম দিকে লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান নামে অভিহিত করা হয় নাই। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে মুসলিম লীগ অধিবেশনে জিন্নাহ প্রথম বার ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান নাম লাহোর প্রস্তাবের অর্থে ব্যবহৃত হইবে।[৪৯] মুসলিম লীগের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাকিস্তান নাম প্রচলিত হয় নাই। যাহা হউক এই সময় হইতে পাকিস্তান নামটি জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হয়। কিন্তু তখন পাকিস্তান বলিতে এক রাষ্ট্র বুঝায় নাই। ইহা লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র বুঝাইত।

১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাব বলিতে একাধিক রাষ্ট্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি পাকিস্তান নাম এক রাষ্ট্রের অর্থে ব্যবহার করেন। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় তাহাতে জিন্নাহ প্রথম প্রকাশ করেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি লইয়া একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবে। দুই অঞ্চলের প্রদেশগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবে কিনা গান্ধী সে বিষয়ে জানিতে চান। ইহার উত্তরে জিন্নাহ জানান যে, প্রদেশগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবে না, এইগুলি পাকিস্তানের ইউনিট হইবে। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ ও আসামের প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক রদবদল করিয়া ইহাদের সমবায়ে পাকিস্তান গঠিত হইবে।"[৫০] তিনি ১৯৪৫ সালের ৮ই নভেম্বর এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধিকে বলেন যে, পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র হইবে এবং ইহার প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইবে। আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হইবে এবং মুদ্রা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইবে।[৫১]

লাহোর প্রস্তাব এক রাষ্ট্রের অর্থে ব্যবহার করিয়া জিন্নাহ ইহাতে মূলগত পরিবর্তন প্রচলন করেন। এই পরিবর্তনের পিছনে কোন নিয়মতান্ত্রিক সমর্থন ছিল না।

www.bjilibrary.com

অষ্টাদশ অধ্যায়
মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম

লাহোর প্রস্তাব ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী [illegible] গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানদের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সিদ্ধান্তের পূর্বে মুসলমান নেতাগণ ভারতের অখন্ডতার পক্ষপাতি ছিলেন; তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহারা কয়েকটি রক্ষাকবচ দাবী করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা এবং সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি তাঁহাদের দাবী ছিল। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাগণ মুসলমানদের এইসব দাবী মানিয়া লইতে পারেন নাই। অনন্যোপায় হইয়া মুসলমান নেতারা অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা হইতে সরিয়া পড়েন এবং হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগ দাবী করেন। লাহোর প্রস্তাবে তাঁহারা ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লাহোর প্রস্তাব পরে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত হয়। এই দাবী আদায়ের পথে মুসলিম লীগকে প্রবল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাগণ ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেন। বৃটিশ সরকারও ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখিতে চাহিয়াছিল। এই জন্য মুসলিম লীগকে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সরকার খুবই বিব্রত হইয়া পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে নানারূপ সামরিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। এই সময় কংগ্রেস দাবী করে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিষয় বৃটিশ সরকারের খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করা উচিত।[১] মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি ১৯৩৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় দাবী করে যে, মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহা বৃটিশ সরকারের নিকট এই প্রতিশ্রুতি দাবী করে যাহাতে লীগের অনুমোদন ব্যতীত ভারতের জন্য কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ঘোষণা করা না হয়।[২] ১৮ অক্টোবর বড়লাট ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ শেষ হইলে বৃটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়, দল স্বার্থের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের সহযোগিতায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য তিনি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদেরকে লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি (Consultative Committee) গঠন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৩] এই বিষয়ে বড়লাট লীগের সভাপতি জিন্নাহ্ এবং কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনে হিন্দু মুসলমান সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর জোর দেন। জিন্নাহ ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়া আলাপ

www.bjilibrary.com

আলোচনা করেন কিন্তু তাঁহারা কোনরূপ মীমাংসায় পৌছিতে ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের দাবী ছিল ভরতীয় সংবিধান সভার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান। মুসলিম লীগ ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই।[৪]

১৯৪০ সালের ২৭শে জুন জিন্নাহ বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বড়লাটের নিকট কয়েকটি শর্ত উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, এই শর্তগুলি গ্রহণ করা হইলে মুসলিম লীগ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহযোগিতা করিবে। সরকার লাহোর প্রস্তাবের পরিপন্থী কোন ঘোষণা করিবে না এবং লীগের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে না। বড়লাটের শাসন পরিষদ, যুদ্ধ পরিষদ ও গভর্ণরের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ সকলেই মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত হইবেন।[৫]

ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা লাভের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯৪০ সালেল ৮ই আগষ্ট একটি প্রস্তাব করেন। ইহা 'আগষ্ট প্রস্তাব' নামে খ্যাত। বড়লাটের কর্মপরিষদের সম্প্রসারণ, যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, যুদ্ধশেষে সংবিধান সভা গঠন এবং ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংখ্যালঘুদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাহাদের মতামতকে মর্যাদা দেওয়া হইবে। ১৪ই আগস্ট ভারত সচিব এল, এস, আমেরী বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, "শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পদ্ধতি ও শাসনতন্ত্র রচনা উভয় ব্যাপারেই ভৌগোলিক ইউনিটগুলির ও প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পূর্ব চুক্তি ব্যতীত অন্তর্বর্তী বা স্থায়ী কোন প্রকার শাসনতন্ত্রই পার্লামেন্টে বিবেচত হইবে না।"[৬] লীগ মহলে আগস্ট প্রস্তাবের পক্ষে অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু বড়লাটের পরিষদগুলি গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি জিন্নাহকে যে ব্যাখ্যা দেন তাহা লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি অসন্তোষজনক বলিয়া মনে করে।[৭] কংগ্রেস আগস্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং ১৭ই অক্টোবর হইতে সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience) শুরু করেন। বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মী অন্তরীণাবদ্ধ হন। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে তেজ বাহাদুর সাপরুর উদ্যোগে বোম্বাইয়ে এক অদলীয় বৈঠক বসে। এই বৈঠকে একটি শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়। ইহা 'সাপরু প্রস্তাব' নামে পরিচিত। কংগ্রেস, লীগ ও বৃটিশ সরকার কাহারও নিকট ইহা প্রহণযোগ্য হয় নাই।[৮]

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ (National Defence Council) গঠিত হয়। পরিষদগুলিতে কয়েকজন মুসলমানকে নেওয়া হয়। ইহাদের মনোনয়ন ব্যাপারে মুসলিম লীগের মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। এই জন্য লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি এই মুসলমান সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ক্রীপস প্রস্তাব : পূর্ব রণাঙ্গনে যখন ইংরাজদের বিপর্যয় ঘটে এবং জাপানীগণ বক্ষদেশের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে তখন বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের সহযোগিতার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনসটন চার্চিল তাঁহার সময়

www.bjilibrary.com

মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপসকে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাসহ ভারতে পাঠান। ক্রীপস ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ নয়াদিল্লী পৌছেন এবং কংগ্রেস লীগ ও অন্যান্য দলের নেতাদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। ৩০শে মার্চ তিনি তাঁহার শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ক্রীপস প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধশেষে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে এবং শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা গঠিত হইবে। কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিতে পারিবে, এরূপ প্রদেশগুলি ইচ্ছানুযায়ী স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। প্রস্তাবে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা বলা হয়। শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত এই সরকার শাসন দায়িত্ব বহন করিবে।[৯]

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান প্রদেশের ইচ্ছাধীন করায় কংগ্রেস ক্রীপস প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, কারণ ইহাতে ভারত হইতে প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। মুসলিম লীগও ক্রীপস পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই, কারণ ইহা লাহোর প্রস্তাব পুরাপুরি স্বীকার করে নাই। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্পর্কে প্রদেশগুলির মতামত কি পদ্ধতিতে লওয়া হইবে পরিকল্পনায় তাহা বলা হয় নাই। স্ট্রাফোর্ড ক্রীপসের কর্মসচিব ২রা এপ্রিল লীগ সভাপতির নিকট যে পত্র লিখেন তাহাতে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়। প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবে কি দেবে না তাহা প্রাদেশিক আইনসভায় আনিত প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করিয়া মীমাংসা করা হইবে। যদি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পক্ষে শতকরা ৬০টি ভোট না হয় তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিষয়টি গণভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তির অধিকার দাবী করিতে পারিবে। এই পদ্ধতি মুসলিম লীগের মনঃপূত হয় নাই। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না এবং সিন্ধু প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইনসভায় সভ্য সংখ্যা (যথাক্রমে ৬০ ও ৫০) এত কম ছিল এবং অমুসলমানদের এত কম আসন দেওয়া হইয়াছিল যে, সহজেই তাহাদেরকে প্রভাবান্বিত করা চলিত। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত তাহাতে এই সব প্রদেশের মুসলমানদের সঠিক মত ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।[১০]

ক্রীপস প্রস্তাবে কংগ্রেসের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় ইহা ৮ই আগস্ট (১৯৪২) হইতে সারা দেশে 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন আরম্ভ করে। বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। সরকার কঠোর নীতি অনুসরণ করিয়া কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীকে অন্তরীণাবদ্ধ করে। প্রায় তিন বৎসর তাহাদেরকে জেলে থাকিতে হয়। কংগ্রেস নেতাদের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে এই দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির সুযোগে মুসলিম লীগ শক্তি বৃদ্ধি করিতে সুবিধা পায় এবং ইহা ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বস্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয়।[১১]

কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সি, রাজা গোপালাচারিয়া মুসলিম লীগের উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে ভারতের স্বাধীনতা বিলম্বিত হইবে। তিনি ভারত বিভাগ অনিবার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আমরা বৃটিশ শাসন

www.bjilibrary.com

বিলোপ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বস্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহার সহিত হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। পাকিস্তান তাহাদের প্রধান দাবী।" মাদ্রাজ কংগ্রেসের অনেক নেতা তাঁহার মত সমর্থন করিতেন। ১৯৪২ সালে তিনি পাকিস্তান দাবী সমর্থন করিয়া কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটিতে একটি প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ ভোট এবং বিপক্ষে ১২০ ভোট হয়। সুতরাং ইহা অগ্রাহ্য হয়।[১২] ইহার পর ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে হিন্দু মহাসভার সাধারণ কর্মসচিব রাজা মহেশ্বর দয়াল শেট সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন এবং রাজা গোপালাচারিয়াকে ইহার একটি নকল দেন। এই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া রাজা গোপালাচারিয়া গান্ধীর সহিত জেলে আলাপ আলোচনা করেন এবং নিজের পরিকল্পনা রচনা করেন। ইহা 'সি, আর, ফর্মূলা' নামে পরিচিত। ১৯৪৩ সালের ৮ই এপ্রিল তিনি এই পরিকল্পনা জিন্নাহকে দেন।[১৩] এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, কংগ্রেস ও লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা করিবে এবং যুদ্ধশেষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে; এই এলাকাগুলি কমিশনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং ইহারা ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে।

১৯৪৪ সালের ১০ই জুলাই লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় জিন্নাহ সি, আর, ফর্মূলা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, ইহাতে বিকৃত ও কীটদষ্ট পাকিস্তানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যাহা হউক গান্ধী নীতিগতভাবে পাকিস্তান দাবী স্বীকার করিয়াছেন। গান্ধীর সহিত আলাপ আলোচনার জন্য লীগ কমিটি জিন্নাহকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে।[১৫] সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে দুই নেতার মধ্যে দুই সপ্তাহ ব্যাপী আলাপ আলোচনা হয়, কিন্তু তাঁহারা কোন মীমাংসায় আসিতে অসমর্থ হন।[১৬] ইহার পর তেজবাহাদুর সাপরু আর একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। জিন্নাহ সাপরু প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে মুসলিম লীগ অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না।[১৭] ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস নেতা ভূলাভাই দেশাই ও লীগ সদস্য লিয়াকত আলী খান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেন। স্থির হয় যে, অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লীগ সমান সমান আসন পাইবে। কংগ্রেস এই চুক্তি অস্বীকার করে। জিন্নাহও জানান যে, তিনি ইহার কিছুই অবগত নহেন।[১৮]

অন্তর্বর্তী সরকার : সিমলা বৈঠক : ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বড়লাট লর্ডওয়াভেল একটি অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা রচনা করেন। বৃটিশ সরকার ইহা অনুমোদন করে। ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন এই পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। ইহা আলোচনার জন্য সিমলায় এক বৈঠকের ব্যবস্থা হয়।[১৯] সিমলা বৈঠক ২৫শে জুন অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যোগদানের জন্য কংগ্রেস নেতাদেরকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। ওয়াভেল প্রস্তাব করেন যে, বড়লাটের কর্মপরিষদ অন্তর্বর্তী সরকারে পরিণত হইবে এবং বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত ইহার অন্যান্য সদস্যদেরকে

www.bjilibrary.com

ভারতীয়দের মধ্য হইতে লওয়া হইবে; হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা সমান সমান হইবে। জাপানী যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার শাসন দায়িত্ব বহন করিবে।[২০] অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কংগেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। জিন্নাহ দাবী করেন যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বস্থানীয় ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ৫জন সদস্যের সকলকেই মুসলিম লীগ মনোনয়ন করিবে। কংগ্রেস নেতাগণ লীগের এই দাবী মানিয়া নিতে পারেন নাই। তাঁহারা দাবী করে যে, কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার আছে। মতানৈক্যের দরুন সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হয়।[২১]

বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। ১৯৪৫ সালের ২১শে আগস্ট বড়লাট ঘোষণা করেন যে, আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সময় বিলাতে লর্ড এটলীর শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। ওয়াভেল এটলীর শ্রমিক সরকারের সহিত ভারতের সমস্যা নিয়া আলোচনার জন্য ২৪শে আগষ্ট লন্ডনে যান। ইহার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ১৯শে সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁহার পূর্ব ঘোষণা পুনরাবৃত্তি করেন। এবং জানান যে, নির্বাচনের পর যত শীঘ্র সম্ভব একটি সংবিধান সভা গঠিত হইবে। তিনি আরও জানান যে, প্রধান দলগুলির সহায়তায় তিনি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যবস্থা করিবেন।[২২]

১৯৪৫—৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন

কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি বৃটিশ সরকারের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপেও অখণ্ড ভারতের আদর্শে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিতে প্রস্তুত হয়। মোমিন, আহরার, জমিয়াতুল, উলামায়ে হিন্দ, মুসলিম মজলিস, লালকোর্তা প্রভৃতি দলগুলিও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী করিত। ইহারা অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিল।[২৩] মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বস্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইহা প্রমাণ করিবার জন্য লীগ নেতাগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার আয়োজন করেন। মুসলিম লীগ ও মুসলমানদের ইতিহাসে এই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা, শক্তি ও সংহতি এবং স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবীর প্রতি মুসলমানদের দৃঢ় সমর্থন প্রমাণিত হইয়াছিল। সর্বভারতের মধ্যে বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সবচাইতে বেশি। বাংলাদেশের মুসলমানগণ নির্বাচনে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি মুসলিম লীগের শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, বাংলাদেশ লীগের শক্তির প্রধান উৎস এবং ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দুর্গ।

মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জিন্নাহ সকল মুসলমানকে মুসলিম লীগে যোগদান করিতে আহ্বান

www.bjilibrary.com

করেন। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে : (১) পাকিস্তান এবং (২) মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহা প্রতিপন্ন করা।"[২৪] এ, পি, আই, সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে জিন্নাহ বলেন যে, লীগ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের রায় প্রত্যাশা করে।[২৫] আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে জিন্নাহ বলেন যে, মুসলিম লীগ কেবল পাকিস্তান দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।[২৬]

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে জিন্নাহকে সভাপতি করিয়া তিন সদস্য বিশিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থা গঠিত হয়। ইহা প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থার সহিত পরামর্শ করিয়া কেন্দ্রীয় আইন সভার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করিবে।[২৭] প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থা ৭জন সদস্য নিয়া গঠিত হইবে। কিন্তু যে প্রদেশের আইনসভা দুই কক্ষ বিশিষ্ট সে প্রদেশের নির্বাচনী সংস্থায় ৯জন সদস্য থাকিবে। প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থা প্রাদেশিক আইনসভার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করিবে।[২৮] বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থায় ৯জন সদস্য থাকিবে। মাওলানা আকরম খাঁ লীগের সভাপতি ও খাজা নাযিমুদ্দিন আইনসভায় লীগ দলের নেতা ছিলেন। তাঁহারা পদাধিকার বলে নির্বাচনী সংস্থার সদস্য হন। এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী আইন সভায় লীগ দলের উপনেতা (Deputy Leader) ছিলেন। তাঁহার সদস্য ভুক্তির ব্যাপারে নাযিমুদ্দিনের সমর্থন ছিলনা; নাযিমুদ্দীন, নুরুল আমীন ও ফজলুর রহমানকে সমর্থন করে এবং ইহার ফলে তাঁহারা সদস্য মনোনীত হন। প্রাদেশিক আইনসভায় লীগ দল হইতে সোহরাওয়ার্দীকে মনোনীত না করায় ইহা দুইটি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একটি উপদল নাযিমুদ্দীনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং অন্যটি সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক লীগের সাধারণ কর্মসচিব আবুল হাশিমের সহযোগিতা লাভ করেন। ইহার ফলে প্রাদেশিক লীগ পরিষদের বৈঠকে যে নির্বাচন হয় তাহাতে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষের ৫জন প্রার্থীর সকলেই নির্বাচিত হয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থায় তাঁহার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী এক পত্রে জিন্নাহকে এই নির্বাচনের ফলাফল জানান এবং মন্তব্য করেন যে, সোহরাওয়ার্দী দলের অন্তত দুইজন সদস্য বিপজ্জনক এবং নাযিমুদ্দিনের দলের দুইজন অকর্মণ্য।[২৯]

প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থায় সোহরাওয়ার্দী দলের ৫জন ও নাযিমুদ্দীনের দলের ৪জন সদস্য ছিল। সংখ্যাধিক্যের বলে সোহরাওয়ার্দী ইহার কর্মসচিব নিযুক্ত হন। নির্বাচনে হারিয়া নাযিমুদ্দীন হতাশ হইয়া পড়েন এবং তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা খাজা সাহাবুদ্দীন সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।[৩০] নাযিমুদ্দীনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী নাযিমুদ্দীনের দলের ৩৫জনকে আইনসভার নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনীত করেন।ইহার পর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থার সাহায্যে নাযিমুদ্দীন তাঁহার দলের আরও ১৮জনের জন্য মনোনয়ন লাভ করেন। এইভাবে বঙ্গীয় আইন সভায় ১১৯ মুসলমান আসনের মধ্যে তিনি ৫২টি আসনের জন্য তাঁহার দলের

www.bjilibrary.com

প্রার্থী মনোনীত করিতে সমর্থ হন।[৩১]

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিবাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০টি মুসলমান আসনের সব কয়টি মুসলিম লীগ দখল করে। ৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৭টি লাভ করে। অন্যান্যদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৫টি আকালী শিখগণ ২টি এবং ইউরোপীয়ানরা ৮টি আসন দখল করে।[৩২] জিন্নাহ বোম্বাই হইতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় নির্বাচনে বিরাট সাফল্য উপলক্ষে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের জানুয়ারীতে 'বিজয় দিবস' উদযাপন করে। বাংলাদেশের সর্বত্র মহাসমারোহের সহিত বিজয় দিবস পালিত হয়।[৩৪]

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক আইনসভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরম খান অসুস্থতার জন্য বায়ু পরিবর্তন করিতে মধুপুরে যান এবং নাযিমুদ্দীন রাজনৈতিক কাজে লন্ডনে যান।[৩৫] সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনী প্রচারকার্যের জন্য সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই কার্যে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড কর্মী ও ছাত্রদের নিয়োগ করা হয়। মাওলানা রুহুল আমীন, ফুরফুরার পীর সাহেব এবং আরও অনেক আলেম মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারকার্য করেন।[৩৬]

নির্বাচনের পূর্বে এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী জিন্নাহকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করেন। জিন্নাহকে এক পত্রে তিনি লিখেন, "বহুদিন হইল আপনি বাংলাদেশে আসেন নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে শুভ যাত্রার জন্য আপনার উপস্থিতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"[৩৭] ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে জিন্নাহ কলিকাতায় আসেন এবং ইস্পাহানীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। ১লা মার্চ তিনি লীগ কর্মীদের সহিত আলাপ করেন। এই সময় তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পুঁজিপতিদের প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই। তিনি মন্তব্য করেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এই বৃদ্ধ বয়সে আরামে থাকিবার জন্য আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি কেন রক্ত পানি করিব, ছুটাছুটি করিব এবং এত কষ্ট স্বীকার করিব। আমি এতসব করিতেছি পুঁজিপতিদের জন্য নয়, আপনাদের জন্য গরীব লোকদের জন্য।"[৩৮]

কলিকাতা হইতে রেল সেলুনে জিন্নাহ আসামে যান। সোহরাওয়ার্দী ও ইস্পাহানী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময় প্রত্যেক স্টেশনে জনসাধারণ তাঁহাকে যে বিপুল সম্বর্ধনা দিয়াছিল। ইস্পাহানী তার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে গাড়ী থামাইতে হয়। জিন্নাহকে দেখিবার জন্য প্রত্যেক স্টেশনে পুরুষ, নারী ও ছেলেমেয়েদের বিরাট সমাবেশ হয়। অনেকে বহু দূরবর্তী গ্রাম হইতে তাহাদের নেতাকে সম্মান দেখাইবার জন্য আসে। প্রত্যেক স্টেশনে জিন্নাহকে সেলুনের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে হয়। তিনি তাহাদেরকে উৎসাহ দেন এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দেন।"[৩৯] ইস্পাহানী লিখিয়াছেন যে, জিন্নাহকে দেখিবার জন্য গ্রামের লোকেরা বহু

www.bjilibrary.com

জায়গায় জোর করিয়া রোলগাড়ী থামায়। কয়েকদিন এরূপ চলিতে থাকে। রাত্রিতেও এ অবস্থা হয়। জিন্নাহর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। এই অবস্থায় তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। একদিন মধ্য রাত্রের পর জনতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য দাবী জানায়, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। তখন দেখা দিবার মত তাঁহার শক্তি ছিল না।[৪০]

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরকে প্রধানত ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। লীগ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ফজলুল হক আবার লীগে ঢুকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। লীগের বাহিরে থাকিয়াও ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের প্রতি অনুগত ছিলেন।[৪১] লীগে ঢুকিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি কৃষক প্রজা পার্টির পুনর্গঠন করেন এবং ইহার কর্মসূচীর আদর্শ লইয়া নির্বাচনে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হন। নির্বাচনী প্রাচারকার্যে ফজলুল হক ও তাঁহার দলের প্রার্থীদেরকে ছাত্রদের তীব্র বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হয়। তখন ছাত্র সমাজ সম্পূর্ণরূপে লীগের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রজাদলের প্রার্থীগণ বহুস্থানে ছাত্রদের হাতে অপদস্ত হয়। ইহা সত্ত্বেও ফজলুল হক দক্ষিণ বরিশাল সদর ও বাগেরহাট এই দুইটি কেন্দ্র হইতে নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার বলে নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁহার দলের প্রায় সকলেই লীগ প্রার্থীদের নিকট পরাজিত হয়; কেবল সৈয়দ মুহম্মদ আফজাল, খোদাবক্স ও মাওলানা শামসুল হুদা নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে।[৪২]

বাংলাদেশের আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরাট সাফল্য হয়। ইহা ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টি আসন দখল করে। নির্বাচনের রায়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান অর্জনের জন্য সংহতি ও সংকল্পের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৩] মুসলিম লীগের আদর্শের প্রতি তাহাদের অটল বিশ্বাসের পরিচয় দিবার জন্য তাহারা বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হককে অস্বীকার করিতেও ইতস্তত করে নাই। সাধারণ নির্বাচনের পর এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক আইনসভায় লীগ দলের নেতা নির্বাচিত হন। আইনসভায় লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় গভর্ণর সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করেন। আইনসভার মোট ২৫০টি আসনের ১১৩টি আসন লীগের দখলে ছিল। সোহরাওয়ার্দী স্বতন্ত্র দলের সভ্যদের সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁহার মন্ত্রিসভা ছিল তখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির মধ্যে একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা।

পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৫টি আসন পায়; খিযর হায়াত খানের ইউনিয়নিস্ট দল ২০টি আসন দখল করে। খিযর হায়াত কংগ্রেস ও আকালী দলের সহায়তায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[৪৪] উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ ১৭টি আসন দখল করে। কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কংগ্রেসের সদস্যরা লালকোর্তা দলের নেতা ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ফলে সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[৪৫] সিন্ধু প্রদেশের আইনসভার মোট ৬০টি আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ ২৭টি, জি, এম,

www.bjilibrary.com

সৈয়দের দল ৪টি, স্বতন্ত্র মুসলিম ৪টি এবং কংগ্রেস ২১টি আসন পায়। কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় এই প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে সিন্ধু প্রদেশে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে মুসলিম লীগ ৩৫টি আসন দখল করিয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হয়। আসাম, বিহার, উরিষ্যা মুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং এই সব প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে।[৪৬] মুসলিম লীগ বিহারে ৪০টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৪টি যুক্ত প্রদেশের ৬৬টির মধ্যে ৫৫টি মধ্য প্রদেশের ১৪টির মধ্যে সবকয়টি মাদ্রাজে ২৯টির মধ্যে সবগুলি, বোম্বাইয়ে ৩০টির সবগুলি এবং আসামে ৩৪টির মধ্যে ৩১টি আসন লাভ করে।[৪৭] প্রাদেশিক নির্বাচনে লীগমোট ৪৯২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৮টি আসন দখল করে এবং কংগ্রেস মোট ৯৩০টি আসন পায়।[৪৮]

কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়। (১) মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, লীগের এই দাবী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। (২) মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন আছে, নির্বাচনের রায়ে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কংগ্রেস নেতাগণ কখনও লীগের দাবী মানিয়া নেন নাই এবং তাঁহারা দাবী করিয়াছেন যে, কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই নির্বাচনের পর কংগ্রেসের মুসলমানদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার দাবী দুর্বল হইয়া পড়ে।

আইন সভার মুসলমান সভ্যদের কনভেনশন

মুসলিম লীগের দাবী শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২রা জুলাই এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর নিকট এক পত্রে তাঁহাকে আইন সভাগুলির সদস্যদেরকে লইয়া একটি কনভেনশন আহ্বানের পরামর্শ দেন। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে যখন মন্ত্রিমিশন ভারতে আসে তখন জিন্নাহ এরূপ একটি কনভেনশন আহ্বানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তদনুযায়ী তিনি ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে এই কনভেনশন আহ্বান করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির প্রায় পাঁচ শত সদস্য এই বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তৃতায় জিন্নাহ পাকিস্তান দাবীর বিবরণ দেন এবং বলেন, আমরা সাহস ও বিশ্বাসের বলে সাফল্য অর্জন করিব বলিয়া আশা করি।" ৮ই এপ্রিল বৈঠকে একটি বিষয় কমিটি গঠিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের শতকরা ১০জন সদস্য লইয়া বিষয় কমিটি গঠন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম বাংলাদেশের পক্ষে বিষয় কমিটির সভ্য হন এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ইহাতে আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন।[৪৯]

৬ই এপ্রিল মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় নবাব ইসমাইল খানকে সভাপতি করিয়া এবং এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী, আব্দুল মতিন চৌধুরী আই, আই,

www.bjilibrary.com

চুণ্ডিগড় ও খালিকুজ্জামানকে সভ্যভুক্ত করিয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এই সাব কমিটিকে কনভেনশনে উত্থাপনের জন্য প্রস্তাব রচনার ভার দেওয়া হয়। খালিকুজ্জামান দাবী করেন যে, তিনি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং এই খসড়া সামান্য রদবদল করিয়া সাব কমিটি ও কার্যনির্বাহক কমিটিতে পাঁচ ঘন্টা আলোচনা হয়। খালিকুজ্জামান বলেন যে, বিষয় কমিটি খসড়া প্রস্তাবের কিছুটা সংশোধন করে।[৫০] ৯ই এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী এই প্রস্তাব কনভেনশন বৈঠকে উত্থাপন করেন। খালিকুজ্জামান ফিরুয খান নুন এবং আরও কয়েকজন ইহা সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, উত্তর পূর্ব ভারতের বাংলাদেশ ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু, প্রদেশ সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তান অঞ্চল নামে অভিহিত। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই এলাকাগুলি লইয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে এবং অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রতিশ্রুতি দাবী করা হইতেছে।

কনভেনশনের প্রস্তাবে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি লইয়া একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়। কনভেনশন সমাপ্ত হইবার সময় সোহরাওয়ার্দী বলেন "পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান এখন দেশের একমাত্র সমস্যা। ইহার সমাধান হইলে পর পাকিস্তান রাষ্ট্র ইহার অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলির মর্যাদা নির্দিষ্ট করিবে।" যতদূর সম্ভব ইউনিটগুলি কর্মক্ষম হইবে।"[৫১] প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কনভেনশনের সকল প্রতিষ্ঠানকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হয়। তাঁহারা অঙ্গীকার করেন যে, পাকিস্তান আদায়ের জন্য তাঁহারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। জিন্নাহ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা স্পষ্ট দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছি যে, আমরা যে কোন বিপদের মোকাবিলা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। আমাদের জন্য অন্য কোন দ্বিতীয় পথ নাই।[৫২]

লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়া একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (Independent States) প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইয়াছিল। কিন্তু কনভেনশনের প্রস্তাবে এই প্রদেশগুলি লইয়া একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের (a Sovereign independent State) দাবী করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের (States) স্থলে একটি রাষ্ট্রের (State) উল্লেখ করায়, বিষয় কমিটির কোন কোন সদস্য মনে করেন যে, ইহাতে মুসলিম লীগের কার্যসূচীতে মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিষয় কমিটির সভায় আবুল হাশিম প্রস্তাবটির সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ১৯৪০ সাল হইতে লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং মুসলিম লীগের প্রস্তাব সংশোধনের ক্ষমতা ও অধিকার এই কনভেনশনের নাই। তিনি আরও বলেন যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চল হইতে অপর একটি দেশের এক হাজার মাইল দু ভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকিবে এবং এই অবস্থায় এই দুইটি দূরবর্তী অঞ্চল কখনও এক রাষ্ট্রে রূপ পাইতে পারিবে না।[৫৩] বিষয় কমিটির সভাপতি রূপে জিন্নাহ মন্তব্য করেন যে, লাহোর প্রস্তাবে States শব্দটির সঙ্গে যে অক্ষরটি রহিয়াছে তাহা টাইপের ভুলে হইয়াছে। কিন্তু যখন লীগের ১৯৪০ সাল হইতে পরবর্তী

www.bjilibrary.com

বৎসরের প্রস্তাব ও কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে সর্বত্রই State শব্দটি রহিয়াছে এবং অক্ষরটি টাইপের ভুল নহে। এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী লিখিয়াছেন যে, ইহার পর জিন্নাহ বলেন, "শব্দের জন্য কিছু আসে যায় না, উদ্দেশ্যই হইল লক্ষণীয় বিষয়।" ইহার পর জিন্নাহ কাগজপত্রে States এর স্থলে State করিবার নির্দেশ দেন।[৫৪]

খালিকুজ্জামান কনভেনশনের খসড়া প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন States এর স্থলে State শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তাঁহার মনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। লাহোর প্রস্তাবটিকে হিন্দু সংবাদপত্রে পাকিস্তান প্রস্তাব নাম দিয়াছিল। পাকিস্তান নাম মুসলমানদের মধ্যে খুব পরিচিত হইয়া যায় এবং পাকিস্তান নামটির মধ্যে একটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, সম্ভবত এই রূপও হইতে পারে যে, আমার মনও জনসাধারণের মত পাকিস্তান নামটি একটি রাষ্ট্রের অর্থে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং এই রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র অথবা উপ যুক্তরাষ্ট্র হইতে পারে। এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সাব কমিটিতে কোন রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নাই।"[৫৫] এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবে অস্পষ্টতা ছিল, কনভেনশনের প্রস্তাবে তাহা দূর করিয়া প্রস্তাবটিকে সুস্পষ্ট করা হয়।[৫৬]

যদি মনে করা হয় যে, কনভেনশনের প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক পরিবর্তন করা হয় নাই, শুধু শব্দের পরিবর্তন করিয়া ইহার ভাষা স্পষ্ট করা হইয়াছে, তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কনভেনশনের কি মুসলিম লীগের প্রস্তাব পরিবর্তন করবার অধিকার বা ক্ষমতা ছিল? মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের মধ্যে কনভেনশনের কোন স্থান ছিল না। একমাত্র মুসলিম লীগ পরিষদেরই লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের অধিকার ও ক্ষমতা ছিল। ৯ই এপ্রিল কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয়। কিন্তু ইহার পরের দিন ১০ই এপ্রিল মুসলিম লীগ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। লীগ পরিষদের এই বৈঠকে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন করা চলিত। কিন্তু ইহার বৈঠকে লাহোর প্রস্তাব বা কনভেনশনের প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয় নাই। প্রস্তাবের সংশোধন সম্পর্কে মুসলিম লীগ পরিষদকে এড়াইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি খুবই দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

www.bjilibrary.com

উনবিংশ অধ্যায়
পাকিস্তানের জন্ম

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা : ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়। জাপানীগণ ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়িত হয়। ইংরাজ পক্ষের জয় হইলেও যুদ্ধে তাহাদের এরূপ ক্ষয়ক্ষতি হয় যে, তাহাতে বৃটিশ শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া ভারতে বৃটিশ সরকারকে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধের সময় বহু ভারতীয় সৈন্য সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আযাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছিল এবং জাপানীদের সহিত যোগ দিয়াছিল। এই সময় কংগ্রেসও সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিয়া সারা দেশে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল সামরিক ও প্রশাসনিক সমস্যার দরুন বৃটিশ সরকার বিব্রত হইয়া পড়ে। লর্ড এটলীর নূতন শ্রমিক সরকার বুঝিতে পারে যে, ইংরাজদের পক্ষে আর বেশি দিন সম্মানজনকভাবে ভারত শাসন সম্ভব হইবে না। এইজন্য লর্ড এটলীর মন্ত্রিসভা ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে উদগ্রীব হইয়া উঠেন।

লর্ড এটলীর শ্রমিক সরকারের নির্দেশে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভারতের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের দাবীর পরীক্ষা হয়। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের আদর্শে এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবীর ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মুসলিম লীগ প্রায় একচেটিয়া মুসলমান আসনগুলি দখল করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণ আসনগুলিতে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শ্রমিক সরকার কংগ্রেস ও লীগের পরস্পর বিরোধী দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রয়াস পায়। ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতে একটি মন্ত্রিমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারত সচিব লর্ড পেথিকলরেন্স বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপস ও নৌবহরের সচিব (First Lord of Admiralty) এ, ভি আলেকজাণ্ডার ইহার সদস্য থাকিবেন। এই মন্ত্রিমিশন ভারতীয় নেতাদের সহিত শাসনতান্ত্রিক বিষয় নিয়া আলোচনা করিবেন এবং (১) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পদ্ধতি (২) সংবিধান সভা গঠন ও (৩) বড়লাটের শাসন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।[২] ১৫ই মার্চ পার্লামেন্টের এক বিতর্ক সভায় এটলী বলেন, "সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি আমাদের লক্ষ্য আছে, ইহা দেখিতে হইবে যাহাতে সংখ্যালঘুগণ নিশঙ্ক হইয়া বাস করিতে পারে; পক্ষান্তরে সংখ্যাগুরুদের উন্নতির পথে যদি সংখ্যালঘুগণ বাধা হইয়া দাঁড়ায় তাহা আমরা হইতে দিতে পারি না।' এই বিবৃতিতে কংগেস নেতাগণ সন্তুষ্ট হন মুসলিম লীগ নেতাগণ অসন্তুষ্ট হন। জিন্নাহ পুনরাবৃত্তি করেন যে, ভারতীয় মুসলমানেরা সংখ্যালঘু নয়, তাহারা একটি জাতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ তাহাদের জন্মগত অধিকার।[৩]

www.bjilibrary.com

মন্ত্রিমিশন ২৩শে মার্চ করাচী হইয়া ২৪শে মার্চ দিল্লী পৌছেন। তাহারা রাজনৈতিক দলগুলির নেতা, প্রদেশগুলির প্রধান মন্ত্রী, সংখ্যালঘুদের নেতা ও দেশীয় রাজ্যগুলির রাজাদের সহিত আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। কংগ্রেসের সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ৩রা এপ্রিল মন্ত্রিমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, প্রতিরক্ষা বৈদেশিক বিষয় ও যানবাহন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে, বাকি সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর গান্ধী মন্ত্রিমিশনের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। তাঁহার মতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে হিন্দু মুসলমান সমস্যা সি, আর, ফর্মুলার ভিত্তিতে সমাধান করা যাইতে পারে। ৪ঠা এপ্রিল লীগ সভাপতি জিন্নাহ্ মন্ত্রিমিশনের সহিত বৈঠকে মিলিত হন। তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবী করেন এবং ইহার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ১৬ই এপ্রিল আবার মন্ত্রিমিশন জিন্নাহর সহিত আলোচনা করেন এবং তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র সার্বভৌম পকিস্তান ও আসার্বভৌম বৃহৎ পাকিস্তান দুইটির একটি পছন্দ করিতে বলেন। তাঁহারা জানান যে, যদি মুসলিম লীগ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবী করে, তাহা হইলে অমুসলমান এলাকাগুলির উপর ইহার দাবী গ্রহণ করা যাইতে পারে না। জিন্নাহ্ বলেন যে, যদি নীতিগতভাবে পাকিস্তান দাবী মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে এলাকা সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইতে পারিবে। মন্ত্রিমিশন জিন্নাহর প্রস্তাব কংগ্রেস সভাপতির নিকট উত্থাপন করেন। গান্ধী, নেহেরু প্রমুখ নেতাগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।[৪]

মন্ত্রিমিশন কয়েক দিনের জন্য কাশ্মীরে বিশ্রাম নেন। ইহার পর ২৬শে এপ্রিল ক্রীপস মাওলানা আযাদ ও জিন্নাহর সহিত পৃথক ভাবে মন্ত্রিমিশনের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে ৫ই মে কংগ্রেসও লীগের নেতাদেরকে মন্ত্রিমিশনের সহিত এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হয়। লীগের পক্ষ হইতে জিন্নাহ, লিয়াকত, মুহম্মদ ইসমাইল খান ও আব্দুর রব নিশতার এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মাওলানা আযাদ, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, নেহেরু ও আবদুল গাফফার খান সিমলা বৈঠকে যোগদান করেন। ১১ই মে পর্যন্ত বৈঠকের আলোচনা চলে। বৈঠকে একটি আপোষমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৫]

১৬ই মে (১৯৪৬) মন্ত্রিমিশন নিজেদের রচিত পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাঁহারা পাকিস্তান দাবী অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে, ইহা দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হইবে না এবং পাকিস্তানের দুইটি অংশ একে অন্যের নিকট হইতে সাত শত মাইল ব্যবধানে থাকিবে।[৬] মন্ত্রিমিশন তিনটি তবক বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। ইহার ভিত্তিমূলে ছিল প্রদেশ তদুপরি গ্রুপ নামে কথিত কয়েকটি প্রদেশের সমষ্টি এবং সর্বোপরি গ্রুপগুলির সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র। প্রদেশগুলিকে তিনটি গ্রুপ ভাগ করা হয় (ক) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ; (খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান; (গ) বাংলাদেশ ও আসাম।এই তিনটি গ্রুপ লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র

www.bjilibrary.com

(Union) গঠিত হইবে এবং দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও যানবাহন ইহার শাসনাধীন থাকিবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং ইহা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তিনটি তবকের ক্ষমতা নির্ধারিত করিবে। কোন সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে আইনসভার উভয় প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য সদস্যদের উপস্থিতি ও সমর্থন আবশ্যক হইবে।

দেশরক্ষা বৈদেশিক বিষয় ও যানবাহন ব্যতীত বাকি সব বিষয়ে ভার প্রদেশের হাতে থাকিবে। গ্রুপ সরকারের হাতে কি কি বিষয় থাকিবে তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে। প্রথম দশ বৎসর পর প্রাদেশিক আইনসভার সংখ্যাধিক্য সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্রের শর্তগুলির পুনর্বিবেচনা দাবী করিতে পারিবেন। এবং ইহার পরও প্রতি দশ বৎসর অন্তর এরূপ পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করিতে পারিবেন। লোকসংখ্যা অনুপাতে প্রত্যেক প্রদেশ ও প্রধান সম্প্রদায়গুলিকে গণপরিষদে আসন দেওয়া হইবে এবং প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য একটি আসনের ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আইনসভার সদস্যগণ পৃথকভাবে গণপরিষদে নিজেদের সদস্য নির্বাচন করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ (অমুসলমান), মুসলমান ও শিখদেরকে যে আসনগুলি দেওয়া হয় তার তালিকা সংযোগ করা হইল।[৭]

ক গ্রুপ : আসনের তালিকা :

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলমান	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১
যুক্ত প্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	১৭
উড়িষ্যা	৯	-	৯
মোট :	১৬৭	২০	১৮৭

গ গ্রুপ

বাংলাদেশ	২৭	৩৩	৬০
আসাম	৭	৩	১০
মোট :	৩৪	৩৬	৭০

গ্রুপ খ

	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-		৩		৩

www.bjilibrary.com

সিন্ধু প্রদেশ	১	৩	-	৪
মোট :	৯	২২	৪	৩৫

বৃটিশ ভারতে মোট আসন = ২৯২

দেশীয় রাজ্যগুলির মোট আসন = ৯৩

মোট আসন = ৩৮৫

গণপরিষদের প্রাথমিক অধিবেশনে কার্যপ্রণালী নির্ধারিত হইবে। ইহার পর প্রদেশের সদস্যরা গ্রুপ অনুসারে তিনটি শাখায় বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক শাখার সদস্যগণ নিজেদের গ্রুপ ও প্রদেশের বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। মন্ত্রিমিশন একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যও সুপারিশ করেন।[৮]

২৪শে মে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি গ্রুপ ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলে যে, প্রতিশ্রুত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের বিরোধী। কংগ্রেস কমিটি ব্যাখ্যা করে যে, কোন প্রদেশ কোন নির্দিষ্ট গ্রুপে যোগ দিবে কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকার প্রদেশকে প্রথমে দিতে হইবে। ২৫শে মে মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট এক বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে বলেন যে, গ্রুপ তাঁহাদের পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং কেবলমাত্র দলগুলির সম্মতির মাধ্যমেই এই ব্যবস্থা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।[৯] মুসলিম লীগ ৬ই জুন দিল্লী বৈঠকে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা আপোষমূলক মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করে এবং পরিষদ মনে করে যে, প্রস্তাবিত গ্রুপ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান গঠিত হইতে পারিবে। ইহা আশা করে যে, দশ বৎসর পর শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা করিবার অধিকারের বলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিবার সুযোগ পাইবে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়ে বড়লাটের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য জিন্নাহকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়।[১০]

১৬ই মে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে নিজেদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে, বড়লাটের শাসন পরিষদ ১৪জন সদস্য নিয়া গঠিত হইবে এবং ইহাদের ৬জন কংগ্রেস, ৫জন মুসলিম লীগ, ১জন ভারতীয় খ্রীস্টান, ১জন শিখ ও একজন পার্সি সম্প্রদায় হইতে লওয়া হইবে। ঘোষণায় বলা হয় যে, যদি দুইটি প্রধান দল অথবা ইহাদের মধ্যে একটি উপরোক্ত নীতি অনুসারে যুক্ত সরকার গঠনে যোগ দিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলেও বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কাজে অগ্রসর হইবেন। এবং যাহারা ১৬ই জুনের ঘোষণা গ্রহণ করিবে অন্তর্বর্তী সরকার যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় হইবে।[১১] কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, কিন্তু ইহা স্বাধীন অখণ্ড ও গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৫শে জুন লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বড়লাট তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। তিনি মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে দেন নাই। ওয়াভেলের পশ্চাদপসরণের সমালোচনা

www.bjilibrary.com

করিয়া স্টেটসম্যান পত্রিকা মন্তব্য করে, রাজনীতিকগণ এরূপ করিতে পারে কিন্তু এরূপভাবে কথার খেলাপ করা রাজনীতিবিদদের কাজ নয়।"[১২]

১০ই জুলাই কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এক সাংবাদিক বিবৃতিতে বলেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং কংগ্রেস মনে করে যে, ইহা গণপরিষদে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রয়োজন মত রদবদল ও সংশোধন করিতে পারিবে। গ্রুপ সম্পর্কে তিনি বলেন, "গ্রুপ ব্যবস্থা থাকিবে না।" নেহেরুর বিবৃতির ফলে লীগ মহলে কংগ্রেসের অভিসন্ধি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। নেহেরুর বিবৃতি সম্পর্কে মাওলানা আযাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা 'এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যাহা ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে।' ২৯শে জুলাই পেথিক লরেন্স ও ক্রীপস বৃটিশ পার্লমেন্টে বলেন যে, নেহেরুর বিবৃতিতে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এই সময় মুসলিম লীগকে এরুপ আশ্বাস দেন নাই যে, কংগ্রেসকে নিজের ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র রচনা করিতে দেওয়া হইবে না।[১৩]

লীগের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা

নেহেরুর বিবৃতির পর মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে নূতন জটিলতার সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ ইহা পুনর্বিবেচনা করিবার প্রয়োজন অনুভব করে। ২৭শে জুলাই বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত লীগ পরিষদের বৈঠকে জিন্নাহ এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনগড়া ব্যাখ্যার ও মন্ত্রিমিশনের নীরবতার তীব্র সমালোচনা করেন। লীগ পরিষদ গণপরিষদে যোগদান করা বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন এবং মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্ব সিদ্ধান্ত উঠাইয়া লয়। ইহা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বৃটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য মুসলমানদেরকে সরকারী উপাধি বর্জন করিতে এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হয়। প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার নীতি সক্রিয় করার জন্য লীগ কার্যনির্বাহক কমিটিকে একটি কর্মসূচী তৈয়ার করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস নির্ধারিত হয়। লীগ পরিষদ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি করিয়া জিন্নাহ বলেন, "আজ আমরা আমাদের ইতিহাসের এক অতি ঐতিহাসিক কার্যের সূচনা করিয়াছি। লীগের সারা ইতিহাসে আমরা এই পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায় ব্যতীত অন্যভাবে কিছু করি নাই।"[১৪]

৬ই আগস্ট লর্ড ওয়াভেল নেহেরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। নেহেরু এই ব্যাপারে বড়লাটের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার শর্তাধীনে ৫ জন মুসলিম সদস্যকে অন্তর্বর্তী সরকারে লইতে সম্মত হন। কিন্তু এই শর্ত লীগের কর্মকর্তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই।[১৫]

ইতিমধ্যে লীগের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতিতে বলা হয় যে, এই দিন ভারতের সর্বত্র সভা ও বক্তৃতার অনুষ্ঠান করিয়া মন্ত্রি মিশন পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করার কারণ সম্বন্ধে মুসলমান জনসাধাণকে অবহিত করা হইবে এবং সরকারের নীতি ও মনোভাবের প্রতি মুসলমানদের অসন্তোষ প্রকাশ করা হইবে।[১৬] মুসলিম লীগ

www.bjilibrary.com

কার্যনির্বাহক কমিটি ২রা আগষ্টের বৈঠকে এরূপ নির্দেশ দেন যাহাতে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয় এবং মুসলমানরা সর্বত্র হরতাল পালন করে।[১৭] প্রত্যক্ষ কর্ম পন্থার ব্যাখ্যা করিয়া জিন্নাহ বলেন যে, ইহাতে মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং মুসলমানদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস পালন করিতে উপদেশ দেওয়া হইবে।[১৮]

১৬ই আগস্ট মুসলমানগণ ভারতের সর্বত্র হরতাল ও সভার আয়োজন করিয়া প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস পালন করে। লীগ নেতারা মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করার কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকারের বিরূপ মনোভাবের নিন্দা করেন। তাঁহারা মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকিতে উপদেশ দেন। কলিকাতা ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসটি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়।

কলিকাতায় দাঙ্গা : প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসে কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। সোহরাওয়ার্দীর লীগ মন্ত্রিসভা ১৬ই আগস্ট দিনটি সরকারী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই দিন লীগ নেতাগণ কলিকাতা ময়দানে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব থেকেই কলিকাতার স্থানে স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। ইস্পাহানী লিখিয়াছেন যে, তিনি সভার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন এবং ১১ $\frac{১}{২}$ টার সময় খবর পান যে, সার্কুলার রোড ও কর্পোরেশন স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে হিন্দুগণ রাস্তার দুই দিকের বাড়ীগুলি হইতে মুসলমানদের মিছিলের উপর পাথর ও বোতল নিক্ষেপ করিতেছে। ইহার পর আরও কয়েকটি ঘটনার সংবাদ আসে এবং বিকাল ৩ $\frac{১}{২}$ টার সময় খবর পাওয়া যায় যে, ভবানীপুর এলাকার শিখ ও হিন্দুগণ সেখানের মুসলমান স্ত্রীলোকে ও ছেলেমেয়েদের উপর আক্রমণ করিয়াছে। আরও কয়েকটি অঞ্চল হইতে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের খবর আসে।[১৯] ইস্পাহানী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে কলিকাতায় দাঙ্গা বাধাইবার জন্য দায়ী করেন। যদি মুসলমানদের দাঙ্গা করিবার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তাহারা স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে বাসায় রাখিয়া নিরস্ত্রভাবে বক্তৃতা শুনিবার জন্য ময়দানের সভায় আসিত না এবং মুসলমানেরা মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ শহর কলিকাতায় দাঙ্গা না করিয়া দাঙ্গার জন্য কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থান বাছিয়া লইত। ইস্পাহানী বলেন যে, মুসলমানেরা যাহাতে পাকিস্তান দাবী ভুলিয়া যায় সেজন্য হিন্দু নেতারা তাহাদেরকে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসে ভীতি প্রদর্শনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।[২০]

কলিকাতার স্টেটসম্যান সম্পাদক আয়ান ষ্টিফেনস কলিকাতা দাঙ্গার জন্য সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কিছুটা দোষারূপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসে কিছুটা ভীতির উদ্রেক করিতে চাহিয়াছিলেন (They wanted a bit of beat-up) এবং হিন্দুগণ এরূপ জনরব শুনিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার

www.bjilibrary.com

জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি আবার ইহাও বলেন যে, কলিকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ২৫হইবে না এবং এই অবস্থায় ইহা কল্পনাতীত বলিয়া মনে হয় যে, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ কলিকাতায় এরূপ দাঙ্গা ঘটিতে দিতেন।[২১] ষ্টিফেনস বলেন যে, মুসলমানগণ আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা করিতেছে, এরূপজনরব শুনিয়া হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাট আকারে প্রতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। দাঙ্গার প্রথম তিন দিন মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয় এবং দ্বিতীয় দিন শিখেরা হিন্দুদের সহিত যোগ দেয়। দ্বিতীয় দিন দাড়িওয়ালা শিখদেরকে টেকসি, লরী ও বাসে করিয়া দলে দলে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চল হইতে উত্তরের ধুম্রাচ্ছাদিত বস্তি অঞ্চলের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।[২২] কলিকাতার ভয়ঙ্কর নরহত্যা ও ধ্বংসের বিবরণ দিয়া স্টিফেনস লিখিয়াছেন যে, শ্যাম পুকুর ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের মৃতদেহের স্তূপ নিকটস্থ বাড়ীগুলির দোতালার মেঝ বরাবর উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির হিসাবে দাঙ্গায় প্রায় ৫০০০০ লোক হতাহত হইয়াছিল। মেননের মতে ৫০০০ নিহত ও ১৫০০০ আহত হইয়াছিল। স্টেটসম্যানের হিসাব অনুযায়ী হতাহতদের সংখ্যা ২০০০০ বা কিছুটা বেশি ছিল।[২৩]

হিন্দু নেতাগণ দাঙ্গার জন্য সোহরাওয়ার্দী ও লীগ নেতাদেরকে দায়ী করেন। ইহার উত্তর সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইবার জন্য কংগ্রেস নেতাগণ দাঙ্গা বাধাইয়াছেন। স্টিফেনস কলিকাতা হত্যাকাণ্ডের গূঢ় কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি বলেন যে, কলিকাতার দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের লোকদের মনে যে রাজনৈতিক আশা ও ভয়ের উদ্রেক করা হইয়াছিল এবং দাঙ্গার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব হইতে যে গরম গরম সম্প্রদায়িক বক্তৃতা দেওয়া হইতেছিল তাহার মধ্যে কলিকাতা হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ নিহিত ছিল।[২৪]

কলিকাতা হত্যাকাণ্ডের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান তীব্র হইয়া পড়ে। ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইহাতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হইয়া পড়ে। ওয়াভেল কলিকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন। কলিকাতা হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য তিনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২৭শে আগস্ট গান্ধী ও নেহেরুর নিকট বাংলাদেশে ও কেন্দ্রে কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করেন। লীগের পক্ষে যাহাতে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিতে সুবিধা হয় সেজন্য তিনি গ্রুপ সম্পর্কে কংগ্রেসকে মন্ত্রিমিশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে বলেন। মেনন লিখিয়াছেন যে, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বড়লাট ভারতের অন্তর্যুদ্ধের আশঙ্কা করেন। কিন্তু গান্ধী ও নেহেরু বড় লাটের প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হন।[২৫] বৃটেনের শ্রমিক সরকারও কংগ্রেসের সহিত সমস্যা সৃষ্টি করিতে বড়লাটকে নিষেধ করে। বাধ্য হইয়া ওয়াভেল নেহেরুর অন্তর্বর্তী সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ষ্টিফেনস মন্তব্য করেন যে, যদি ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে সম্ভবত অন্তর্যুদ্ধ ভারত বিভাগ হইতে দেশকে রক্ষা করা যাইত।[২৬]

www.bjilibrary.com

অন্তর্যুদ্ধ : স্টিফেনস বলেন যে, কলিকাতা হত্যাকাণ্ড ও মুসলিম লীগ ব্যতীত কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, এই দুইটি ঘটনার ফলে ভারতে ষোল মাস ব্যাপী অন্তর্যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহাতে ৫০০০ লোক প্রাণ হারাইয়াছিল।[২৭] কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অখণ্ড ভারতের আদর্শের জয় সূচিত হয়। ইহাতে স্বভাবতই হিন্দুগণ খুশী হয় এবং মুসলমানেরা নিরাশ হয়। ২রা সেপ্টেম্বর মুসলমানগণ ভারতের সর্বত্র 'কৃষ্ণ দিবস' পালন করে। বাড়ীতে কাল পতাকা উত্তোলন করিয়া তাহারা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে।[২৮]

কলিকাতায় মুসলমানদের হত্যার খবর পূর্ববাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া প্রড়ে। অক্টোবর মাসে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলায় মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ভয়ে হিন্দুগণ বাড়ীঘর ত্যাগ করিতে থাকে। কলিকাতার হিন্দু সংবাদপত্রগুলির সংবাদদাতাগণ ঘটনাস্থলে না গিয়াই মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের হত্যার অতিরঞ্জিত ও অমূলক খবর দেয়। সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে, নোয়াখালীতে ২২০ জন এবং ত্রিপুরায় ৬৫ জন নিহত হয়। আয়ান স্টিফেনস মনে করেন যে, এই অঞ্চলের গোলযোগের মূলে আর্থিক কারণ ছিল; হিন্দুগণ সম্পদশালী ছিল এবং মুসলমানেরা সাধারণত কৃষক ছিল।[২৯]

বিহারে নোয়াখালী গোলযোগের প্রতিক্রিয়া হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বিহারে 'নোয়াখালী দিবস' পালিত হয়। ৩০শে অক্টোবর হইতে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত 'পূর্ব পরিকল্পনা' অনুযায়ী মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে ১৫০০০ লোক নিহত হয়। কংগ্রেসের মতে ২০০০ এবং জিন্নাহর মতে ৩০০০০ লোক বিহারের দাঙ্গায় প্রাণ হারায়।[৩০] এই সময় পূর্বাঞ্চলের জেনারেল কামাণ্ডিং অফিসার টুকার শান্তিরক্ষায় কাজে বেসরামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন। টুকার লিখিয়াছেন, "১৯৪৬ সালে যতগুলি ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্মান্তিক ঘটনা ছিল এই যে, হিন্দুদের বিরাট জনতা রীতিমত প্রস্তুত হইয়া হঠাৎ অল্পসংখ্যক মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে।.....এই কার্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। এই অল্প সময়ের হত্যাকাণ্ডে সাত হইতে আট হাজার লোক নিহত হয়। স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে বীভৎস ভাবে হত্যা করা হয়।"[৩১] স্টিফেনস মন্তব্য করেন যে, বিহারে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের পর ভারত বিভাগ অনিবার্য হইয়া পড়ে।[৩২]

বিহারের পর ভারতের আরও অনেক স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। যুক্ত প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে ২০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়।[৩৩] এই প্রদেশের জিলা অফিসার উডরাফ লিখিয়াছেন যে, গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করিতেছিল; হঠাৎ তাহাদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়, শিশুদেরকে মাতাদের চোখের সামনে মারা হয় এবং স্ত্রীলোক ও ছেলে মেয়েদেরকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়।[৩৪] ছুরিমারা ও অগ্নিসংযোগ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাড়ায়। ২৫ হইতে ৩০শে অক্টোবর ৬দিনে একমাত্র কলিকাতায় ১১৭ জন নিহত ও ৪৫৬ জন আহত হয়।[৩৫]

www.bjilibrary.com

লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান : অন্তর্যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে মুসলিম লীগের নেতাগণ বুঝিতে পারেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁহাদের প্রতিনিধি না থাকার দরুন মুসলমানদের স্বার্থহানি হইতেছে। বড়লাটও উপ লব্ধি করেন যে, দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের অন্তর্ভুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তিনি লীগের ৫ জন সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব করেন। লীগ সদস্যগণ অক্টোবরে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেন। কংগ্রেস দল প্রথমে লীগ সদস্যদেরকে কোন প্রধান বিষয়ের দায়িত্ব দিতে অসম্মত হয়, পরে অর্থনৈতিক দফতর ছাড়িয়া দেন। লিয়াকত আলী ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস সদস্যদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ইহার আর একটি উদ্দেশ্যে ছিল। লীগ সদস্য গজনফর আলী খান বলিয়াছেন, "পাকিস্তান আদায়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিতে সুবিধার জন্য আমরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিতেছি; অন্তর্বতী সরকার আমাদের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা অভিযানের একটি লক্ষ্যস্থল হইবে।" লীগ প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা প্রস্তাব উঠাইয়া লয় নাই ইহা গণপরিষদে যোগদান না করার নীতিও অনুসরণ করিয়া চলে।

লীগ দলের অসহযোগিতার দরুন অন্তর্বর্তী সরকারের সহ-সভাপতি নেহেরুর পক্ষে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব প্রথা প্রচলন অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং শাসন ব্যাপারে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। নেহেরু বড়লাটকে চাপ দেন এবং পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৃটিশ সরকার ডিসেম্বরে ওয়াভেল, নেহেরু, বলদেব সিংহ ও জিন্নাহকে লণ্ডনে এক বৈঠকে আহবান করে। আলাপ-আলোচনার পর বৃটিশ সরকার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করে যে, গ্রুপিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং যে গণপরিষদে ভারতের একটা বিরাট অংশের লোকের প্রতিনিধি থাকিবে না উহার রচিত শাসনতন্ত্রে চাপাইয়া দিবার কথা তাহারা চিন্তা করিতে পারেন না।[৩৬] ব্লেচার মন্তব্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকারের এই বিবৃতি 'পাকিস্তান রোয়েদাদের চেয়ে কম ছিল না।"[৩৭]

৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন এবং ২০ শে জানুয়ারী (১৯৪৭) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। মুসলিম লীগ ইহাতে যোগ দেয় নাই। লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি গণপরিষদে গৃহীত 'উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাবের' নিন্দা করে এবং ইহাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার প্রতিবাদে প্যাটেল ও নেহেরু দাবী করেন যে, লীগ কমিটির বিবৃতি উঠাইয়া লইতে হইবে, অন্যাথায় তাহাদেরকে অন্তর্বর্তী সরকার হইতে বাহির করিয়া দিতে হইতে।[৩৮]

নতুন পরিকল্পনা : কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের মধ্যে অসহযোগিতা, অন্তর্বর্তী সরকারে অচলাবস্থা এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শোচনীয় অন্তর্যুদ্ধের দরুন যে গুরুতর প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহাতে বিলাতের শ্রমিক সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। এটলী ২০শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন, "বৃটিশ সরকার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে ইচ্ছা করে যে, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইহা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করিতে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছে।" যদি এই সময়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরিষদ সর্বসম্মত কোন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে বৃটিশ সরকার বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট তারিখে কাহার হাতে হস্তান্তর করিবে, কোন প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অথবা আঞ্চলিকভাবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অথবা অন্য কেনো যুক্তিযুক্ত উপায়ে, তাহা বিবেচনা করিবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করিবেন।[৩৯] এরূপ মনে করা হয় যে, নেহেরু ওয়াভেলের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রমিক সরকার ওয়াভেলকে স্বদেশে ডাকিয়া পাঠায়।

১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, মন্ত্রিমিশনের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হইবে না এবং ভারত বিভাগ ছাড়া হিন্দু মুসলমান প্রশ্নের সমাধান করার আর কোন পথ নাই। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতানৈক্যের দরুন কংগ্রেস নেতাদের মনেও ভারত বিভাগের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। বড়লাটের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভি, পি মেনন লিখিয়াছেন যে, মাউন্টব্যাটেনের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ডিসেম্বরের শেষের দিকে অথবা জানুয়ারীর প্রথমে, তিনি বল্লবভাই প্যাটেলকে ভারত বিভাগ প্রশ্নে সম্মত করাইতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। মেনন ভারত বিভাগের একটি খসড়া পরিকল্পনা ভারত সচিবকে পাঠাইয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের নিকট এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।[৪০]

মাওলানা আযাদ লিখিয়াছেন যে, মাউন্টব্যাটেন আসার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিতে পান যে, প্যাটেল ও নেহেরু ভারত বিভাগ পরিকল্পনার প্রতি কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। গান্ধীও ২রা এপ্রিল দ্বিতীয় বার মাউন্টব্যাটেনের সহিত সাক্ষাতের পর এই পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে মত দেন প্যাটেল ও নেহেরু গান্ধীকে সম্মত করাইয়াছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। প্যাটেল অভ্যন্তরীণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন। কিন্তু তিনি অর্থ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য লিয়াকত আলীর সহযোগিতা ব্যতীত এমনকি একজন চাপরাসীও নিয়োগ করিতে পারিতেন না। তিনি উপলব্ধি করেন যে, লীগের সহিত একত্রে কাজ করা অসম্ভব এবং ইহাদেরকে বাহির করিয়া দিবার জন্য যদি ভারতের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতে হয় তাহাও তিনি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন।[৪১] আযাদ বলেন যে, মাউন্টব্যাটেন লেডী মাউন্টব্যাটেন ও ভি, পি, মেননের প্রভাবে পড়িয়া নেহেরু ভারত বিভাগে সম্মত হন।[৪২] মাউন্টব্যাটেন নেহেরু ও প্যাটেলকে এই কথা বুঝাইতে সমর্থ হন যে, লীগের সহিত একত্রে কাজ করিতে যাইয়া ভারতের ঐক্য ও শক্তি বিপন্ন করার চেয়ে মুসলমানদেরকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে।[৪৩] কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি ৮ই মার্চ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব

www.bjilibrary.com

করিয়াছিল। মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসে এই প্রস্তাব কংগ্রেসকে ভারত বিভাগে সম্মত করাইতে ব্যবহার করিয়াছিলেন।[৪৪] এলান কেম্পবেল জনসন লিখিয়াছেন যে, কংগ্রেসের পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাব হইতে প্রথম আভাস পাওয়া যায় যে, কংগ্রেসের নেতাগণ ভারত বিভাগ পরিল্পনা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।[৪৫] এই প্রস্তাব সম্পর্কে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা মন্তব্য করে যে, কংগ্রেসের পাঞ্জাব বিভাগ দাবী পাকিস্তান দাবীর পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে।[৪৬]

মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগ প্রস্তাবের সহিত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগেরও প্রস্তাব করেন। ভারত বিভাগ দাবী রোধ করার জন্য জানুয়ারী মাস হইতে এই দুইটি প্রদেশ বিভাগের দাবী করা হইতেছিল।[৪৭] পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের দাবীকে বড়লাট ও কংগ্রেস নেতাগণ লীগের পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। লামবী লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, "যদি জিন্নাহ দেখিতে পান যে, তিনি কেবল পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং বাংলাদেশের কতকাংশ পাইবেন, তাহা হইলে তিনি পাকিস্তান দাবী ছাড়িয়া দিবেন এবং মুসলিম লীগকে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিবেন; কারণ লীগ সমর্থকদের মহলে এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মধ্যে এরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, খণ্ডিত পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে এত দুর্বল হইবে যে, ইহার পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইবে।[৪৮] কিন্তু জিন্নাহ কিছুতেই পাকিস্তান দাবী হইতে সরিয়া পড়েন নাই। ২৩শে এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন ও জিন্নাহর মধ্যে তিন ঘন্টা ব্যাপী আলাপ-আলোচনা হয়। কেম্পবেল জনসন লিখিয়াছেন যে, এই সময় জিন্নাহর কথাবার্তায় মনে হয় যেন তিনি পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগ মানিয়া লইয়াছেন।[৪৯] কিন্তু ৩০শে এপ্রিল জিন্নাহ এক বিবৃতিতে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের আন্দোলনের নিন্দা করেন।[৫০]

মাউন্টব্যাটেনের সহিত আলাপ-আলোচনার পর নেহেরু, প্যাটেল ও গান্ধী ভারত বিভাগ মানিয়া নিতে প্রস্তুত হন। ২৮শে এপ্রিল গণপরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, "এমনও হইতে পারে যে, সবগুলি প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নাও হইতে পারে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাই ঘটে, তাহা হইলে আমাদেরকে এক অংশের শাসনতন্ত্র নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।"[৫১] নেহেরু এই সময় এক বিবৃতিতে বলেন, "যদি মুসলিম লীগ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহারা পাকিস্তান পাইতে পারে; কিন্তু তাহাদেরকে এই শর্ত মানিতে হইবে যে, ভারতের যে সকল অংশ পাকিস্তানে যোগ দিতে ইচ্ছুক হইবে না সেগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।"[৫২]

মাউন্টব্যাটেন তাঁহার উপদেষ্টাদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনার প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয় এবং বলা হয় যে, ইচ্ছা করিলে ইহারা উপ-যুক্তরাষ্ট্র (Confedaration) গঠন করিবে। পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগেরও প্রস্তাব করা হয়।[৫৩] এই পরিকল্পনা ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল গভর্ণরদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়। ২রা মে লর্ড ইসমে

www.bjilibrary.com

এই পরিকল্পনা নিয়া লণ্ডনে যান। শ্রমিক সরকার কিছুটা সংশোধন করিয়া ইহা অনুমোদন করেন। ১০ই মে বড়লাট ইহা ফিরিয়া পান। এই সময় মাউন্টব্যাটেন ও নেহেরু সিমলায় ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাটি নেহেরুকে দেখিতে দেন। নেহেরু ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, কারণ তিনি মনে করেন যে, ইহার ফলে বলকান অঞ্চলের মত ভারতে বহু রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। নেহেরুর আপত্তির জন্য এই পরিকল্পনাটি বাতিল হইয়া যায় এবং নূতনভাবে পরিকল্পনা রচিত হয়।[৫৪] মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার তাঁহার শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভি, পি মেননের উপর ন্যস্ত করেন। মেনন। তাঁহার পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ইহা ১১ই মে নেহেরুকে দেখিতে দেওয়া হয়। নেহেরু ইহা অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনা নিয়া মাউন্টব্যাটেন নিজে ১৮ই মে লণ্ডনে যান। এটলী সরকার ইহা অনুমোদন করেন। ৩১শে মে বড়লাট ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৫৫]

৩রা জুন (১৯৪৭) পরিকল্পনা

২রা জুন মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু প্যাটেল, জে, বি, কৃপালনী, জিন্নাহ লিয়াকত, আবদুর রব নিশতার ও বলদেও সিংহ এই সাত জন নেতাকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁহার শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়া তাহাদের সহিত আলোচনা করেন। এই পরিকল্পনায় ভারত বিভাগ এবং বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করা হয়। মাউন্টব্যাটেন সকলের সম্মতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ৩রা জুন পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় এবং নেহেরু জিন্নাহ ও বলদেও সিংহ বেতার ভাষণে আপোষমূলকভাবে ইহা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। ৪ঠা জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন জানান যে, ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে।[৫৬] মুসলিম লীগ পরিষদ ১০ই জুন পরিকল্পনাটি আপোষমূলকভাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি ১৪ই জুন অনিচ্ছার সহিত পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে এবং আশা করে যে, ভারত বিভাগ স্বল্পস্থায়ী হইবে এবং আবার ভারতের ঐক্য ফিরিয়া আসিবে।[৫৭]

পরিকল্পনায় ভারত বিভাগ, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি ও প্রণালী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব আইন সভা প্রত্যেকটি দুই অংশে বিভক্ত হইবে, এক অংশে মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের সদস্যবৃন্দ ও অন্য অংশে অন্যান্য জিলাগুলির সদস্য গণ। প্রত্যেক অংশের সদস্যগণ পৃথক বৈঠকে তাহাদের প্রদেশ বিভাগ করা হইবে কি হইবে না, সে বিষয়ে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। যদি কোন অংশের অধিকাংশ সদস্য বিভাগের পক্ষে ভোট দেয়, তাহা হইলে প্রদেশ বিভক্ত হইবে। ইহার পর কোন গণপরিষদে তাহারা যোগ দিবে, বর্তমান গণপরিষদে অথবা নূতন গণপরিষদে, তাহা প্রত্যেক অংশের সদস্যদের ভোটের দ্বারা সাব্যস্ত করা হইবে। বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি নিধারিত করিবার জন্য বড়লাট একটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করিবেন। অনুরূপভাবে পাঞ্জাবের জন্যও একটি সীমানা কমিশন

www.bjilibrary.com

নিয়োগ করা হইবে।[৫৮]

সিন্ধু প্রদেশের আইনসভার সদস্যগণ দুইটি গণপরিষদের কোনটিতে যোগ দিবে, তাহা তাহাদের ভোটের মাধ্যমে মীমাংসা করিবে। বেলুচিস্তানের শাহী জির্গা ও কোয়েটা পৌরসভার সদস্যগণ অনুরূপভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সদস্যগণ দুইটি গণপরিষদের কোনটিতে যোগ দিবে তাহা গণভোটের মাধ্যমে নির্ণয় করা হইবে। আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রীহট্ট জিলা পূর্ববাংলার সহিত যুক্ত হইবে কিনা তাহা গণভোটের দ্বারা স্থির করা হইবে। যদি বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে দুইটি গণপরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। গণপরিষদের আসন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
শ্রীহট্ট জিলা	১	২	-	৩
পশ্চিম বাংলা	১৫	৪	-	১৯
পূর্ববাংলা	১২	২৯	-	৪১
পশ্চিম পাঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব পাঞ্জাব	৬	৪	২	১২

আইনসভার সংখ্যাধিক্য ভোটে সিন্ধু প্রদেশ এবং শাহী জির্গা ও কোয়েটা পৌরসভার বেসরকারী সভ্যদের ভোটে বেলুচিস্তান পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা গণ ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগ দিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। জুলাই মাসের প্রথম দিকে শ্রীহট্ট জিলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার অধিবাসীগণ পূর্ববাংলায় যোগদানের পক্ষে রায় দেয়। ২০শে জুলাই বাংলাদেশ আইনসভা সংখ্যাধিক্য ভোটে নূতন পরিষদে যোগ দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে; পক্ষে ১২৬ ও বিপক্ষে ৯০ ভোট পড়ে। ইহার পর পশ্চিম বাংলা আইন সভার সদস্যগণ পৃথক বৈঠকে অধিকাংশ ভোটে (পক্ষে ৫৮, বিপক্ষে ২১) বাংলাদেশ বিভাগের দাবী করে এবং বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পূর্ববাংলা অঞ্চলের সদস্যগণ সংখ্যধিক্য ভোটে (১০৬ ও ৩৫) বাংলাদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং নূতন গণপরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহারা শ্রীহট্ট জিলাকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্তি করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। পাঞ্জাব আইনসভায়ও অনুরূপভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা হয় এবং ইহার ফলে পাঞ্জাব বর্তমান গণপরিষদে ও পশ্চিম পাঞ্জাব নূতন গণপরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে।

৪ঠা জুলাই (১৯৪৭) ভারত স্বাধীনতা আইনের খসড়া বৃটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয়। এই বিলে বৃটিশ ভারতে ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। সিন্ধু প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলা লইয়া পাকিস্তান এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ লইয়া ভারত রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হয়। বিলটি পার্লামেন্টে গৃহীত হয় এবং ১৮ই জুলাই আইনে পরিণত হয়।

নেহেরু মাউন্টব্যাটেনকে ভারত রাষ্ট্রের বড়লাটের পদে নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

www.bjilibrary.com

মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহর নিকট হইতেও অনুরূপ প্রস্তাব আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ বড়লাটের পদের জন্য জিন্নাহর নাম প্রস্তাব করে। ইহাতে মাউন্টব্যাটেন কিছুটা অসন্তুষ্ট হন।[৫৯] লর্ড ইসমে মন্তব্য করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ সম্পর্কে জিন্নাহর সিদ্ধান্ত ঠিক হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন।, "আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম যে, সুশৃঙ্খলার সহিত ক্ষমতা হস্তান্তর, সম্পত্তির ন্যায্য বন্টন ও দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শুরুতে উভয় রাষ্ট্রের একজন গভর্ণর জেনারেল হইলে খুবই ভাল হয়"।[৬০] কোন কোন মহলে এরূপ ধারণা যে, মাউন্টব্যাটেন উভয় রাষ্ট্রের বড়লাট থাকিলে ভারত সম্পত্তির ন্যায্য অংশ হইতে পাকিস্তানকে বঞ্চিত করিতে পারিত না, র‍্যাডক্লিফ সীমানা কমিশন সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে অন্যায় করিতে পারিত না এবং কাশ্মীরের ভারতে যোগদান সহজ হইত না।[৬১] যখন মাউন্টব্যাটেন কেবল ভারত রাষ্ট্রের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন তখন স্বভাবতই তিনি তাঁহার রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইয়াছেন।[৬২]

৭ই জুলাই জিন্নাহ দিল্লী হইতে করাচী আসেন। করাচী পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজধানী করা হয়। ১১ই আগষ্ট করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং জিন্নাহ গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৩ই আগষ্ট মাউন্টব্যাটেন করাচী আসেন এবং ১৪ই আগষ্ট তিনি গণপরিষদ সভায় অভিভাষণ দেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলের শপথ করেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরের কারণ

১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার স্বেচ্ছায় ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের শাসনের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া সসম্মানে ভারত হইতে সরিয়া পড়া তাহাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। তাহারা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সাম্রাজ্যের সমস্যা বিচার করে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তব দৃষ্টির ফলে, দুই শত বৎসর ভারতীয়দেরকে শাসন ও দমন করার পরেও ইংরাজরা আবার ইহাদের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা ইংরাজ জাতির রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। কয়েকটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় বৃটিশ রাজনীতিবিদগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রথমত বৃটেন একটি ছোট দ্বীপ ও ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ৫ কোটি। ভারতের আয়তন ছিল ১১৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৪১কোটির বেশি। ক্ষুদ্র বৃটেনের পক্ষে ৫০০০ মাইল দূরবর্তী বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের উপর শাসন বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়ত, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের জয় হইয়াছিল, তবু ইহা দীর্ঘকালের যুদ্ধে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্টিফেনস লিখিয়াছেন, "দুইটি

www.bjilibrary.com

যুদ্ধে ইহার সম্পদ নষ্ট হইয়াছিল এবং নৌশক্তিতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব হইয়াছিল। বিমান শক্তির আবির্ভাবে বৃটেন আর দুর্ভেদ্য ছিল না।[৬৪] তৃতীয়ত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বস্ততার উপর আর নির্ভর করিতে পারিতেছিল না। তাহারা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কথা ভুলিতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব-রণাঙ্গনে ৭০০০০ ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হাতে বন্দী হয় এবং এই বন্দী সিপাহীদেরকে লইয়া সুভাষ চন্দ্র বসু আযাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army) গঠন করেন। এই ফৌজ বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।[৬৪] জাপানীদের পরাজয়ের পর আযাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ সরকারের হাতে ফিরিয়া আসে। ইহার অফিসারদের দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হয় এবং বিচারে তাহাদের দণ্ডাজ্ঞা হয়। এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সারা ভারতে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে দণ্ড মওকুফ করিতে হয়।[৬৫] যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের দল ত্যাগ অতি সাংঘাতিক ব্যাপার। এই ঘটনা হইতে বৃটিশ সরকার বুঝিতে পারে যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় সৈন্যদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করিলে তাহারা মারাত্মক ভুল করিবে।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় নৌবহরের ভারতীয় নৌকর্মচারী ও সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ২৫টি জাহাজের নৌসৈন্যগণ কংগ্রেস পতাকা হতে নিয়া ও জয় হিন্দ ধ্বনি করিয়া বোম্বাইয়ের দুর্গ এলাকায় প্রবেশ করে। করাচীতে অবস্থিত নৌবহরেও সাংঘাতিক বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। বৃটিশ সরকার অন্যান্য সামরিক কেন্দ্র হইতে সৈন্য, নৌবহর ও বিমান বহর আনিয়া বহু কষ্টে বিদ্রোহ দমন করে।[৬৬] এই বিদ্রোহের ফলে বৃটিশ সরকার ভারতীয় সৈন্য ও কর্মচারীদের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। একদিকে এই সকল সামরিক সমস্যা তার উপর সারা দেশে গুরুতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতার দরুন বৃটিশ সরকার খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী গণআন্দোলন চলিতেছিল। হিন্দু মুসলমান সমস্যা থাকায় বৃটিশ সাম্রাজ্য বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলমানের অন্তর্যুদ্ধের দরুন সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছিল এবং ভারতে ইংরাজ সৈন্য ও কর্মচারীদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল সাময়িক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার দরুন বৃটেনের এটলী মন্ত্রিসভা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া ভারতীয়দের সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কাজ বলিয়া মনে করেন।

www.bjilibrary.com

বিংশতি অধ্যায়
১৯৪৭ সালের বাংলাদেশ বিভাগ

ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে হিন্দুনেতাগণ ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করাইয়াছিলেন তাঁহারাই আবার ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভাগের দাবী করিয়াছিলেন। আবার যে মুসলমান নেতাগণ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় খুশী হইয়াছিলেন তাঁহারা ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৯০৫ সালে বাঙ্গালী জাতিকে বিভক্ত করা হইয়াছিল; ১৯৪৭ সালের বাংলাদেশ বিভাগেও বাংলা-ভাষাভাষী বাঙ্গালীদেরকে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতান ও শাসকদের আমলে বাঙ্গালী জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য এবং ভাষাগত ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের জাতীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠে। বৃটিশ শাসনকালে বাঙ্গালী জাতীয়তার অগ্রগতি নানা কারণে ব্যাহত হয় এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা ক্রমশ একে অন্যের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে ভারতীয় জতীয়তা এবং মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তার প্রভাব পড়ে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে বাঙ্গালী জাতীয়তার সংকট দেখা দেয়। ইহার পর বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম ভারতীয় জাতীয়তার উন্মেষ হয়। তাহারা ইহা বাঙ্গালী জাতীয়তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করে। তাহারা অখণ্ড ভারতের আদর্শেও বিশ্বাস করিত। তবে, তাহারা ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে থাকিয়াও বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা ও বাঙ্গালীদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রখিতে চাহিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, মুসলিম ভারতীয় জাতীয়তা এ বিষয়ে তাহাদের সহায়ক হইবে।

বাঙ্গালী হিন্দুগণও ভারতীয় জাতীয়তা এবং অখণ্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী থাকিলেও তাহারা বাংলাদেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখিতে চাহিয়াছিল। বভভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিছুটা মন কষাকষির সৃষ্টি হইলেও বাঙ্গালী জাতীয়তার স্বার্থের খাতিরে আবার তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ফিরিয়া আসে। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ মিলিয়া বাঙ্গালী জাতীয়তার ভিত্তি মজবুত করার জন্য চেষ্টা করেন। উদারপন্থী রাজনীতিবিদ দেশবন্ধু সি. আর. দাস এই কাজে অগ্রণী হন। তিনি স্বরাজ পার্টি গঠন করেন এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী. এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষ চন্দ্র বসুর সহযোগিতায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন করেন। ১৯২৩ সালে সি আর দাস বাঙ্গালী মুসলমানদের নেতা ফজলুল হক ও এইচ এস, সোহরাওয়ার্দীর সহিত হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমাধান করেন এবং বাংলাদেশ চুক্তি (Bengal Pact) স্বাক্ষর করেন।। এই চুক্তি হইতে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের বাঙ্গালী জাতীয়তার সত্তা রক্ষার প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়।

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা জমিদারী প্রথা, মহাজনী কারবার ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় সংস্কারের উদ্যোগ নেন। ইহাতে বিত্তশালী হিন্দুদের স্বার্থে আঘাত লাগে এবং আবার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান দেখা দেয়। পূর্বে হিন্দু নেতাগণ বাঙ্গালী জাতীয়তার স্বার্থে এবং বাংলাদেশের জন্য স্বাধিকার লাভের পক্ষে ছিলেন এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসনের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা অর্পণের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালের পর তাহারা বাঙ্গালী জাতীয়তার কথা অনেকটা ভুলিয়া যান এবং পুরাপুরিভাবে ভারতীয় জাতীয়তার সমর্থক হইয়া পড়েন। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন তাহাদের কাম্য হয়। অন্যদিকে, বাঙ্গালী মুসলমান নেতাগণ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন হইতে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় সত্তা রক্ষার জন্য মুসলিম জাতীয়তার দিকে ঝুকিয়া পড়েন এবং ১৯৪০ সালে তাঁহারা ভারত বিভাগের দাবী করেন। ভারত বিভাগের দাবী প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হিন্দু নেতাগণ ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী উত্থাপন করেন।

বাংলা বিভাগ দাবী : মুসলিম লীগ যখন ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান দাবীর ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে তখন এই দাবীকে প্রতিরোধ করার জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতাগণ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করেন।[১] বিলাতের শ্রমিক মন্ত্রিসভা ভারত বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা যে কোন প্রকারে ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা বজায় রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই এপ্রিল জিন্নাহর সহিত আলাপ-আলোচনার সময় মন্ত্রিমিশন তাঁহাকে বলেন যে, যদি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভাগ দাবী করা হয় তাহা হইলে অমুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলির উপর তাঁহার দাবী গ্রহণ করা যাইতে পারে।[২]

কিন্তু ১৯৪৬ সালে যখন সাংঘাতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অন্তর্যুদ্ধ শুরু হয় এবং অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের দরুন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন নেহেরু ও প্যাটেল ভারত বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন পথ দেখিতে পান না। ভি, পি, মেনন লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে অথবা ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে তিনি নেহেরু ও প্যাটেলকে ভারত বিভাগে সম্মত করান।[৩] এই সময় হইতে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী উত্থপিত ছিল। আয়ান ষ্টিফেনস লিখিয়াছেন, "জানুয়ারী (১৯৪৭) হইতে এরূপ দাবী করা হইতে থাকে যে, যদি প্রকৃতই উপমহাদেশ বিভক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রদেশও বিভাগ করিতে হইবে; কারণ উভয় প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই সমান্য এবং বিরাট সংখ্যক অমুসলমান অধিবাসীদের স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।"[৪] মার্চ মাসে যখন পাঞ্জাবে অন্তর্যুদ্ধ বাধে এবং শিখেরা হিন্দুদের পক্ষে যোগ দেয় তখন পাঞ্জাব বিভাগের দাবী প্রবল হইয়া উঠে।[৫]

কংগ্রেস মার্চ মাসে পাঞ্জাব বিভাগের দাবী গ্রহণ করে। ৮ই মার্চ কংগ্রেস কার্যনিবাহক কমিটি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সভায় পাঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনা বলীর কথা

www.bjilibrary.com

বিবেচনা করিয়া এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, ইহাকে এভাবে ভাগ করিতে হইবে যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল হইতে পৃথক হয়।[৬] পাঞ্জাব বিভাগ দাবী কংগ্রেসের রাজনৈতিক চাল ছিল। ৪ঠা মার্চ প্যাটেল দ্বারকানাথ নামক জনৈক সভ্যকে লিখিয়াছিলেন, "যদি লীগ ভারত বিভাগের দাবী ত্যাগ না করে, তবে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের দাবী করা হইবে। আমার মনে হয় না যে, বৃটিশ সরকার ভারত বিভাগ করিতে সম্মত হইবে। পরিশেষে তাহারা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা যক্তিযুক্ত মনে করিবে। যদি তাহা না হয় তাহাতেও বিশেষ যায়-আসে না। পূর্ব বাংলা ও পাঞ্জাবের কতকাংশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান ব্যতীত সমগ্র ভারত স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকিবে এবং ইহাতে ভারত এত শক্তিশালী হইবে যে, অন্যান্য অংশও ঘটনাচক্রে আবার ইহার সহিত আসিয়া যোগ দিবে।"[৭]

পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাব যে, কংগ্রেস রাজনৈতিক চাল রূপে গ্রহণ করিয়াছিল নেহেরুর বিবৃতি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া নেহেরু গান্ধীকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "পাঞ্জাব বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তগুলি পূর্বে নঞর্থক ছিল, কিন্তু এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবার সময় আসিয়াছে এবং কেবলমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আমাদের মত ব্যক্ত করার কোন অর্থ হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং কার্যনির্বাহক কমিটির অধিকংশ সদস্যও আমাদের মত বিশ্বাস করেন যে, এই বিভাগের জন্য আমাদের সত্ত্বর দাবী করা দরকার যাহাতে ছবির বাস্তবতা প্রকাশ পাইতে পারে। বাস্তবিকই ইহাই হইবে ভারত বিভাগের একমাত্র জওয়াব।[৮] ৯ই মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি জে, বি, কৃপালনী বলেন যে, কংগ্রেস অখণ্ড ভারতে বিশ্বাস করে, কিন্তু যদি ইহা সম্ভবপর না হয় এবং যদি লোকে পরস্পরকে হত্যা করে, তাহা হইলে কংগ্রেস পাঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে বিভাগের জন্য সুপারিশ করিবে। তিনি আরও বলেন যে, যদি বাংলাদেশেও এরূপ অবস্থা চলে, তবে বাংলাদেশ বিভাগের জন্যও কংগ্রেস দাবী করিবে।[৯]

মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের দাবী দুর্বল করিয়া ফেলে। কারণ যদি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ইহা পাঞ্জাব বিভাগের দাবী করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ভিত্তিতে ভারত বিভাগও হইতে পারে। মানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা ৭ই এপ্রিল (১৯৪৭) কংগ্রেসের প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করে যে, কংগ্রেস পাঞ্জাব প্রদেশ বিভাগের দাবী করিয়া পাকিস্তান দাবীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।[১০]

মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাব ভারত বিভাগের পক্ষে প্রয়োগ করেন। লিউনার্ড মাসলী লিখিয়াছেন যে, মাউন্টব্যাটেন প্যাটেলের সহিত আলোচনায় এই যুক্তি প্রদর্শন করেন, "মুসলমাদেরকে সংকীর্ণ ও দুর্বল আবাস ভূমি দিয়া বিদায় করা

www.bjilibrary.com

হইলে পর ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কূটনৈতিক চাল চলিবে না। এক দলীয় সরকারের শাসনাধীনে স্বাধীন ভারত নির্বিঘ্নে সর্বপ্রকার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারিবে।"[১১] মাউন্টব্যাটেন বলেন যে, মুসলিম লীগের সহিত একত্রে কাজ করিতে চেষ্টা করিয়া ভারতের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করা অপেক্ষা মুসলমানদেরকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত।[১২] প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনের যুক্তি মানিয়া লন। মাউন্টব্যাটেন পরে তাঁহার কর্মচারীদের নিকট মন্তব্য করেন যে, তাঁহার যুক্তি কার্যকরী হইয়াছে; বাহির হইতে প্যাটেলকে খুব শক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহার কাঠিন্য ভেদ করিতে পারিলে তাঁহার ভিতরটা শাঁসে পরিপূর্ণ দেখা যায়।[১৩] নেহেরু ও গান্ধী মাউন্টব্যাটেনের যুক্তি গ্রহণ করেন। পাকিস্তান দাবী দুর্বল করিবার জন্য তাঁহারা পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের অমুসলমান অধ্যুষিত এলাকা পৃথক করিবার দাবী করেন।

জিন্নাহ কংগ্রেসের বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবীকে চক্রান্তমূলক বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, মুসলমানগণ পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্তান, বাংলাদেশ ও আসাম নিয়া তাহাদের আবাসভূমি ও জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী করিয়াছে। তিনি প্রকাশ করেন, "যদি পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভক্ত করা হয়।, তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশকেও একই নীতিতে ভাগ করিতে হয়; তাহা করিলে প্রদেশগুলির প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূলে আঘাত করা হইবে।" জিন্নাহ প্রস্তাব করেন যে, সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে লোক বিনিময় করার ব্যবস্থা হইবে।[১৪]

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে অখণ্ড ভারত এবং খণ্ডিত বাংলাদেশ ও খণ্ডিত পাঞ্জাব, এই দুইটির মধ্যে একটি পছন্দ করিতে বলেন। মাউন্টব্যাটেন এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যদি জিন্নাহ পাকিস্তান দাবী আকড়াইয়া থাকেন তবে এই প্রদেশদ্বয় ভাগ করিতে হইবে। ১৯৪৮ সালের লণ্ডনের রয়েল এমপায়ায় সোসাইটিতে ভাষণ দানকালে মাউন্টব্যাটেন এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলেন, "তিনি (জিন্নাহ) প্রদেশগুলি বিভাগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি উথাপন করেন এবং বলেন যে, ইহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে এবং বিভক্ত করা হইলে ইহাদের ক্ষতি হইবে। আমি তাঁহার যুক্তি স্বীকার করি, এবং বলি যে, তাঁহার সেই যুক্তি ভারত বিভাগের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমার উক্তি তাঁহার মনঃপূত হয় নাই, এবং তিনি ভারত বিভাগের কারণ বিশ্লেষণ করিতে থাকেন। এইভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা একই প্রশ্নে ফিরিয়া আসি এবং পরিশেষে তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাকে হয় অখণ্ড ভারত এবং অখণ্ড পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় তাঁহাকে খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। অবশেষে তিনি দ্বিতীয় সমাধান গ্রহণ করেন।"[১৫]

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও অন্যান্য হিন্দু মহাসভা নেতাগণ প্রথমে বাংলাদেশ বিভাগের দাবী উথাপন করেন। সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমে এই দাবী আদায়ের জন্য প্রচারকার্য করা হয়। ইহার ফলে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

হয়। পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা বাংলাদেশ বিভাগের দাবী সমর্থন করেন এবং পূর্ববাংলার হিন্দুগণ ইহার বিরোধিতা করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে এই ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয়; পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী নেতাগণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা হইতে আলাদা করিয়া পৃথক প্রদেশের প্রস্তাব করেন, পূর্ববাংলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ইহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। হিন্দু সংবাদপত্রগুলিতেও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়। বসুমতী ও যুগান্তর বাংলাদেশ বিভাগের জন্য প্রচারকার্য চালায়, অমৃত বাজার পত্রিকা এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকে; আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাংলাদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। কংগ্রেসের অন্যতম বিশিষ্ট ও প্রবীণ নেতা শরৎচন্দ্র বসু প্রকাশ্য সভায় বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা করেন।[১৬]

বাংলাদেশ বিভাগের জন্য হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। কংগ্রেস নেতাদের অনেকে তাঁহাদের প্রভাবে পড়েন। ফলে ৪ঠা এপ্রিল (১৯৪৭) বিষয়টি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্যনিবাহক কমিটির বৈঠকে আনীত হয়। এই সভায় বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়।[১৭]

শরৎচন্দ্র বসু এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেস নেতা বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঈশ্বরদীতে এক জনসভায় শরৎচন্দ্র বসু বলেন, "কেহ কেহ বাংলাদেশ বিভাগের কথা বলিতেছেন, কিন্তু এই বিভাগ দ্বারা বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান হইবে না। আমি বৃহৎ বঙ্গ (Greater Bengal) পরিকল্পনার পক্ষপাতী এবং স্বর্গীয় সুভাষচন্দ্র বসুরও এই স্বপ্ন ছিল।" হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া তিনি যুবক সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করেন যাহাতে তাহারা সত্যিকারের নাগরিকের ন্যায় সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য কাজ করে।[১৮] ১৫ই মার্চ এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাবের সমালোচনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ইহার নীতি হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি মনে করেন যে, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে না।[১৯] তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

তফশিলী হিন্দুগণও বাংলাদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ছিল। তফশিলী হিন্দুদের অন্যতম নেতা জে এন মণ্ডল অন্তর্বর্তী সরকারের মুসলিম লীগের মনোনীত অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২১শে এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানেরা বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা করিতেছে। তিনি মনে করেন যে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং পশ্চিম বাংলার অন্যান্য সাম্প্রদায়িক নেতাগণ বাংলাদেশ বিভাগ দাবী করিতে পারেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন না, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণ শঙ্কর রায়; সত্যেন্দ্রনাথ দাস, এ, এম, পোদ্দার ও পূর্ববাংলার অন্যান্য জমিদারেরা কি কারণে বঙ্গীয় কংগ্রেসের বাংলাদেশ বিভাগের প্রস্ত সমর্থন করিতেছেন।[২০]

www.bjilibrary.com

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রক্রিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁহারা বাংলাদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। পাকিস্তানে যোগ দিয়া বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা ভোগ করিবে ইহাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দু নেতারা যখন বাংলাদেশের পাকিস্তান ভুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন তখন ইহা প্রতিরোধের জন্য মুসলমান নেতাদের অনেকে এই প্রদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রস্তাব করেন যে, বাংলাদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ দিবে না, ইহা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবে। প্রথমে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান নেতাই এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন।

বঙ্গীয় আইনসভার সভাপতি (Speaker) নূরুল আমীন ১৬ই মার্চ (১৯৪৭) দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে বলেন, "আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম পূর্বপাকিস্তান অথবা বঙ্গআসাম হইবে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। মুসলমানেরা এই স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন করিবে। আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের বেশে কোন প্রকার সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ করিব না। আমরা আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা করিব। আমরা আমাদের জন্মগত অধিকারের উপর কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।"[২১] বাংলাদেশের মর্যাদা সম্বন্ধে ২২শে এপ্রিল খাজা নাযিমুদ্দীন বলেন, "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ইহার হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসীর সর্বাস্বার্থের অনুকূল হইবে এবং আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে,. বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে বাঙ্গালীদের মারাত্মক ক্ষতি হইবে।"[২২]

১৭ই মার্চ ত্রিপুরা জিলার কিষাণপুরে এক জনসভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, মুসলমানেরা অবশ্যই পাকিস্তান পাইবে এবং বাংলাদেশ পাকিস্তনের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তিনি বাংলাদেশ বিভাগ করার দাবীর নিন্দা করেন এবং বলেন যে, বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের এবং ইহা অবিভাজ্য।:[২৩] এই বিবৃতি হইতে প্রকাশ পায় যে, প্রথমে সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখিতে পান যে, হিন্দু নেতাদের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ বিভাগ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৮ই এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী বালেন, "আমি সব সময় অখণ্ড বাংলা ও বৃহৎ বাংলার পক্ষপাতী।" তিনি আশা করেন যে, বঙ্গভঙ্গের উদ্যোক্তাগণ নিজেদের নাক কাটিবার পূর্বে বুঝিতে পারিবেন এবং আন্তরিকভাবে মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করিবেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমানেরা মিলিতভাবে বাংলাদেশকে একটি মহান দেশ ও বাঙ্গালীদেরকে এক মহান জাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।[২৪]

www.bjilibrary.com

২৭শে এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনে তিনি স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে, অখণ্ড বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিলে ইহার উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা থাকিবে; সম্পদের প্রাচুর্যে ও জীবিকার মানের উচ্চতায় বাংলাদেশ ভারতে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করিতে পারিবে; কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐশ্বর্যে ইহা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ও উন্নতশীল রাষ্ট্রের সমকক্ষ হইবে। তিনি বলেন যে, অবিভক্ত বাংলাদেশের সহিত মানভূম সিংহভূম বিহারের পূর্ণিয়া ও আসামের সুর্মা উপত্যকা যুক্ত হইলে বাংলাদেশ একটি বড় ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ইহার নিজের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। সোহরাওয়ার্দী আশ্বাস দিয়া বলেন, যদি হিন্দুগণ সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা নীতিগতভাবে একবার মানিয়া লয়, তাহা হইলে আমি তাহাদের আশা-আকাঙক্ষা পূরণের জন্য বহু দূর পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত আছি।[২৫] তাঁহার পরিকল্পনায় মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্নাহর অনুমোদন আছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, "আমি আমার নিজের মত ব্যক্ত করিতেছি, আমি বিভক্ত ভারতে সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলাদেশের পরিকল্পনা করিতেছি। পূর্ববাংলা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে টিকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ইহা টিকিয়া না থাকিবার কোন কারণ নাই। লোকেরা ইহার জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবে তাহার উপর ইহা নির্ভর করিবে। পূর্ববাংলা ও আসামের যেটুকু পাওয়া যায় তাহা লইয়া জনসাধারণ প্রয়োজনমত ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিলে তাহারা স্বাধীন রাষ্ট্র টিকাইয়া রাখিতে পারিবে।"[২৬]

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং আরও কয়েকজন হিন্দু নেতা সোহরাওয়ার্দীর সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতির উত্তরে বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে ৭ই মে এক বিবৃতিতে সোহরাওয়ার্দী মুসলমান ও হিন্দুদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের যুক্ত বৈঠক আহবানের প্রস্তাব করেন এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করার এই চমৎকার সুযোগ নষ্ট না করিতে তাহাদের নিকট আবেদন করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন না হইলে বাংলার হিন্দুদের বিশেষ মর্যাদা থাকিবে না, তাহাদের ভাষা ও কৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশকে শোষণ করিবে।"[২৭]

১২ই মে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও মুহম্মদ আলী (বগুড়া) সোদপুর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনার ব্যাপারে আলোচনা করেন।[২৮] ইহার পর ১৪-১৫ই মে সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে জিন্নাহর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনার ব্যাপারে গান্ধী ও হিন্দু নেতাদের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনার বিষয় নিয়া লীগ প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা করেন।[২৯] ১৬ই মে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে,তাঁহার অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনা মুসলিম লীগ নেতারা

www.bjilibrary.com

বাতিল করিয়া দিয়াছেন বলিয়া যে জনরব চলিতেছে তাহা মিথ্যা। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ যাহাতে বিভক্ত না হয় সেজন্য তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চেষ্টা করিবেন।[৩০]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মসচিব আবুল হাশিম সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনার একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। ১লা মে এক সাংবাদিক বিবৃতিতে তিনি অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি সি, আর, দাসের বাংলাদেশ চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানগণ এই চুক্তি অনুযায়ী শতকরা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাইবে, এরূপ শর্তে তাঁহারা চুক্তিবদ্ধ হইবে। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, "ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে ধর্মান্তরিত করিয়া অথবা লোক স্থানান্তরিত করিয়া একটি অখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা অস্বাভাবিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করার কথা এই প্রস্তাবে বলা হয় নাই। ইহা বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য কৃষ্টি বিশিষ্ট ইউনিটগুলিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার দিয়াছে এবং সকলের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছামত একটি ভারতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের সম্ভাবনার পথও খোলা রাখিয়াছে।" তিনি মন্তব্য করেন যে, যদি বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চাপ না থাকে, তাহা হইলে তাহারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও সন্তোষজনকভাবে নিজেদের বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারে।[৩১]

এই সময় মাওলানা আকরম খান বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি সরকারী লীগের মুখপাত্র ছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান প্রশ্নের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের সহিত আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক লীগ কার্য নির্বাহক কমিটি একটি সাব-কমিটি গঠন করে।[৩২] লীগ সাব-কমিটি কংগ্রেস নেতাদের সহিত কয়েকটি যুক্ত বৈঠকে আলাপ আলোচনা করে। ইহার পর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে এক সভায় মিলিত হন এবং এই সভায় একটি যুক্ত কমিটি গঠন করেন। সোহরাওয়ার্দী, নাযিমুদ্দীন, আবুল হাশিম ও অপর তিনজন লীগ নেতা এবং শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় ও অপর চার জন কংগ্রেস নেতা যুক্ত কমিটির সভ্য মনোনীত হন। এই কমিটিকে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের গ্রহণযোগ্য এক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়।[৩৩]

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যুক্ত কমিটি আলাপ-আলোচনার পর আপোষ মীমাংসায় আসিতে সমর্থ হয়। ২০শে মে শরৎবসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় কমিটির সভ্যরা এই আপোষ-মূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২৩শে মে এক পত্রে শরৎবসু গান্ধীকে লিখেন, "গত মঙ্গলবার বিকালে আমার বাড়ীতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; সোহরাওয়াদী, আবুল হাশিম, আবদুল মালিক, ফজলুর রহমান, কিরণশঙ্কর রায় ও সত্যরঞ্জন বকশী এই সভায় যোগ দেন। আমরা একটি আপোষ-মূলক চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছি, আপনার বিবেচনার জন্য এই চুক্তির নকল চিঠির সহিত আপনাকে পাঠাইতেছি। চুক্তিটির নকলের পরিচয়ের জন্য আমি ও আবুল হাশিম ইহা অন্যান্য সভ্যদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিয়াছি। অবশ্য, চুক্তির বিষয়টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

www.bjilibrary.com

প্রতিষ্ঠানে উত্থাপন করিতে হইবে। আমাদের আলাপ-আলোচনা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ইহা অনুমোদন করিবে, হয়ত ইহার সামান্য রদবদল হইতে পারে। আমি এখনও মনে করি যে, যদি আপনার সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশ এই প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের আপোষমূলক চুক্তি অনুযায়ী চূড়ান্ত মীমাংসায় আসিতে পারে, তাহা হইলে আমরা বাংলার সমস্যা এবং একই সময়ে আসামেরও সমস্যা সমাধান করিতে পারিব। ভারতের বাকী অংশেও ইহার শুভ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।"[৩৪] সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর নিকটও চুক্তির নকল প্রেরণ করেন।[৩৫]

নিম্নলিখিত শর্তগুলির ভিত্তিতে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল :

(১) বাংলাদেশের মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতাসীন থাকিবে, কিন্তু হিন্দু মন্ত্রিদের জায়গায় বঙ্গীয় কংগ্রেসের মনোনীত সভ্যদেরকে অবিলম্বে নিয়োগ করিতে হইবে। (২) বাংলাদেশ পাকিস্তান অথবা হিন্দুস্তান কোন রাষ্ট্রে যোগ দিবে না, ইহা অবিভক্ত ও স্বাধীন থাকিবে। বাংলাদেশ পাকিস্তানে বা হিন্দুস্তানে যোগ দিবে অথবা স্বাধীন থাকিবে, বাংলাদেশের গণ-পরিষদে সে বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে, সার্বজনীন বয়স্কদের ভোটে ও যুক্ত নির্বাচন প্রথায় গণপরিষদ নির্বাচিত হইবে। (৩) লোকসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্ধারিত করা হইবে।[৩৬]

এই চুক্তির ভিত্তিতে সোহরাওয়ার্দী, শরৎবসু, আবুল হাশিম বৃহৎ বঙ্গের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনায় পুর্ণিয়া হইতে আসাম পর্যন্ত বাংলাভাষাভাষী ভূভাগ লইয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। তিনটি অঞ্চল এই রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত হইবে। (১) মধ্যবাংলা অঞ্চল; চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং শ্রীহট্ট জিলা, এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ইহার অর্ন্তভুক্ত থাকিবে। (২) পূর্ব অঞ্চল; শ্রীহট্ট ব্যতীত আসাম নিয়া এই অঞ্চল গঠিত হইবে। (৩) পশ্চিম অঞ্চল; বর্ধমান বিভাগ ও বিহারের পুর্ণিয়া জিলা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আইনসভায় হিন্দু ও মুসলমানের সমান সংখ্যক আসন থাকিবে। প্রধানমন্ত্রী সব সময় মুসলমানদের মধ্য হইতে হইবে; লেবাননের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ পর্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলমানও সংখ্যালঘুরা পাইবে। এই শাসনতন্ত্র ১০ বৎসর পরীক্ষামূলকভাবে চলিবে। যদি ইহা কার্যকরী করিতে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে যে কোন অঞ্চল এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা হইতে সরিয়া পড়িতে পারিবে এবং ইচ্ছামত স্বাধীন হইতে অথবা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারিবে।[৩৭]

কংগ্রেসের বিরোধিতা : কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ পরিকল্পনায় সম্মত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে, ভারত বিভাগ করা হইলে এই দুইটি প্রদেশও বিভাগ করিতে হইবে। এরূপ বলা হয় যে, কয়েকজন বাঙ্গালী হিন্দু নেতা মুসলিম লীগের সহিত আপোষের প্রস্তাব করিলে প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস নেতারা তাহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৮] শরৎবসু ১লা জুন দিল্লীতে গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং

www.bjilibrary.com

সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা নিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, যদি কংগ্রেস এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাহা হইলে সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনায় মুসলিম লীগের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবে।[৩৯] ইহার পর এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শরৎবসু বলেন, "আমার পরিকল্পনায় আমায় বিশ্বাস আছে এবং শেষ পর্যন্ত আমি ইহা আকড়াইয়া থাকিব।" বাংলাদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তির কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "আমি ইহা বলি না যে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকিবে। আমার বক্তব্য এই যে, ভারতের বাকি অংশের সহিত বাংলাদেশের কিরূপ সম্বন্ধ হইবে, সে বিষয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।"[৪০]

কংগ্রেস অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। শরৎবসুকে লিখিত গান্ধীর ৮ই জুনের পত্রে ইহা প্রকাশ পায়। এই পত্রে গান্ধী লিখেন যে, তিনি বাংলাদেশ পরিকল্পনার বিষয় নিয়া নেহেরু ও প্যাটেলের সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং ইহাতে তাহাদের সম্মতি নাই; তাঁহারা মনে করেন যে, ইহা হিন্দু ও তফশিলী সম্প্রদায়কে বিভক্ত করিবার একটি চাল এবং তফশিলী হিন্দুদের সমর্থন লাভের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। গান্ধী ঐক্যের জন্য দুর্নীতি অবলম্বন করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং শরৎবসুকে তাঁহার পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন।[৪১]

শরৎবসু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মনোভাবের দরুন নিরাশ হইয়া পড়েন। ৮ই জুন সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকারে তিনি ৩রা জুন পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রদেশগুলির ভাষার ভিত্তিতে পুনঃগঠন করিবার ও ইহাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের দাবী করেন। তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক জীবনে সচেতন বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসী অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার ও নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠনের পক্ষপাতী। "কিন্তু পরিকল্পনায় বাংলাদেশ আইনসভার সদস্যদেরকে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গণপরিষদ বাছিয়া লইতে অধিকার দেওয়া হয় নাই।" তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলেন যে, যদি বিষয়টি তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস কমিটির ও বাংলাদেশ আইনসভার অধিকাংশ সদস্য অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করিবে।[৪২]

লীগের বিরোধিতা : সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরম খান আসনের সংখ্যাসাম্য ও যুক্ত নির্বাচন প্রথা অনুমোদন করেন নাই। ১৬ই মে কয়েকজন সদস্য সহ তিনি দিল্লী যান এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়া জিন্নাহর সহিত আলাপ আলোচনা করেন।[৪৩] ইহার পর সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকারে আকরম খান বলেন যে, তিনি লাহোর প্রস্তাবের পরিপন্থী কোন পরিকল্পনা সমর্থন করিবেন না।[৪৪]

২৩শে মে লীগ কংগ্রেস যুক্ত কমিটি অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার যে পরিকল্পনা গ্রহণ

www.bjilibrary.com

করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনিবহিক কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করে। ২৯শে মে এক বৈঠকে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়, "কয়েকটি সংবাদপত্রে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়োছে সেগুলির সহিত কার্যনির্বাক কমিটির অথবা ইহার মনোনীত সাব-কমিটির কোন সংশ্রব নাই, সে কথা কার্যনির্বাহক কমিটি পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দিতে চায়। পাকিস্তান দাবীর প্রতি কার্যনির্বাহক কমিটির অকুণ্ঠ বিশ্বাস রহিয়াছে।" প্রস্তাবে আরও বলা হয়, "কমিটি কায়দে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থার পুনরাবৃত্তি করিতেছে এবং প্রকাশ করিতেছে যে, একমাত্র তিনিই ভারতের মুসলমানদের পক্ষ হইতে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কথাবার্তা বলিতে ও মীমাংসা করিতে পারেন এবং বাংলাদশের মুসলমানেরা তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে।[৪৫]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও লীগ কর্তৃপক্ষ অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা অনুমোদন না করায় সোহরাওয়ার্দী খুবই নিরাশ হন। ৩১শে মে মুপৌরীতে এক সম্বর্ধনায় তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে ইহার হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসীদের ক্ষতি হইবে। তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহা বাংলাদেশ বিভাগের ব্যাপারে হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। উপসংহারে তিনি বলেন, "কায়দে আযমের বিজ্ঞতার উপর আমাদের আস্থা আছে; আজ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাহার নেতৃত্বে আমরা শুধু যে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছিব তাহাই নয়, জনসাধারণও শান্তি ও সম্প্রীতির নিশ্চয়তা পাইবে।"[৪৬]

৩রা জুনের পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের সহিত বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ইহা গ্রহণ করে। জিন্নাহও আশ্বাস দেন যে, মুসলিম লীগ ইহা গ্রহণ করিবে। ৯ই জুন দিল্লীতে মুসলিম লীগ পরিষদের সভা আহূত হয়। মাওলানা আকরম খান, সোহরাওয়ার্দী' আবুল হাশিম, নাযিমুদ্দীন প্রমুখ প্রায় ষাট জন বাংলাদেশের সদস্য এই সভায় যোগ দেন। ইম্পিরিয়েল হোটেলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের কয়েকজন সদস্য ৩রা জুন পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন।[৪৭] কিন্তু জিন্নাহ পরিষদের সদস্যদের নিকট ব্যক্তিগত আবেদন করিয়া বলেন, "আপনারা কি আমাদের জীবিত থাকাকালে পাকিস্তান পাইতে চান?" তখন প্রায় সকল সদস্যই একস্বরে স্বীকার করেন। ইহার পর জিন্নাহ বলেন, "তাহা হইলে আমরা বন্ধুগণ, আপনাদেরকে এই কীটদষ্ট ও সংকীর্ণ পাকিস্তান গ্রহণ করিতে হইবে।"[৪৮] পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।"[৪৯] সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া নেন। ২০শে জুন এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "কষ্টের দিন শেষ হইয়াছে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পরিকল্পনাকে পশ্চাৎ হইতে আঘাত করা হইয়াছে এবং অচিরেই বাংলাদেশ বিভক্ত হইবে।" তিনি বাংলাদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আসুন আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছিবার জন্য আমরা আগাইয়া যাই। পশিচম বাংলার জনসাধারণকে আমি আশ্বাস দিতেছি যে, তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ কোন রকমেই

www.bjilibrary.com

বিপন্ন হইবে না এবং মুসলিম জগত তাহাদের নিকট হইতে এতবেশি দূরে নয় যে, সেখানে তাহাদের আওয়াজ পৌঁছিবে না এবং সেখান হইতে তাহাদের সাহায্য আসিবে না।"৫০

www.bjilibrary.com

তথ্য সংকেত

প্রথম অধ্যায়

১। মুর্শিদ কুলী খান ১৭০০ সালে বাংলার দীওয়ান, ১৭০৭ সালে নায়েব সুবাদার ও ১৭১৭ সালে সুবাদার নিযুক্ত হন।

২। এম, এ, রহিম, সোস্যাল এণ্ড কালচার্যাল হিস্টরী অব বেঙ্গল, ২য় খঃ পৃঃ ৫৪-৫৬।

৩। রিয়াজুল সালাতীন (তরজমা), পৃ : ২৪৯; তারীখ-ই-বাঙ্গলা, ৪৮ খ: ; কে, পি, সেন, বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ: ৯৬-৯৭, টিকা ১।

৪। এম, এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩-২০৪।

৫। তারীখ-ই-বাঙ্গালা হইতে উদ্ধৃত; সি, স্টুয়ার্ট, হিস্টরী অব বেঙ্গল, পৃ: ৭৭, এম, এ, রহিম প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৬-৭০।

৬। এম, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২-২০৩।

৭। আর, ওর্ম, মিলিটারী ট্রানজেক অব দি বৃটিশ নেশন ইন বেঙ্গল, পৃ: ৫৩।

৮। এম, এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭০-৭৪।

৯। আর, ওর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।

১০। এম, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২-৮৪।

১১। আর, ওর্ম, ২য় খ:, পৃ: ২৯।

১২। এস, সি, হিল, বেঙ্গলইন, ১৭৫৬-৫৭, ভূমিকা, পৃ: ২৩,১০২,১১৬,১৫৯।

১৩। কে, কে, দত্ত, আলীবর্দী এণ্ড হিজ টাইমস, পৃ: ১১৮।

১৪। পি রবার্টস, হিস্টরী অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া, পৃ: ৩৮। সুবাদার শাহজাদা সুজা জেব্রাইল ব্রাউটন নামক ইংরেজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় খুশি হইয়া ইংরেজ কোম্পানীকে এই বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়াছিলেন।

১৫। ব্রিজেন কে, গুপ্ত, সিরাজউদ্দৌলা এণ্ড দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, পৃ: ৪১।

১৬। সিয়ারুল মুতাক্ষেরীণ (তরজমা), ২য় খ: পৃ: ১৮৮-৮৯; ব্রিজেন কে, গুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃ: ৪০,৪৮-৫৩।

১৭। জে, এন, সরকার, বেঙ্গল নবাবস (ফার্সী গ্রন্থের অনুবাদ), পৃ: ৬৩।

১৮। ব্রিজেন কে, গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১।

১৯। এস, সি, হিল, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ: ১০২, ১১৬,-১৫৯।

২০। ব্রিজেন কে, গৃপ্ত, প্রাগুক্ত, ৯১-৯২।

২১। ঐ, পৃঃ ১০৬, ১১৩; এস, সি, হিল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৯-৫৪।

২২। ঐ পৃঃ ১১৬-১৯; ঐ, পৃ; ১৩৩-৩৫।

২৩। এস, সি, হিল, প্রাগুক্ত, কে কে, দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

২৪। ব্রিজেন কে, গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

www.bjilibrary.com

২৫। জে, এন, সরকার, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪-৭৫ মীরমদন বলিয়াছিলেন যে, মীরজাফর নবাবের পরম শত্রু এবং তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত হইবে না। নবাব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন নাই।

২৬-২৭। সিয়ারুল মুতাক্ষেরীণ (তরজমা), ২য় খঃ, পৃঃ ২৩১; ২৩৪।

২৮। জে, এন, সরকার, প্রাগুক্ত, ৫৬।

২৯। সিরারুল মুতাক্ষেরীণ (ফার্সী) পৃঃ ৪৪৮।

৩০। ঐ, পৃঃ ৫০৪; রিয়াজুস সালাতীন (তরজমা), পৃঃ ৩৮২। সিয়ারের অনুবাদ কারক রেমণ্ড বলেন (২য় খঃ, ৪৯২) যে, শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে অন্যান্যদের সহিত গঙ্গাতে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৩১। ঐ (তরজমা), ২য় খঃ, পৃঃ ৫৭১-৭২।

৩২। ডব্লিও ডব্লিও হান্টার, এ্যানালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল, পৃঃ ৪০১-৪০২: অকসফোর্ড হিস্টরী অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৯১।

৩৩। ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। পি, ই, রবার্টস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩

২-৩। ব্রিজেন কে, গুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৬-২৭।

৪। এ, আর মল্লিক, বৃটিশ পলিসি টুয়ার্ডস দি মুসলিম, পৃঃ ৩১।

৫। এন, মজুমদার, জাষ্টিস এণ্ড পুলিশ ইন বেঙ্গল, পৃঃ ১৮।

৬। নজমুদ্দৌলা ও সইফুদ্দৌলা মীরজাফর ও মুনি বেগমের সন্তান। মুনি বেগম প্রথম নর্তকী ছিলেন। মুবারকুদ্দৌলা মীরজাফার ও বাব্বু বেগমের সন্তান। বাব্বু বেগম প্রথমে নর্তকী ছিলেন।

৭। এন, মজুমদার, পৃঃ ৬৪।

৮। ঐ, ৯৬-৯৮,১৩৩।

৯। ঐ, ১০৮-১০,১৫২।

১০। ঐ, ২৬৮,২৮০,২২২।

১১-১৩। ওমেলী, মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃঃ ৫৬-৫৭।

১৪। সিয়ারুল মুতাক্ষেরীণ, ২য় খঃ, ১০৭; জে, এন, সরকার, প্রাগুক্ত, ৫৭; এম, এ, রহিম, প্রাগুক্ত ২৮৬।

১৫। এন, মজুমদার, ৪-১০।

১৬। ঐ, ২৪-২৫, ৬৪।

১৭। সিয়ারুল মুতাক্ষেরীণ, ২য় খঃ ৮০৭-৮০৮।

১৮-১৯। এন, মজুমদার, ২৮৩-৮৪, ৩০১।

২০-২১। সিয়ারুল মুতাক্ষেরীণ ২৫১, ২৮১।

২২-২৪। বি[illegible] বানার্জী, বেগমস অব বেঙ্গল, ৩৫-৩৭।

www.bjilibrary.com

২৫। পাটনায় লুৎফুন্নেসার কিছু সম্পত্তি ছিল। জৈনুদ্দীনের নির্মিত মসজিদ, মাদ্রাসা ও বসতবাটি ছিল।

২৬। খোসবাগের কবরখানার জন্য আলীবর্দী ৩০৫, বরাদ্দ করিয়াছিলেন।

২৭। এ এইচ দানী, ঢাকা, পৃ: ৩৩।

২৮। বিপশ হেবার, নেরেটিভ, ১ম খঃ ১৪৩-৪৪।

২৯-৩১। বি সি এলেন, ঢাকা, পৃ: ৩৩-৩৪।

তৃতীয় অধ্যায়

১-২। এম, এ, রহিম প্রাগুক্ত প্রথম খ:, ১৮৭-৯০, ১২৮, ২০৩।

৩-৫। ঐ ১৩০, ২০০-২০৪, ফিফথ রিপোর্ট, ২৬৯-৭৬।

৬-৭। এফ সসচি, ময়মনসিংহ ডি: গে:, ১৮৯।

৮। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী ধনবাড়ী জমিদার পরিবারের।

৯। এফ সসচি ময়মনসিংহ, ১৪৪-৪৬।

১০। দিলদুয়ারের গজনবীরা পাকুলিয়া চৌধুরীদের বংশধর।

১১-১২। সসরি, ময়মনসিংহ, ১৫০।

১৩। এম, এ, রহিম ১৯০-৯৬।

১৪-১৫। আনন্দনাথ, বার ভূঁইয়া, পৃ: ১৪৩-৪৪।

১৬। বাহারিস্তান-ই-গায়েবী (তরজমা), ৫৭, ৮৩, ১০৮,১৬৩।

১৭-২৪। জে ই ওয়েবস্টার, টিপারা ডি: গে:, ৯৮-১১৫।

২৫। ফারমিঙ্গার, ফিফথ রিপোর্ট, ২য় খ: ৪২৬; এম হক, কোম্পানীজ ল্যাণ্ড পলিসি, ৮০-৮৭; সিরাজুদ্দীন রেভেনিউ এডমিনিষ্ট্রেশন অব চিটাগাং ৪০৪।

২৬। জে এন সরকার, প্রাগুক্ত, ৪৩; এইচ বেভারিজ, বাকরগঞ্জ, ৪৩, ১১৮।

২৭। এইচ বেভারিজ, বাকরগঞ্জ, ৯৫-৯৭, ১০১-১০৪, ১১৮-২০।

২৮-২৯। ঐ, ১৩০-৩২, ১৩৫-৩৭, ১৪৭।

৩০-৩৬। ঐ, ১৪৪-৫৩।

৩৭। বাহারিস্তান, পৃঃ ৮৮।

৩৮-৩৯। ওমেলী, হুগলী, ডি: গে:, ২৩২; এস সি মিত্র যশোর-খুলনার ইতিহাস পৃ: ৫০২-৫০৬।

৪০। এম হক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিজ ল্যাণ্ড পলিসি, ১৬৩-৬৪

টীকা - ১

৪১। বাহারিস্তান, পৃঃ ১৯; তারীখ-ই-বাঙ্গালা, ২৫ খ।

৪২। ও'মেলী, বীরভূম ডি: গে: পৃ: ৮৫-৮৭।

৪৩। জে এ ভাস, রংপুর, ১৪৩।

www.bjilibrary.com

৪৪। জে এন গুপ্ত, বগুড়া ডি: গে: ৮১, ১১২, ১৫১।

৪৫। ঐ, ১৫১; ১৬২, ও'মেলী, রাজশাহী, ১২৪, ১৫৪, ১৭৪।

৪৬-৪৯। এইচ বেভারিজ, বাকরগঞ্জ, ১১০-১৫, ১৫৬, ১২৩।

৫০। ওয়েবস্টার, টিপারা, ৯৮, ১০৮-১।

৫১। সসচি, ময়মনসিংহ, ১৪৪।

৫২-৫৩। ব সি এলেন, ঢাকা ডি গে, গে, পৃ: ১৮১-৮।

৫৪। রহিম, ৮৯। জগৎশেঠ পরিবারের অবনতি হয়। উপকারের স্বীকৃতি স্বরূপ কোম্পানী এই পরিবারের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে।

৫৫। বেভারিজ, বাকরগঞ্জ, ১১৮-২০; ওয়বস্টার, টিপারা, ১১৮-২০

৫৬। ঐ, ১২৫-২৯; ঐ, ৯৩-৯৮, ১১৮।

৫৭। ওয়েবস্টার, টিপারা, ১১২; এম হক, প্রাগুক্ত, ১৮৬-১৭২, ২৭১।

৫৮। ও'মেলী, মুর্শিদাবাদ, ২২০; এফ স্ট্রঙ্গ দিনাজপুর, ২৫, ১০৬, আর সি দত্ত, ইকনমিক হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়া আণ্ডার আর্লি বৃটিশ রুল, ৬১।

৫৯। ঐ, পৃ: ২০০; ওয়েবস্টার, নোয়াখালী ১৬, ১০২।

৬০। ঐ, ১৫৬, ১৯২।

৬১। এম হক, ৬৪-৭৫, ১৬২।

চতুর্থ অধ্যায়

১-৩। আর সি দত্ত, প্রাগুক্ত, ৩৯, ৪৮, ভূমিকা, ৯।

৪-৬। ঐ, ৪৬, ৩৬, ভূমিকা, ৯; এম হক, ১০২।

৭। ডব্লিও হান্টার, এন্যালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল, ৩৮১।

৮-১১। আর সি দত্ত, প্রাগুক্ত, ৮৯-৯২।

১২। পি ই রবার্টস, পৃঃ ২৩০।

১৩। আর সি দত্ত, প্রাগুক্ত ৯৪।

১৪। হান্টার, ১৫৩-৫৪।

১৫। মল্লিক, প্রাগুক্ত ৩৪।

১৬-১৭। হান্টার, ১৫৪-৫৫।

১৮। মার্টিন, ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ১ম খ:, ৩১০-১১।

১৯-২৪। আর মল্লিক, প্রাগুক্ত ৩৬-৩৯।

২৫। হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮।

২৬-৩০। এ আর মল্লিক, ৪২-৪৬।

৩১-৩২। হান্টার, ১৭৭, ১৫০; মল্লিক, ৪৬।

www.bjilibrary.com

পঞ্চম অধ্যায়

১। সিয়ারুল মুতাক্ষেরীণ, প্রাগুক্ত, ৪৯৫; জে এন সরকার, প্রাগুক্ত ১৪; এম, এ, রহিম প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২, ১৪৩।

২। ফিফথ রিপোর্ট, ১ম খ:, ২৫৩-৭৬।

৩। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪। রেমণ্ড (হাজী মুস্তফা), সিয়ারুল মুতাক্ষেরীণ, ভুমিকা, ৬-১৩।

৫-১১ । এ আর মল্লিক, প্রাগুক্ত, ৫-১১; ১৪৩।

১২-১৩ । হান্টার, ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, ৩; ১৩৯।

১৪-১৫। ঐ, ১৫৭-১৫০।

১৬। দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭। মল্লিক, প্রাগুক্ত, ৪৮; আমীর আলীর উক্তি।

১৮। রামগোপাল, ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, পৃ: ২৭।

১৯। এস, এ, রশিদ ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, ১৭-১৯।

২০-২৪। হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৯-১৬৭।

২৫। এস এ রশিদ, ২০-২৩।

২৬। অনেক জিলার সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

২৮। এস এ রশিদ ২৫-২৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। এন মজুমদার, প্রাগুক্ত পৃ: ৮০-৮১।

২। জে এম ঘোষ, সন্ন্যাসী এণ্ড ফকীর রেইডারস ইন বেঙ্গল, পৃ: ২০; দাবিস্তান হইতে গৃহীত।

৩। এস এম ইকরাম, রোদ-ই-কয়সর, ৪৭৩-৭৫; এম, এ, রহিম, প্রাগুক্ত ৪৭৩।

৪-৫। জে এম ঘোষ প্রাগুক্ত পৃ: ১৯-২১। ভূকৈলাসের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার লিখিত কাশী বর্ণনায় সন্ন্যাসীদের বিবরণ দিয়াছেন।

৬-৭। সসচি, ময়মনসিংহ পৃ: ৩০-৪০, ৫৬-৫৭। ফকীর বাহিনী ১৭৭৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় বার ঢাকা কুঠি আক্রমণ করে; ইহা ব্যর্থ হয়।

৮-৯। ঐ ৪৩-৪৯, ১০৭; ২৯; জে ঘোষ, ৭৩।

১০। জে এম ঘোষ, ৭৩-৭৪; জে এ ভাস রংপুর ২৮।

১১-১২। ঐ, ১০৭-১০৮; সসচি ময়মনসিংহ, ২৯-৩১।

১৩-১৪। ঐ, ৮৪-৮৫; ঐ, ১৪৯।

১৫-১৭। ঐ, ১০৮-১০৯; জে ভাস, রংপুর, ২৮-২৯; ব্রজেন্দ্রনাথ বানার্জী, ডন অব নিউ ইণ্ডিয়া, পৃ:৭।

www.bjilibrary.com

১৮-১৯। জে এম ঘোষ, ৯৯-১১০।

সপ্তম অধ্যায়

১-৫। এ আর মল্লিক, প্রাগুক্ত, ৫১-৫২; মার্টিন প্রাগুক্ত, ৯০৯।

৬-৮। এম এ খান, ফরায়েজী মুভমেন্ট ৯২-১০১; ক্যালকাটা রিভিউ, ১৯৪৪।

৯। আর সি দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১।

১০-১১। জে ভাস, রংপুর, ৩০, ১০৫; কে কে দত্ত, প্রাগুক্ত, ২৪৫।

১২-১৩। মল্লিক, ৫৩; ব্রেয়ার ক্লিঙ্গ, ব্লু মিউনিটি, ৩৪-৩৬।

১৪-১৬। এম এ খান, ১১১-১১২; ব্রেয়ার ক্লিঙ্গ, ৩২-৩৪, ৫৩।

১৭-২০। মল্লিক, ৫৪-৫৬; এম, এ, খান, ১১৫।

২১। জে সি বাগাল, পিজেন্ট রিভোলুশন ইন বেঙ্গল, পৃ: ৬।

২২-২৩। এম এ খান ১১১-১৩; মল্লিক, ৫৪। অ্যাসলী ইডেন বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পরে তিনি বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হন।

২৪। জে সি বাগাল, প্রাগুক্ত, ভূমিকা ১২; মল্লিক, ৫৬।

২৫-২৯। ঐ, পৃ: ১-২৫।

৩০। ঐ, ৩, ৪৮-৫০। হরিশ মুখার্জী হিন্দু টাইমস সাপ্তাহিকীর সম্পাদক ছিলেন।

৩১-৩২। ঐ, ৯-১০; ব্রেয়ার ক্লিঙ্গ, ১৭১, ২১৯।

৩৩। ওমেলী, পাবনা, ২৫-২৭।

অষ্টম অধ্যায়

১। মল্লিক, প্রাগুক্ত, ৬৬; আই এইচ কুরেশী, মুসলিম কমিউনিটি অব ইণ্ডো-পাকিস্তান সাব-কন্টিনেন্ট; পৃ: ১০৬।

২-৫। এম এ খান, প্রাগুক্ত, ১-১২; জেমস ওয়াইজ, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, ২৩।

৬। তায়ুনী নেতা মাওলানা কেরামত আলী পরে সাবেকীদের পক্ষ গ্রহণ করেন।

৭-১১। জেমস ওয়াইজ, ২৩-২৫; এম এ খান; ২৬-৩৪ বেভারিজ, বাকরগঞ্জ ৩৪০।

১২-১৪। এম এ খান, ৪২-৪৬; ৫৭ বেভারিজ বাকরগঞ্জ ২৫৪।

১৫-১৭। আই এইচ কুরেশী, প্রাগুক্ত পৃ: ২৯৬-৩০০।

১৮-২৩। মল্লিক, ৭৬-৮৮; হান্টার, প্রাগুক্ত।

২৪-২৭। ঐ, ৯৭-১০১, ১২৭, ১৩৬।

২৮-২৯। হিস্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ২য় খ: ১ম ভাগ, ১৬১-৬৭।

৩০-৩২। হান্টার, ৪২, ৮২, ১।

৩৩-৩৪। মল্লিক, ১২৭-১৩০।

৩৫-৩৬। এম এ খান, ওহাবী ট্রায়ালস, ডকুমেন্ট ৬,১২৯।

www.bjilibrary.com

৩৭। হান্টার, পৃঃ ৭৩।

৩৮-৩৯। এম এ, খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১, ১৭৭, ১৯৯, ১০।

৪০। হান্টার পৃঃ ৭২।

৪১-৪৪। এম এ, খান ২৮৮-৯১; ৮৯-৯২, ১৯২; ৬০;৭২।

৪৫-৪৯। ঐ, ১৯২, ৪২-৪৯, ২৭৪, ২৮৬, ৩১৬-১৮, ৩৭৫।

৫০-৫২। ঐ, ২০৬, ১৫৩, ২৭৯, ২০৬।

নবম অধ্যায়

১। পি ই রবার্টস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬০-৬১।

২। বেনামী ইংরেজ সৈনিক, হিস্টরী অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, পৃঃ ৩৩-৩৪; বেনামী ইংরেজ সৈনিক, মিউটিনি অব দি বেঙ্গল আর্মি পৃঃ ১৬-২০।

৩। জি বি মেলেসন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি অব ১৮৫৭, পৃঃ ১৭; আর সি মজুমদার, মিউটিনি অব ১৮৫৭ পৃঃ ২০০।

৪-৫। হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, ৩৪-৩৫।

৬। অক্সফোর্ড হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়া, ৩৬০-৬১।

৭। জি বি মেলেসন, পৃঃ ১৮।

৮। এস বি রায় চৌধুরী, থিউরীজ অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি ৩১।

৯। মেলেসন, প্রাগুক্ত, ৩০; এস এম হক, দি গ্রেট রিভোলুশন অব ১৮৫৭ পৃঃ ৫৫-৬২। আহমদুল্লাহ মাদ্রাজের অধিবাসী ছিলেন।

১০। এস বি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

১১। কুরেশী, হিস্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ২য় খঃ ১ম ভাগঃ, ২৫৮-৫৯।

১২। ঐ; এস বি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ২০-২২।

১৩। হান্টার, প্রাগুক্ত, ১৫৩-৫৭।

১৪। তৃতীয় ও সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৫। পি ই রবার্টস, প্রাগুক্ত, ৩৬২-৬৩।

১৬-১৯। কুরেশী প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫-৩৬, ২৫২-৫৭।

২০। সৈয়দ আহমদ খান, রিসালায় বাগাওতে হিন্দ।

২১। জনরবে কিছু সত্য ছিল।

২২-২৩। হিষ্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ২য় খঃ, ১ম ভাগঃ, ২৭৭-৮৭।

২৪। মেলেসন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।

২৫-২৬। হিষ্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ৩১৩, ৩০৮, ৩৩২।

২৭। ভাতা হইতে বঞ্চিত হইয়া নানা সাহেব বৃটিশ সরকারের নিকট অভিযোগের জন্য তাঁহার প্রতিনিধি আযিমুল্লাকে লণ্ডন পাঠাইয়া ছিলেন। আযিমুল্লার দৌত্য ব্যর্থ হয়। লণ্ডনের মহলে তিনি খুব জনপ্রিয় হন

www.bjilibrary.com

এবং চার্মিং খ্যাত হন। ফ্রান্স ও তুরস্ক ভ্রমণ করিয়া তিনি দেশে ফিরেন।

২৮। মেলেসন, ৩৬; জি ডব্লিউ ফরেষ্ট প্রসিডিংস অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, ১ম খঃ, পৃঃ ১৫৭-৫৮, ১৬-১৭।

২৯-৩০। মজুমদার প্রাগুক্ত ২০০-২০১; মিউটিনি অব বেঙ্গল আর্মি, ৩০-৩৩।

৩১। জি ডব্লিউ ফরেস্ট, প্রাগুক্ত ১৫৭-৫৮, ১৬-১৭।

৩২। হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, ১৪৮।

৩৩। মেলেসন, ৩য় খঃ, ১৬-১৭।

৩৪। সি এস (জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্রগ্রাম) ডায়েরী, ১৮৬৭, পৃঃ ৫৮, টীকা ১; মেলেসন, ৪র্থ খঃ পৃঃ ২৯৭।

৩৫। ঢাকা রিভিউ, ঢাকা ফর্টি ইয়ারস এগো, ৬ষ্ঠ খঃ, জুন ১৯১৬, পৃঃ ৯৯-১০১।

৩৬। ঐ, ৭ম খঃ, মার্চ ১৯১৮, ২৭৫-৮২। প্রিন্সিপাল ব্রেনাণ্ড, রেকলেকশন অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি এট ঢাকা।

৩৭। হৃদয়নাথ মজুমদার, রেমিনেসসিনস অব ঢাকা, পৃঃ ২৩।

৩৮। মেলেসন, ৪র্থ খঃ, ৩০৪; হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, ১৫০।

৩৯-৪০। হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, ১৫০, ৫৩৯।

৪১। আলেকজান্ডার ডাফ, দি ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট।

৪২-৪৪। হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, ১৪৮-৪৯, ১০০।

৪৫। এস বি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯-২৩।

৪৬। ঐ; হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, ১০০, ১২২।

দশম অধ্যায়

১। এন এন ল, প্রমোশন অব লার্নি ইন ইণ্ডিয়া, মুসলিম রুল, ১৬১।

২। ব্লকম্যান (অনুবাদক) আইন-ই-আকবরী, ১ম খঃ, ২৮৮।

৩। ইকরাম মুসলিম সিভিলাইজেশন ইন ইণ্ডিয়া পাকিস্তান, পৃঃ ৪৬৯। এম এ, রহিম, প্রাগুক্ত, ৩১০-২৩।

৪-৫। হান্টার, প্রাগুক্ত ১৭০; মল্লিক, প্রাগুক্ত, ১৫০।

৬-৯। জে লং এডামস রিপোর্ট, ১৮,২৯, ৪০-৪২।

১০-১৪। ঐ থার্ড রিপোর্ট, ২৮৯, ২০০, ৩৫, ১৫৩, ১৯৯।

১৫। এম, এ, রহিম, পৃঃ ২৯১-৯২।

১৬-১৯। জে লং, ১১১-১৬, ৪৮-৭৩, ২১৫-৩২৭।

২০। এ আর মল্লিক, ১৫১-৫৩, ৬৪।

২১। জে লং, ১৫৩-৫৬ ৭৩।

২২-২৪। ঐ, ৯৭-৯৯, ১৫৬; মল্লিক, ১৬৪-১৬৫। শুভংকর কোন সময়ের লোক

www.bjilibrary.com

জানা যায় না। তাঁহার রচনায় ফার্সী শব্দের মুসলমানদের প্রথা আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি বাংলায় মুসলমান শাসনামলের লোক ছিলেন।

২৫। কাজী এ মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ৯।

২৬। জে লং ১-৪।

২৭। এম আলী, বেঙ্গলী রিয়েকশন টু খ্রীষ্টান ২০৬।

২৮-৩২। জে লং, ৫-৮, ৫৪; মল্লিক, ৩৮৬।

৩৩-৩৫। আর সি মজুমদার, বেঙ্গল ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী, ২৩-৩০, ৪৮। লুই হেনরী ভিভিয়ান ডরেজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। সামাজিক ভাবধারায় তিনি ছাত্রদেরকে প্রভাবান্বিত করেন।

৩৬। মান্নান, ৯; এম আলী ৬৮।

৩৭-৩৮। আর সি মজুমদার, ৩২, ৪৮।

৩৯। উইলিয়ম কেরী ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজিবলোচন, রমানাথ বাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার শিক্ষক ছিলেন। ইহার উর্দু শিক্ষক কবি মীর আমানের 'বাগ ও বাহার' কলিকাতায় ছাপা হয়। ১৮৫৪ সালে এই কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হয়। (ইয়ুসুফ আলী, হিন্দুস্তান কী তমদ্দুন কী তারীখ, ১২৬-২৮।)

৪০-৪৩। মল্লিক, ১৭৯-৯০।

৪৪। উপরে দ্রষ্টব্য।

৪৫-৪৭। মল্লিক, ৯৬-৯৮, ১৬৮।

৪৮। হিষ্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ২য় খ: ১ম ভা:, ২৫২।

৪৯-৫০। মল্লিক, ২০১, ২১৯।

৫১। মজুমদার, ৪৭-৬৫।

৫২-৫৬। মল্লিক, ৩০০-২৯; মজুমদার, ৪৮।

৪৭। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮০ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮৭ সালে; আলীগড় স্কুল ১৮৭৫ ও কলেজ ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫৮-৬০। মল্লিক, ১৬৪, ২৯১-৯২; জে লং, ২১৭।

৬১। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬২। হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দুদেরকে ভর্তি করা হইত।

৬৩-৬৭। হান্টার, ১৭৩-৭৫; মল্লিক, ২২৬-৪৩, ২৪৯-৭৪।

৬৮। জে লং, এডামস, সেকেণ্ড রিপোর্ট, ৯৭-৯৯।

৬৯-৭৩। হান্টার ১৭৩-৭৫; মল্লিক, ২৭৪-৮, ৩২৫।

৭৪। মজুমদার, ৫০। এ রব (ফজলুল হক, পৃ: ২) বলেন যে হুগলীর আহমদ মিয়া ১৮৬১ ও নবাব সিরাজুল ইসলাম ১৮৬৭ সালে বি, এ পাশ করেন।

www.bjilibrary.com

৭৫-৭৭। রামগোপাল, ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, ৭৫; মজুমদার, ৫১।

৭৮। মুহম্মদ আলী, প্রসিডিংস অব মিটিং এট ঢাকা, ৩০ ডিঃ ১৯০৬। মুসলিম লীগ স্থাপনের প্রস্তাবের সময় নবাব সলীমুল্লাহ এই উক্তি করেন।

৭৯। এ হামিদ, মুসলিম সেপারটিজম, পৃঃ ৬৩।

৮০-৮৭। ক্যালকাটা ইয়ুনিভারসিটি কমিশন রিপোর্ট, ৪র্থ খঃ, ১২২-১৫১।

৮৮। এইচ, দানী, ঢাকা, পৃঃ ১৪২-৪৮।

৮৯। ফাদার সোসা ১৫৯৯ সালে খ্রীষ্টধর্মের এক পুস্তিকা বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৬৩ সালে রোজারিক অনুরূপ পুস্তিকা বাংলায় রচনা করেন।

৯০। জে লং এডামস থার্ড রিপোর্ট, ২১০।

৯১। একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯২। মান্নান, প্রাগুক্ত, ৬৬

৯৩। এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ৩০৬, ২৭৭-৭৯।

৯৪। ঐ, ৩০৬-২১; মান্নান ৮৬-৮৭।

৯৫-৯৬। ঐ।

৯৭। ঐ, পৃঃ ৩২৩-৩০।

৯৮। ঐ, ৩৩৬-৪০; এস কে গুপ্ত, নজরুল চরিত মানস, ৮৮-৯০।

৯৯। কাজী এ, মান্নান প্রাগুক্ত, ৮৬-৮৮, ১৪৪-৪৮।

১০০। ঐ, ১৫৩-৯০, ৮৬; এনামুল হক, ৩১০-১১।

১০১। ঐ, ১৪৩, ১৭১-৭৯, ১৮০-২১০, ২৪৯-৯৭।

১০২। এ, কে শামসুদ্দিন, দৃষ্টিকোণ, পৃঃ ৯০-৯১।

একাদশ অধ্যায়

১। আবদুল আলী, নবাব আবদুল লতিফ, ঢাকা রিভিও, রিভিও, মে ১৯১১, পৃঃ ৩৭। আবদুল লতিফের পিতা কাজী আঃ রসূল সদর দীওয়ানী আদালতের উকিল এবং জাম-উল তাওয়ারীখের রচয়িতা ছিলেন (১৮৫৬)

২। আবদুল লতিফ, সর্ট একাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ।

৩। এ, আর মল্লিক, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৬।

৪-৫। আঃ লতিফ, প্রসিডিংস অব মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি; এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা।

৬-৭। আঃ লতিফ, মাই হাম্বল ইফোর্টস প্রমোট এডুকেশন।

৮-১১। মল্লিক, ১৯০, ২৫১; মাঃ এ সাত্তার, তারীখ-আলিয়া মাদ্রাসা, ১১২-৩১।

১২। আঃ লতিফ, মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল।

১৩। ঐ, মাই হাম্বল ইফোর্টস।

১৪। দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

১৫-১৬। আঃ লতিফ, মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা।

১৭-২৫। ঐ, মাই হাম্বল ইফোর্টস; মাই পাবলিক লাইফ।

২৬-২৯। ঐ, মাই পাবলিক লাইফ; রহিমুদ্দীন মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি; মান্নান, প্রাগুক্ত, ৫৩।

৩০। ঐ, প্রসিডিংস অব মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি।

৩১-৩৯। আ: লতিফ, মাই হাম্বল ইফোর্টস; মাই পাবিলিক লাইফ।

৪০। ডব্লিউ এস হান্টার, ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। মেময়রস অব আমীর আলী, ইসলামিক কালচার, ৫ম খ:, ১৯৩১, পৃ: ৫১৯-২০; বেনামী লেখক, ইমিনেন্ট মুসলমানস, ১৪৫-৫৩।

২। রামগোপাল, ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, পৃ: ২৪।

৩। আর সি মজুমদার, বেঙ্গল ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী' ৮৫-৯০।

৪। মেময়রস, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খ:, ১৯৩২।

৫। ঐ, ৫ম খ:, ৫৪০-৪১।

৬। ঐ, ৬ষ্ঠ খ:, ১৭১।

৭। ডব্লিউ এস ব্লান্ট, ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন, ৯৭।

৮-৯। শেখ এ রশিদ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, ২-৯।

১০-১১। রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, ৫০, ৩২৯, ৭৬-৭৭; জেড ইসলাম সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, পাকিস্তান হিষ্টরী কনফারেন্স, ১৯৫৯, পৃ: ৮৭।

১২। আমীর হোসেন, মোহামেডান এডুকেশন, (১৮৮০), পৃঃ ১-৭।

১৩। এম এ খান, মুসলিম মডার্নিজম (প্রবন্ধ), ১৫-১৮।

১৪। জেড ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৮৭।

১৫-১৬। মেময়রস, ৬ষ্ঠ খ: ১৬৭-৭১।

১৭-১৯। শেখ রশিদ, প্রাগুক্ত, ১৯-৩১, ৬-১০।

২০। মেময়রস, প্রাগুক্ত, ১৭০।

২১। রামগোপাল, ৫৩-৫৭, ৮০-৮১। ফারুক শাহ ১৮৮৮ সালে এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ইহার পুর্বে নবাব আমীর হোসেন বহু বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন।

২২। মেময়রস, ১১৩-১৬।

২৩। কুরেশী, হিস্টরী অব পাকিস্তান, ৪র্থ খণ্ড ১৫৫।

২৪। রামগোপাল, ৮১-৮২।

২৫। নাইনটিনথ সেঞ্চুরী, আগষ্ট ১৯০৬, পৃ: ২৫৪-৫৮।

www.bjilibrary.com

২৬। এস আর ওয়াসতী, মুসলিম লীগ, পাকিস্তান হিষ্টরী সোসাইটি জার্নাল ১শ খঃ, ২৪৩-৪৮।

২৭। শেখ রশিদ, ৩।

২৮। মেময়রস, পৃঃ ৩৩৪-৩৫; ওয়াসতী, লণ্ডন ব্রাঞ্চ মুসলিম লীগ, রিসার্স সোসাইটি জার্নাল, লাহোর, ১৯৬৫, পৃঃ ২৯।

২৯-৩৩। মেময়রস, প্রাগুক্ত, ৩২৯-৪৮।

৩৪। ঐ, ১৬৩, ১৬৯; পি ই রবার্টস, প্রাগুক্ত, ৪৯৪-৯৯।

৩৫। ঐ, ১-১৫, ১৩১, ৩৭৫-৭৭। ইমিনেন্ট মুসলমান প্রাগুক্ত, ১৩১।

৩৬-৩৯। স্পিরিট অব ইসলাম (৫ম সংস্করণ) ভূমিকা ১, পৃঃ ১১৮-৫৮, ১৬৫, ২৫৬, ২৬৭।

৪০। ডব্লিউ সি স্মিথ, মর্ডাণ ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া, ৫০।

৪১-৪২। স্পিরিট অব ইসলাম, ২৭২, ২৩১; স্মিথ, প্রাগুক্ত, ৩৯।

৪৩। হিষ্টরী অব সারাসিনস, ভূমিকা পৃঃ ৭।

৪৪-৪৬। ডব্লিউ সি স্মিথ, প্রাগুক্ত, ২০, ৪৯-৫১।

৪৭-৫০। কে কে আযীম, পৃঃ ৭১, ২৭৯, ৬৪, ৯২-৯৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। পি ব্রাউন; ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক), পৃঃ ১।

২। আর সি মজুমদার, প্রাগুক্ত, ৫-৬।

৩-৬। বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, ২৩,৪৮, ৬০, ৯১।

৭-৮। মজুমদার, ৭৬।

৯-১০। দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১। মজুমদার, ১০২।

১২। আই সাইমণ্ডস, মেকিং অব পাকিস্তান, ৩৮।

১৩-১৫। ত্রয়োদশ ও দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৬-১৭। মান্নান, ২৬৬-৬৯; দানী, ১২১, ১৪২-৪৮।

১৮। চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯। মল্লিক, পার্টিশন অব বেঙ্গল ১৯০৫, হিষ্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ৩য় খঃ ভাঃ, ১৩; জেড এইচ জায়দী, প্রাগুক্ত, ১৪৪-৪৬।

২০। চতুদর্শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২১। মল্লিক, প্রাগুক্ত, ১৬-১৭।

২২-২৩। ওয়াসতী; লর্ড মিন্টো ২৪৩-৪৬; শরীফুদ্দীন পীরজাদা, ফাউণ্ডেশন অব পাকিস্তান, ৪৩-৪৯।

২৪। কে কে আযীয, আমীর আলী, ২০৮, ২৩৫।

www.bjilibrary.com

২৫। শরীফুদ্দীন পীরজাদা, প্রাগুক্ত।

২৬। মুহম্মদ আলী, মিটিং এট ঢাকা, ৩০ডি: ১৯০৬, পৃ: ৫।

২৭। সলীমুল্লাহ নওয়াব আলীর সহিত তাঁহার পরিকল্পনার খসড়া সিমলায় মুসলমান প্রতিনিধিদের নিকট পাঠান।

২৮। দি বেঙ্গলী, ২৪ ডি: ১৯০৬ শরীফুদ্দীন, ৪৫-৪৯।

২৯-৩০। ওয়াসতী, লর্ড মিন্টো পৃ: ২৪৬।

৩১-৩৩। এম এস খান, বার্থ অব মুসলিম লীগ, পাকিস্তান অবজার্ভার ২৩ মা: ১৯৬৮; ইংলিশম্যান, জা: ১৯০৭।

৩৪। ২৯শে ডিসেম্বর রাত্রে প্রধান প্রতিনিধিরা ঘরোয়াভাবে পরিকল্পনা আলোচনা করেন। কেহ কেহ Confedaracy শব্দের আপত্তি করেন।

৩৫-৪১। মুহম্মদ আলী, প্রাগুক্ত ১০-১৯; এম এস খান, প্রাগুক্ত, ১৩।

৪২। দি ইংলিশম্যান, ৪জা: ১৯০৭; ওয়াসতী, মিন্টো ২৫০।

৪৩। দি বেঙ্গলী, ৬-১০ও ১৮জা: ১৯০৭; ওয়াসতী ২৫০।

৪৪-৪৭। এম এস খান, প্রাগুক্ত; এ হামিদ, ৭৯; ওয়াসতী, ২৫৫-৫৭।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। এ আর মল্লিক, পার্টিশন অব বেঙ্গল, প্রাগুক্ত, ১-২।

২-৫। জায়দী প্রাগুক্ত, ১১৪-২৬; দানী ঢাকা, ১২৪।

৬-৯। ঐ, ৯-২৩; ঐ, ১৪৩; অক্সফোর্ড হিষ্টরী, ৭৫৯।

১০। জার্নাল মুসলিম, ইনসটিটুট, জুন ১৯০৬ পৃ: ৪০৮।

১১। দি টাইমস্ লণ্ডন ১৯০৬; এ হামিদ, ৫৫।

১২। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল-আসামইরা, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৬।

১৩-১৫। হমিদ, ৫৩; মল্লিক, ১৪-২৭, লাল বাহাদুর, মুসলিম লীগ৫৬।

১৬। ঐ, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী, ন্যাশন ইন মেকিং ১৮।

১৭-২০। হামিদ, মুসলিম সেপারাটিজম, ৬৯-৭০, ৫৭।

২১-২৩। কুরেশী, মুসলিম স্ট্রাগল ফর পাকিস্তান, ৩৫; হামিদ ৮৮।

২৪-২৬। জামিলুদ্দীন ফাউণ্ডেশন অব মুসলিম লীগ, হিষ্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ৩ খ: ১ভা:, ৫২ মল্লিক, ২৬, লাল বাহাদুর প্রাগুক্ত, ৯২।

২৭-২৮। আফজাল ইকবাল, মুহম্মদ আলী, ২৬২; হামিদ, ৯২।

২৯। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি কমিশন, ৪ খ:, ১২২।

৩০-৩১। এ হামিদ, ৯৩।

৩২। এ ন সি চ্যেধুরী, অটোবায়োগ্রাফী অব আননোন ইণ্ডিয়ান, ২৩৭।

৩৩-৩৪। জে এইচ ব্রোমফিল্ড, টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী বেঙ্গল পৃ: ৫১, ৬৩-৬৪।

৩৫-৪৩। শরীফুদ্দীন, প্রাগুক্ত ২৩১-৪৯; হামিদ, ৯৪-৯৫।

www.bjilibrary.com

৪৪। জিন্নাহ তখনও মুসলিম লীগের সভ্যভুক্ত হয় নাই ১৯১৩ সালের এপ্রিলে লণ্ডনে মুহম্মদ আলী ও ওয়াজির হাসান তাঁহাকে সভ্যভুক্ত করেন। (এম এইচ সৈয়দ, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, ২৯১।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। হোমেরা মোমেন, মুসলিম পলিটিকস ইন বেঙ্গল, ২৯১।

২-৭। এম এ রব ফজলুল হক, ১-১৬, ২৬-৫৯; ব্রোমফিল্ড, ৬৪,১১৪।

৮। সরকারের আদেশে লক্ষ্ণৌর একটি মসজিদের অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। মসজিদ মেরামতের সময় কয়েকজন মুসলমান পুলিশের গুলিতে মারা যায়।

৯। এস এম আলী, আবদুর রসূল পা: অবজার্ভার, ২৯ মা: ১৯৬৮।

১০। লীগের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন।

১১-১৩। শরীফুদ্দীন, ৩৪৭-৭৯; ব্রোমফিল্ড, ১২৪; মুহম্মদী, ২০শে অক্টোবর, ১৯১৭।

১৪-২১। ঐ, ৪৭৪-৫০০; ঐ ১১৫, ১২৪; মুহাম্মদী, ২রা নভেম্বর ১৯-১৭; রব, ৬০।

২২। জমিয়াতুল উলামায়ে হিন্দ। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩-২৪। হিষ্টরী অব ফ্রিডম মুভমেন্ট, ২খ: ২৫ রব, ৫৩-৫৮।

২৫। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২২) সভাপতি ছিলেন।

২৬। ব্রোমফিল্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৪-৩৫; ২৪৫।

২৭। সোহরাওয়ার্দী পরিবার মেদেনীপুরের অধিবাসী। স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (জন্ম ১৮৯২)। শহীদ বিলাত হইতে এম, এ, ও বি, সি, এল পাশ করেন এবং কলিকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদেয় সদস্য নির্বাচিত হন।

২৮-৩০। ব্রোমফিল্ড, ২৫৪-২৭৪; রামগোপাল

৩১। আঃ রহিম মেদেনীপুরের এক জমিদার পরিবারে ১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৮৯০ সালে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন; ১৯০০ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০৬ সালে সিমলায় বড়লাটের নিকট প্রেরিত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি বাংলার গভর্ণরের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

www.bjilibrary.com

৩২-৩৫। ব্রোমফিল্ড, ১৭৫-৭৬; কমরুদ্দীন সোস্যাল হিষ্টরী অব ইষ্ট পাকিস্তান, পৃঃ ২৫০-৫৯।

৩৬। বিপিনচন্দ্র পাল সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন।

৩৭-৪৫। ব্রোমফিল্ড, ২৬০-৬৩; কমরুদ্দীন, ১৯; হামিদ, ১৮১, ১৯৫ ২০০।

৪৬-৪৭। রামগোপাল, ১৬৭, ২০৭; রব, ৬৮; হামিদ, ২০১। সোহরাওয়ার্দী মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন।

৪৮-৪৯। কুরেশী, প্রাগুক্ত, ৩১০, ৩২০; হামিদ, ১৯৬।

৫০-৫২। রামগোপাল, ১৮৯; রব, ৭৭-৮৪; ব্রোমফিল্ড, ২৮৯; হামিদ, ২১৩।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

১। আবুল মনসুর আহমদ, শেরে বাংলা এণ্ড পেজেন্টস, পাকিস্তান অবজার্ভার, এপ্রিল ২৭, ১৯৬৮, পৃঃ ১-১১।

২-৩। আমীর আলী, মেময়রস, ১৭০; পি ই রবার্টস ১৬৯, রব ২৮।

৪। আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বৎসর পৃঃ ১৪।

৫-৭। এ, খালেক, এক শতাব্দী, ১০৩; বি ডি হাবীবুল্লাহ, ফজলুল হক ২৯-৩২।

৮-১২। আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, ৫৩,৭২ ৮০-৯৯।

১৩-১৬। হাবীবুল্লাহ, ২৯; আবুল মনসুর, শেরে বাংলা, প্রাগুক্ত।

১৭-২২। এম, এ, এইচ ইস্পাহানী, কায়েদে আযম, ৩-২৮; কুরেশী, ৭৩।

২৩-২৬। আবুল মনসুর, রাজনীতির, প্রাগুক্ত ১১২, ৮৭; ৮৭।

২৭। ইস্পাহানী, কায়েদে আযম, ২৯; কমরুদ্দীন, ৩৫-৩৬।

২৮। চৌঃ খালিকুজ্জান, পাথওয়ে টু পাকিস্তান, ১৬৫; কুরেশী, ৮১-৮৯।

২৯। লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে (১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৭) ফজলুল হক শেরে বাংলা ধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হন। জিন্নাহ অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন।

৩০-৩৫। মনসুর, ১১২-১৪; হাবীবুল্লাহ ১০৫; ৫৪, ১৫৯; রব, ৯১-৯৪।

৩৬-৩৮। হাবীবুল্লাহ, ১১১, ৯৪।

৩৯-৪১। রামগোপাল, ২৭৪, ১৫৮; হামিদ, ২২৪; কুরেশী, ১০০।

৪২-৪৩। চৌঃ খালিকুজ্জামান, ১৭১।

৪৪। জামিলুদ্দীন স্পিচেস অব জিন্নাহ, পৃঃ ১৭৫।

৪৫-৪৮। মুঃ লীগ রেজুলুশনস, ১৯৪০-৪১, পুস্তিকা।

৪৯-৬০। জামিলুদ্দীন, ৩০১ খালিক, ২৫৪-৫৬; কমরুদ্দীন, ৫৫-৫৬।

৬১-৬৭। হাবীবুল্লাহ, ১১১; কমরুদ্দীন, ৫৮; রব, ১৩১-৩৮।

৬৮-৬৯। রব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ২৭; ইস্পাহানী ১৯০; কমরুদ্দীন ৬১।

৭০। আবুল হাশিম বর্ধমানের আবুল কাসিমের পুত্র।

৭১-৭৩। কমরুদ্দীন, ৬৪; রামগোপাল, ২৭৮।

www.bjilibrary.com

সপ্তদশ অধ্যায়

১। পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২-৭। কুরেশী, ১০৩-১৮; জি আল্লানা, পাকিস্তান মুভমেন্ট ডকুমেন্টস, . হামিদ, ২০৫।

৮। জামিলুদ্দীন, ১৫৭। লাহোর অধিবেশনে জিন্নাহর ভাষণ।

৯-১৩। কুরেশী, ১১৯-২৪; আর সাইমন্ডস্ প্রাগুক্ত ৫৬।

১৪। সিকান্দার হায়াত, স্কিম অব ফেডারেশন, ১৯৩৯।

১৫-১৮। কুরেশী, ১২৫-২৭; খালিকুজ্জামান, ১২৫; লীগ রেজুলুশন, ১৯৩৯।

১৯-২৫। হাবীবুল্লাহ, ৯৩; রব, ১২০; জামিল, ১২৪, লীগ রেজুলুশন ১৯৩৯।

২৬-৩০। লীগ রেজুলুশনস, প্রাগুক্ত, খালিকুজ্জামান, ১৭২; কমরুদ্দীন ৪৫।

৩১। মুসলিম লীগ অধিবেশন, পাটনা, ১৯৩৮।

৩২-৩৪। কমরুদ্দীন, ৪৭; লীগ রেজুলুশনস, খালিকুজ্জামান, ২৩৬।

৩৫-৩৬। জামিলুদ্দীন, ১৬৫-৬৬, ইস্পাহানী, ৫২।

৩৭-৩৯। শরফুদ্দীন, প্রাগুক্ত; রব ১৬১; কমরুদ্দীন, ৪৪-৪৮।

৪০-৪২। উপরে দ্রষ্টব্য; খালিকুজ্জামান, ২৩৬।

৪৩-৪৮। জামিলুদ্দীন, ১৭০, ১৪০-৪৪ লীগ রেজুলুশনস, ১৯৪২; শরফুদ্দীন ভূমিকা, ৬।

৪৯-৫১। ঐ, ৫০৮; ২খঃ, ১০২; ১১৮, ২৩০-৩৩।

অষ্টাদশ অধ্যায়

১-৮। কুরেশী, ১৪১-৭০; মুসলিম লীগ রেজুলুশনস, ১৯৪০; এ হামিদ ২৩০।

৯-১১। আল্লানা, প্রাগুক্ত, ২১৩; ২২১; ইস্পাহানী, ৫৮; মুসলিম লীগ রেজুলুশনস, আগস্ট ১৯৪২।

১২-১৫। কুরেশী, ২০৯-১১; রামগোপাল, ৩০০; জামিলুদ্দীন ৫৭।

১৬-২৬। আল্লানা ২৪৩; ২৭৮-২৮৭; সাইমণ্ডস, ৬৫-৬৭; কুরেশী, ২২৮-৩০; জামিলুদ্দীন, ১৭৫-৯০, ২০১-২৮।

২৭-২৮। মুঃ লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড, ১৯৪৫।

২৯-৩৫। ইস্পাহানী, ১৯৯, ১৩৯-৪০; কমরুদ্দীন, ৬৯-৭৩।

৩৬-৪৩। ঐ, ১৩৯-৪৩; রব, সোহরাওয়ার্দী, ৩৭; জামিলুদ্দীন, ২৭২।

৪৪-৪৮। কুরেশী, ২৪২-৪৪; ইস্পাহানী, ১৪৩।

৪৯-৫৩। শরীফুদ্দীন ভূমিকা, ২খঃ, পৃঃ ৩৩; এম এইচ সায়িদ, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, ৪০৫; খালিকুজ্জামান, ৩৪০-৪৩, জামিল, ২৮৪।

৫৪-৫৬। ইস্পাহানী, ১৪৩-৪৪; খালিকুজ্জামান, ২৩৬, ৩৪১।

www.bjilibrary.com

উনবিংশ অধ্যায়

১-২। কুরেশী, প্রাগুক্ত, ২৪৮-৪৯; আল্লানা প্রাগুক্ত, ২৯৪।
৩। মুহম্মদ আশরাফ, কেবিনেট মিশন এণ্ড আফটার, ৩।
৪-১১। কুরেশী, ২৫০-৬৭; আল্লানা ২৯৯-৩২২; হামিদ, ২৩৬।
১২-১৬। আয়ন ষ্টিফেনস, পাকিস্তান, ১১৯-২৮, কুরেশী ২৭২-৭৮। নেহেরু সরকার ২রা সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করে।
১৭-৩০। ইস্পাহানী, ২৩০-৩৩; স্টিফেনস, পাকিস্তান, ১২৭-৩০।
৩১-৪০। ঐ, ১৩৬-৩৪; কুরেশী, ২৯১।
৪১। ভি, পি, মেনন ট্রানসফার অব পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, ২৫৮-৫৯; খালিদ বিন সায়িদ, পাকিস্তান, ফর্মোটিভ ফেজ, ১১৯।
৪২-৪৪। আঃ কাঃ আযাদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম, ১৮৩-৮৮।
৪৫। ডন, ১০ই মার্চ ১৯৪৭, পৃঃ ১।
৪৬। এ সি জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, ৪৬-৪৭।
৪৭। ডন, ৯ই এপ্রিল ১৯৪৭।
৪৮-৪৯। স্টিফেনস, প্রাগুক্ত, ১৯৪-৯৫।
৫০। এ সি জনসন, প্রাগুক্ত ৭০।
৫১-৫২। ডন, ২রা মে, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৭।
৫৩-৬৭। স্টিফেনস, ১৯৫, ১০০-১৫; জনসন, ৮৯, ৯৯-১০৮ কুরেশী, ২৯৭।

বিংশতি অধ্যায়

১-২। সি আর ফর্মুলা; কুরেশী প্রাগুক্ত, ২৫০।
৩-৬। মেনন, ৩৮; স্টিফেনস ১৯৪; ডন, ১২ মাঃ ১৯৪৭।
৭-৮। জামিলুদ্দীন, ষ্ট্রাগল ফর পাকিস্তান, ৮৫-৮৬।
৯-১০। ডন, ১২ই মার্চ, ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪।
১১-১৫। জামিলুদ্দীন, ৮৬-৮৭; আযাদ, ১৮৫-৮৮; কমরুদ্দীন, ৮৬।
১৬-২০। ডন, ১৯ মাঃ, ৭ই এপ্রিল, ২০ ফেঃ, মাঃ ১৮, ১৯৪৭।
২১-২২। ঐ, ২৭ মাঃ ১৯৪৭; ইণ্ডিয়ান রেজিষ্ট্রার, ১ম খঃ; ১৯৪৭।
২৩-২৫। ঐ, ১৯ মাঃ, ১০ ও ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭।
২৬। ঐ, সোহরাওয়ার্দী জিন্নার সহিত ২৭শে মার্চ সাক্ষাৎ করেন।
২৭-৩২। ঐ, ৯, ২৪, ১৫-১৮ ৯, ১৯শে মে ১৯৪৭।
৩৩-৩৫। ঐ, কমরুদ্দীন, ৮৯-৯১, পিয়ারীলাল মহাত্মা গান্ধী।
৩৬-৩৭। ডন, ২৫শে মে ১৯৪৭; কমরশরুদ্দীন, ৮৮।
৩৮-৪১। ডন, ১৭ই মে; ৩রা জু ১৯৪৭।
৪২-৪৬। ডন, ১০ই জুঃ ১৮-২০, ২৯শে মে, ৩রা জু ১৯৪৭।

www.bjilibrary.com

৪৭-৪৮। ঐ, ৪-৭, ১১-১২ই জুন ১৯৪৭, কমরুদ্দীন, ৮৮।

৪৯। ডন, ১২, ২২শে জুন ১৯৪৭; শরীফুদ্দীন, ৫৬৮। চার শত সদস্যের মধ্যে ৮ জন বিরুদ্ধে ভোট দেন।

৫০। ডন, ১১ই জুন ১৯৪৭।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com